পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল

সত্যেন্দ্রনারায়ন মজুমদার

মনীষা

Patabhumie Kanchanjangha
Satyendranarayan Mazumder

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ১৯৬৩

প্রকাশক

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড

৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক

মৃণাল কান্তি রায়

রাজলক্ষ্মী প্রেস

৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে নেপালীভাষী
মেহনতী মানুষদের ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠার প্রথম
দিকের দিনগুলির কাহিনী

কৈফিয়ৎ

"কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে" বইটির—প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে। তার আগে বোধ হয় ১৯৫২ সালের জুন মাস থেকে অধুনালুপ্ত "নতুন সাহিত্য" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটিকে তিন দশক পরে নতুন নামে, বহু নতুন তথ্য ও উপাদানের সংযোজনে পরিবর্ধিত এবং অনেকটাই পরিবর্তিত আকারে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। এজন্য পাঠক পাঠিকা সমাজের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। লেখা শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় বারের অর্থাৎ ১৯৪৯-১৯৫২ সালের বন্দীজীবনের গোড়ার দিকে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণার পর প্রায় পনের মাস দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের চা-বাগান-গুলিতে আত্মগোপন করে শ্রমিকদের সংগঠন জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অবশেষে একদিন গ্রেপ্তার এবং দার্জিলিং জেলে বন্দী হতে হল। তখন আমি তিনটি মামলার বিচারাধীন আসামী। একটি মামলা বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে। দ্বিতীয়টি, সরকার কর্তৃক পলাতক ঘোষিত হওয়ার পরও আত্মসমর্পণ না করার দায়ে। তৃতীয়টি, আত্মগোপনকারী অবস্থায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের হেফাজত থেকে পলায়নের অপরাধে। পালাবার কৃতিত্ব অবশ্য আমার নয়, সিঙ্গেল চা-বাগানের শ্রমিকেরাই দল বেঁধে এসে পুলিশদের মারপিট করে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তবু আইনের চোখে আমিও দোষী। তিনটি মামলাই যে যে ধারাতে হচ্ছে তাতে দণ্ডিত হলেও সব মিলিয়ে মেয়াদ কয়েক মাসের বেশি হবে না। সাজা যে হবেই সে সম্বন্ধে কোন

সন্দেহ নেই। তার পরে বিনা বিচারে আটক ত' আছেই। সুতরাং বেশ কিছুকালের জন্য সরকারী আতিথ্য বরাদ্দ হয়ে আছে। এই অবস্থায় একেবারে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শুরু করি অনেকটা সময় কাটাবার তাগিদে।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বদলী হয়ে এলাম দমদম সেণ্ট্রাল জেলে। অনেক পুরাণো পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হল। পরিচয় হল অনেক নতুন বন্ধুর সাথে। কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি তথা তত্ত্ব ও কর্মনীতিগত বিতর্ক, আলোচনা এবং অধ্যয়নে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়তে হল। সৃজনশীল রচনায় হাত দেওয়ার সময়ই বা কই, মেজাজই বা কই। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসার অবকাশ পেলাম ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে। ইতিমধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন পুরোদমে চলেছে। পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সহবন্দী ডেটিনিউদের কয়েকজন বিভিন্ন কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। নির্বাচনী অভিযানে যোগ দেওয়ার সুযোগ যাতে তাঁরা পান সেজন্য ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভা তাদের 'প্যারোলে' মুক্তি দিয়েছে। আশা করছি আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে ডেটিনিউরা সবাই বাইরে যেতে পারবে। সব মিলিয়ে জেলখানার পরিবেশে একটা পরিবর্তন এসেছে। গুরুগম্ভীর বিতর্কে কখনও থমথমে, কখনও উত্তেজনায় ভরা দিনগুলির বদলে যেন শীতের শেষে বসন্তের হাওয়ার মতই একটা দমকা বাতাস এসে সবার মনের ভারটাকে হালকা করে দিয়ে গেল। সাহিত্য-সৃষ্টির মেজাজ এসে গেল।

ছাত্রজীবন থেকে আমার মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। লেখার ঝোঁক ছিল দুরন্ত। তবে সেদিনের ভারতবর্ষে আমার মতন বহু তরুণ মসী ছেড়ে অসি ধরার পথ বেছে নিয়েছিল। অর্থাৎ

সাহিত্য সেবার বদলে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের ব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। সে পথের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল কারুর বেলায় ফাঁসীর মঞ্চে অথবা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ, আর বেশির ভাগের ক্ষেত্রে হয় দীর্ঘ মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর নতুবা বিনা বিচারে আটক বন্দীদের শিবির। আমার বরাতে জুটেছিল দ্বীপান্তর। পৌঁছে গেলাম পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে। ধরা পড়ার পর থেকে কয়েকটি বছর কেটেছে একদিকে মামলা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় এবং অন্যদিকে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইতে। পড়বার বা লিখবার সুযোগ ছিল কতটুকু! আমরা যখন সেলুলার জেলে পৌঁছি তার আগে ওখানকার বন্দীরা তিনটি শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, অনশন সংগ্রামের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা এবং অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা আদায় করেছে। গড়ে উঠেছে বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায়ে লক্ষ্য ও পথের সন্ধানে সবাই যেন কঠিন সাধনায় রত। তখন থেকে শুরু করে প্রথমবারের বন্দীজীবনের (১৯৩৩-১৯৪৫) শেষ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে ঐ সাধনায়। তখন অধ্যয়নটা ছিল প্রধানত তত্ত্বগত। রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

মাঝে মাঝে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি তা নয়, তবে বেশিদূর এগোতে পারিনি। কারণ, উপাদানের অভাব। সৃষ্টি যে করবো তার পুঁজি কই? সম্বলের মধ্যে ছিল বহু বছর আগে পিছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি। তাও অনেকদিনের ব্যবধানে ঝাপসা হয়ে এসেছে। আগের দিনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে তার সাহায্যে কিছু সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন ছিল জীবনের সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচয়। নতুনের আলোকে অতীতকে বোঝা সম্ভব হবে। তখন ভেবেছি, চার দেয়ালের বাইরে গেলে শ্রমজীবী জনগণের প্রাণ প্রবাহের সঙ্গে মিশে যাবো। শিল্প সৃজনের উপচার সংগ্রহ করবো সেই উৎসমূল থেকে। বিশাল জনগণের যে বিপুল প্রাণশক্তি রূপ নেবে আন্দোলনে, সংগঠনে,

বাঁধ ভাঙ্গা সংগ্রামে তাকে মূর্ত করে তুলবো লেখনীর মুখে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বাইরে এসেছি তখন প্রায় কাল বিলম্ব না করে খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তাদের জীবনের সঙ্গে হয়েছে প্রত্যক্ষ পরিচয়। নিবিড় হয়েছে অন্তরের যোগসূত্র। অজস্র উপাদান সংগ্রহ হয়েছে। দক্ষ রূপকারের হাতে হয়ত সেগুলির সার্থক ব্যবহার হত। কয়েকটি বছরে যা পেয়েছিলাম পরবর্তী দুই দশকের কর্মজীবনে সংগৃহীত মালমশলার তুলনায় তা সামান্য। তবু দ্বিতীয়বার কারাবাসের সময় মনে হত, এত পেয়েছি যার পূর্ণাঙ্গ রূপায়নের ক্ষমতা আমার নেই। রূপ দিতে পারি বা না পারি, কিবাং যতটুকু পারি, পাওয়ার আনন্দ সামনের সমস্ত বাধা বিপত্তি, ব্যর্থতা, মলিনতা ও গ্লানিকে তুচ্ছ করে সমুখপানে ছুটে চলার শক্তি যোগায়। বন্দীজীবনের একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ অবকাশে স্মৃতির পরদায় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলি ফুটে উঠেছে অপূর্ব সজীবতা নিয়ে। মনের গহন তোলপাড় করে সামনে আসার তাগিদে ভিড় করেছে কতদিনের কত ছবি। তাদের দাবি ত' তুচ্ছ করার মত নয়। ছোট ছোট টুকরো টুকরো ছবি, হয়ত সুসংবদ্ধ নয়। তবু অস্বীকার করা চলে না এদেরই কোনটার মধ্যে দেখেছি বিদ্যুৎ ঝলকের মত ক্ষণিকের জন্য সুন্দরের আবির্ভাব, কোনটাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আত্ম-প্রকাশ, কোনটাতে আগামী দিনের পথচলার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। সেগুলিকে একটা বড় কাঠামোর মধ্যে সাজিয়ে তুলে ধরার কাজে হাত দিয়েছি। ভেবেছি, এবার বাইরে যাওয়ার পর এই লেখাকে দেশবাসীর সামনে অর্ঘ্য হিসাবে উপস্থিত করবো। ভারতের সংগ্রামী জনগণ তার মধ্যে নিজেদেরই হৃদয় স্পন্দন শুনতে পাবে।

লেখাটা শেষ করার সময় পেলাম না। তার আগেই বন্দীদশার অবসান হল। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকের কথা। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যদের ভোটে কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছি। ডেটিনিউরা দলে দলে ছাড়া পাচ্ছে।

আমরা জন পঁচিশ ছাড়া পেলাম মে মাসের গোড়ার দিকে। বাইরে পা দিতে না দিতেই আবার কর্মের আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হল। যে সব বন্ধুরা এখনও মুক্তি পান নি তাঁদের জন্য আন্দোলন, ডেপুটেশান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান। রাষ্ট্রপতি সংসদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করেছেন ১৫ই মে। সম্পূর্ণ নতুন, অজানা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। চাই তার জন্য প্রস্তুতি। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে সদ্যোমুক্ত সংসদ সদস্যদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপি আমাদের হাতে দিচ্ছেন। সংসদীয় রণক্ষেত্রে সেই সব জিনিষ সরকার পক্ষেব বিরুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার হবে। মোটের উপর, এতদিন যে ধরণের কর্মজীবন যাপন করে এসেছি তার চেয়ে বহুদিক দিয়ে পৃথক চরিত্রের কাজের ধারায় অভ্যস্ত হতে হবে। এহেন পরিস্থিতিতে অসমাপ্ত লেখাটি সম্পূর্ণ হওয়ার কোন আশাই ছিল না। ঘটনাচক্রে এবং আমার সামনে কিছুদিনের মধ্যে এক অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল। দিল্লীতে উপস্থিত হন আন্দামান সেলুলার জেলের সহবন্দী, উত্তর ভারতের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা প্রয়াত ধন্বন্তরি। তিনি ছিলেন জম্মুর অধিবাসী এবং গোটা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (ঐ সময়ে ঐ রাজ্যের সংবিধান অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রী বলা হত) শেখ আবদুল্লা, কাশ্মীর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির (গঠন পরিষদ) অধ্যক্ষ গোলাম মহম্মদ সাদিক এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। বন্ধুবর ধন্বন্তরি যখন কাশ্মীর ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন তা গ্রহণ করতে দেরী হল না। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একমাসের জন্য রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবী থাকবে। একে ত' কাশ্মীর ভ্রমণের প্রলোভনটাই দুর্বার। তাছাড়া উপরিপাওনা আছে, কাশ্মীর প্রশ্ন সম্বন্ধে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা অর্জন। বিষয়টি তখন সংসদে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধন্বন্তরির

পরিচয়পত্র নিয়ে গেলে কাশ্মীরে 'জাতীয় সম্মেলনের' (ন্যাশানাল কনফারেন্স) নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীমহলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খোলা-খুলি আলোচনার সুযোগ হবে। প্রথম দু'তিন দিন জম্মুতে কাটিয়ে যাত্রা করি শ্রীনগর অভিমুখে। বন্ধু একটি চিঠি দিয়েছেন সাদিক সাহেবের কাছে, তাতে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন আমার সুবিধা অসুবিধার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। শ্রীনগরে কয়েকদিন কাটাবার পর সাদিক সাহেবের ব্যবস্থা অনুযায়ী দিন দশ অনন্তনাগে বনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাংলোয় বাসের সুযোগ পেলাম। বাংলোর চারপাশে ছোটখাটো বন, উপবন বলাই ঠিক চিনার, পাইন, দেওদার আরো কত নাম না জানা বড় ও ছোট গাছ। বনের প্রান্তে পাহাড়ী নদী, দূরে পর্বতরেখা। একেবারেই নির্জন বনবিভাগের একজন কর্মচারী দুবেলা খোঁজ নিয়ে যায়। বাবর্চি রান্না করে। আর কেউ নেই। এমন মনোরম পরিবেশে অসমাপ্ত লেখাটি শেষ করে ফেলি। যত কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল তা হল না সময়ের তাগিদে। ছুটি ফুরোলেই ত' আবার রাজ্য সভায় নতুন দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিতে হবে।

লেখাটি ইতিমধ্যে অধুনালুপ্ত "নতুন সাহিত্য" পত্রিকাটিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন ন্যাশানাল বুক এজেন্সী। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বইটির আকার আরো বাড়াবো কিনা? কিন্তু তখন সময় কই? এক দশক ধরে সংসদীয় রাজনীতির মঞ্চে এবং একই সময়ে দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের সাথী হয়ে কর্মব্যস্ত থেকেছি। ওরই ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্বগত ও সমসাময়িক বিভিন্ন প্রশ্নের উপর রবিবারের স্বাধীনতা' পত্রিকায় লিখতে হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যখন ময়দানের এবং নির্বাচনের রাজনীতি থেকে সরে এলাম তখনও অবকাশ মেলেনি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙনের মুখে মার্কসীয় তত্ত্বগত বিতর্কের খরস্রোতে জড়িয়ে পরতে

হয়েছে। তার পাশাপাশি এসেছে জাতীয় জীবনের কয়েকটি জরুরী সমস্যা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে গবেষণামূলক বই লেখার অনুরোধ। আমার সমস্ত গবেষণার মূল ভিত্তিও কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। নতুন প্রজন্মের সামনে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও নিষ্কর্ষ তুলে ধরার আহবানকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

সাহিত্য সৃজনে আঙ্গিকের প্রশ্নকে তুচ্ছ করা চলে না। আঙ্গিকের উপর দখল অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে অনুশীলনের উপরে। অথচ অনুশীলনের অবসর এযাবৎ বড় একটা পাই নি। আড়াই দশক পরে এইটিকে নতুন ভাবে লিখতে বসেছি অভিজ্ঞতারই বিবরণ হিসাবে। সাহিত্যিক মূল্য কতটা হল বা না হল সে কথা বিচার করে দেখবেন সুধী পাঠকেরা। আমি চেষ্টা করবো ১৯৪৬-৪৯ সালের দিনগুলিকে যতটা সম্ভব জীবন্ত করে তুলতে। এতদিন পরে ভূমিকা সহ বইখানির পৃষ্ঠাগুলি খুঁটিয়ে দেখতে একটা বড় ত্রুটি নিজেরই নজরে পড়েছে। সেই সময়ের রচনায় পাওয়ার আনন্দটাই সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে। ফলে লেখাটা হয়েছে একপেশে, আবেগধর্মী— বিশ্লেষণ ধর্মী নয়। নীরস বিশ্লেষণের কথা বলছিনা নিশ্চয়ই। আবেগ অবশ্যই থাকবে। আজও রয়েছে সমস্ত অন্তর জুড়ে। লেখনীর মুখে তা আত্মপ্রকাশ করবেই। নতুবা শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়স্পন্দন ফুটে উঠবে কি ভাবে! তবে এখন বুঝছি আবেগের পাশাপাশি যা করা উচিত ছিল অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপায়ন, সেদিকে মন দিই নি। অথচ তা না করলে ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, অঙ্গহীন হয়ে পড়ে। পেয়েছি অজস্র পরিমাণে কিন্তু সেজন্য মাশুল কম দিতে হয় নি। কত লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই নিজের সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে। পরিবেশে কুশ্রীতা, মলিনতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সেই সব বাধাকে ভেদ করে হয়েছে নতুনের আবির্ভাব। জনগণের মনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত কুসংস্কার ও কূপমণ্ডু-

কতার প্রাচীর একটু একটু করে ভেঙে এগোবার পথ করে নিতে হয়েছে। জনগনের জাগরণের প্রক্রিয়া ত' সহজ সরল মসৃণ পথ ধরে অগ্রসর হয় না বা একটানা এগিয়ে চলে না। সেখানেও কত চড়াই উৎরাই পার হতে হয়। নানা ধরণের বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়। অতিক্রম করতে হয় কত দুর্গম গিরিসঙ্কট। আছে সংঘাত, আন্দোলনেরই মধ্যে। রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের দ্বন্দ্ব। শোষণ ভিত্তিক সমাজে শাসকশ্রেণী শুধু যে বাইরে-টাকেই অচলায়তন করে রেখেছে তাই নয়, শোষিত মানুষগুলির মনেও বিস্তার করেছে অন্ধকারের রাজত্ব। তাই একদিকে যখন জন্ম নেয় ভাবীকালের অঙ্কুর অন্যদিকে তার গলা টিপে মারতে চায় মৃত অতীতের পিছুটান। এই নির্মম সত্যকে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হয়। আমার মনে পড়ে ম্যাকসিম গোর্কীর একটি অত্যন্ত দামী কথা। তিনি আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন, 'জনগণ বলতে অনেকের মনে একটা রোমান্টিক ধারণা আছে। কিন্তু তিনি নিজে কখনও এমন মানুষের দেখা পাননি যার সঙ্গে ঐ ধারণা পুরোপুরি মেলে। মেহনতী মানুষেরাও ভালমন্দ দুই মিশিয়ে গড়া রক্তমাংসেরই জীব।' শোষন ও বঞ্চনার কারাগারে, গাঢ় অন্ধকারে যুগযুগান্ত ধরে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাদের। স্বভাবতই মনে বহু কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। দৃষ্টির গণ্ডী রয়েছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। বিশেষত চা বাগানের শ্রমিকরা তিন দশক আগে পর্যন্ত প্রায় দাসদের অনুরূপ জীবন যাপন করত। ছোট বেলায় আঙ্কল টমের ক্যাবিন (Uncle Tom's Cabin)বইটিতে পড়েছি গৃহযুদ্ধের আগের যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলাবাগিচাগুলিতে নিগ্রো দাসদের মর্মন্তুদ বেদনার কথা। প্রায় ঐরকমই ছিল আমাদের দেশে চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা। তফাৎ এইটুকু, এখানে মানুষ কেনাবেচার নিয়ম ছিল না। নিজ নিজ চা-বাগানের চৌহদ্দির বাইরে আছে যে বৃহৎ পৃথিবী, সে সম্বন্ধে তাদের শতকরা ৯৯ জন কোন খবর রাখত না।

সেজন্য তারা দায়ী নয় নিশ্চয়ই। তাই বলে কূপমণ্ডুকতার সত্যকে অস্বীকার করার মতন ভুল আর নেই। দক্ষ সংগঠক হতে পারেন তিনিই যিনি বাস্তব পরিবেশকে পুরোপুরি স্বীকার করেন এবং বোঝেন। আর তার অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মেহনতী মানুষের মনে নতুন চেতনার আলোক সঞ্চারের উপায় উদ্ভাবন করেন। সংগঠকের প্রধান দায়িত্ব ওদের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করা। declassed বা নিজ শ্রেণীচ্যুত হওয়ার অর্থ নয় জনগণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার তথা কূপমণ্ডুকতাকে মেনে নেওয়া। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি গণআন্দোলনের অনেক নিষ্ঠাবান কর্মী ঠিক এই ভুলটি করেন। অথচ দরকার ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ জনগনের চেতনার স্তরকে কিভাবে ক্রমে উন্নত থেকে উন্নততর করা যায় সেজন্য সচেষ্ট হওয়া।

সেই দিনগুলিতে নিজের সঙ্গেই কি কম লড়াই করতে হয়েছে! পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে জন্ম নিয়ে কমলকোরক সূর্যের দিকে মুখতোলে, তার অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে শহরের পরিবেশে বসে কাব্য করা সহজ। রোমান্টিক উদ্দীপনা ও আবেগে মেতে ঝোঁকের উপর সাময়িক ভাবে সেখানে যাওয়া সহজ। আসল যাচাইটা হয় টিঁকে থাকতে পারায়। পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে বাস করে পদ্মকলিকে সযত্নে লালন করাটা দুরূহ। মধ্যবিত্তের অভ্যস্ত জীবন যাত্রা, অভ্যাস, সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিপদে সংঘাত বাধে। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জীবন যাত্রার শরীক হয়ে থাকতে গেলে শারীরিক ক্লেশ কম সইতে হয় না। সব কিছু সহ্য করে মাটি কামড়ে থাকতে পারলে পাওয়া যায় বিপ্লবী জীবনের সব চেয়ে বড় পুরস্কার। তার নাম শ্রমজীবী মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা বিশ্বাস, আত্মার আত্মীয়তা—যার মধ্যে কোন খাদ নেই। অগ্নিপরীক্ষাই বটে। উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চাই বিপ্লবের জীবন দর্শন সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়, বিপ্লবের জীবনবেদে অনুপ্রাণিত হওয়া। আর চাই ইতিহাসের রচয়িতা হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, অবিচল আস্থা। রোমান্টিক স্বপ্ন-

বিলাসকে পুঁজি করে সেখানে দুদিনের বেশি টিঁকে থাকা সম্ভব নয়।

একদা যাঁরা 'সন্ত্রাসবাদী' নামে অভিহিত হতেন সেই জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকে বন্দীশিবিরে অথবা সেলুলার জেলে বসে কমিউ-নিজমের মতাদর্শ গ্রহণ করেন। বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শ্রমিককৃষকদের সংগঠিত করার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। একেবারে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী হয়ে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে একাত্মভাবে মিলে যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের সাধনার ফলে গড়ে উঠেছিল অবিভক্ত বাংলার উত্তর ও পূর্বের কয়েকটি জেলায় অগ্নিগর্ভ কৃষক আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে! তাঁরা যদি বিশদভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতেন সেটা হত নতুন প্রজন্মের কর্মীদের হাতে বড় হাতিয়ার। অন্ততঃ আমার কর্তব্যটুকু আমি করে যেতে চাই। প্রথম সংস্করণে যে অসম্পূর্ণতা ছিল তাকে যথাসম্ভব পূর্ণ করে যেতে চাই।

এতগুলি বৎসরের ব্যবধানে যা লিখতে বসেছি তাতে যে বহু নতুন চরিত্র ও ঘটনার সংযোজন হবে তাই নয়, পরিণত চিন্তা ও বিচার বুদ্ধির রসে ভিয়েন দিয়ে সব কিছুকে পরিবেশন করবো।

নতুনভাবে লেখা শুরু করার পরও চোখের অসুখের জন্য দীর্ঘ বিরতি দিতে হয়েছে। শেষ করতে পেরেছি অন্যের সাহায্য নিয়ে। নিজের চোখে দেখে লেখা আর অন্যের সাহায্যে কাজ করার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ। স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও স্মৃতি চারণ হয়েছে অনেকটা দিনলিপির ধরনে। পরিবেশের বর্ণনায় দুই একটি ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু নিরূপায়, ঢেলে সাজার ক্ষমতা নেই। আগত্যা সহৃদয় পাঠকপাঠিকা-দের সহানুভূতির উপর ভরসা করে বইখানাকে মনীষা গ্রন্থালয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রী মণি সান্যালকে এবং শ্রী অজিত সেনকে। যে প্রেসে ছাপা হবে তার কর্মীদের এবং মনীষার কর্মীবৃন্দদের আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।

প্রথম অধ্যায়

দার্জিলিং জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডে এসে পৌঁছেছি। জেলটি শহরের একেবারে নীচের সীমানায় অবস্থিত। তবু পাহাড়ের বুকে হওয়াতে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। পাহাড়ের গা কেটে বেশ খানিকটা জায়গা সমতল করে নিয়ে জেলটি তৈরী। এর মধ্যে দুটি ধাপ আছে। পিছনের দিকটা বেশ খানিক নীচে। নামবার জন্য কয়েকটা সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে চোখে পড়ে দার্জিলিং জেলা আর নেপাল সীমান্তের পর্বতশ্রেণী। বাঁ দিকে তাকালে ভনজেঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় পাইন বন। তবে ওদিকটায় যাওয়ার সুযোগ বেশি পাই নি। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায় নি। তাঁদের উপর নাকি গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশ আছে, আমার সম্বন্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর হওয়া চাই। জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (দার্জিলিং জেলের জেলারকে একাধারে দুই পদের ক্ষমতা দেওয়া ছিল) যিনি ছিলেন, তিনি মানুষ হিসাবে খুবই ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত। নিজে প্রচুর বই পড়েন। আমার যে দুই চারটি লেখা ইতিমধ্যে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গেও পরিচিত। সুতরাং আমাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। এমন কি নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে উপন্যাস, সাহিত্য, তিব্বতী ভাষা শিক্ষার বই এনে দিতেন। তবু তাঁর চাকুরী জীবনের উপর যাতে কোন আঘাত না আসে সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক। আইনের চোখে আমি সাংঘাতিক ধরনের বন্দী। সম্প্রতি পুলিশ হেফাজত থেকে পলায়নের অভিযোগ ত' আছেই। তার উপরে সেই ১৯৩৪ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন থাকার সময় যে কয়েকজন দিন দুপুরে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে পালিয়েছিলেন, সে প্রচেষ্টায় আমিও একজন অংশীদার ছিলাম। ছয়জনের চেষ্টা সফল হয়। আমি সহ আর দুই জন পাঁচিলের কাছেই সান্ত্রীদের হাতে ধরা পড়ি। পলায়ন প্রচেষ্টার অপরাধে দণ্ডও ভোগ করি। ব্রিটিশ

আমলের অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে সেই ঘটনাটিও স্বাধীন ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ আমার বিরুদ্ধে নালিশের ফিরিস্তিতে যোগ করতে ভোলে নি। সুতরাং জেলের ভিতরে ত বটেই, বাইরেও বেশ কড়াকড়ি ব্যবস্থা। আমাদের ওয়ার্ডটির কাছেই জেলের একটি পাঁচিল। তার গায়েই পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। সেখান থেকে ওয়ার্ডের ভিতরটায় সব কিছু নজরে পড়ে। ওখানে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সান্ত্রী মোতায়েন। ওয়ার্ডের সঙ্কীর্ণ উঠোনটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়। সন্ধ্যা না হতেই ব্যারাকের তালাবন্ধ।

আমাদের ওয়ার্ড থেকেই শহরের যেটুকু চোখে পড়ে তাও কম নয়নাভিরাম নয়। হিলকার্ট রোডের উপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো বাড়িগুলি। সবুজ অথবা লাল রংয়ের টিনের চালে সূর্যের আলো এসে পড়ে। পাইনবনের ফাঁকে ফাঁকে কাছারি দেখা যায়, কার্টরোডের একটু নীচে। এখানে বসে মনে হয় যেন খুব কাছে, হাত বাড়ালেই বুঝি নাগাল পাওয়া যায়। অথচ পক্ষান্তে মামলার দিন পুলিশ প্রহরায় পাহাড়ী পথে ওখানে যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। দূর উত্তরে দেখা যায় বার্চহিলের বনচূড়া। সোজা সরল বৃক্ষকাণ্ড, গাছগুলি আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। রাজভবনের নীল গম্বুজ সকালের আলোয় ঝলমল করছে। শ্রাবণ শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু হিমালয়ের বুকে দুরন্ত বর্ষার খেলা শেষ হয় নি এখনও। কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণের পর উজ্জ্বল প্রভাতে বোটানিকাল গার্ডেনের ছায়াঢাকা পথগুলি সাদর আমন্ত্রণ জানায়। বর্ষার জলভরা 'ফগ' (পাতলা মেঘ) জেলের পাঁচিলের বাধা মানে না। আমাদের ওয়ার্ডের আঙিনাকেও কিছুক্ষণের জন্য ধূসর আবরণে ঢেকে ফেলে।

সব কিছু অত্যন্ত চেনাজানা তবু দুচোখ ভরে দেখি। কিন্তু মনত' শুধু এইটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নয়। সে চোখের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে চলেছে স্মৃতির রাজ্যে। মোটে চারটি বছরত' বাইরে ছিলাম। তাও পুরোপুরি নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে

বসে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাইরের জীবন সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করেছিলাম। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কেটেছে জেলখানার চার দেয়ালের ভিতরে। সেটাইত' দেশভ্রমণের সময়, অ্যাডভেঞ্চারের পিছনে ছোটার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী দিনগুলি। বাইরে এসেছিলাম যখন তখন যৌবন অতিক্রান্তপ্রায়। তা সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটার পরিকল্পনা করেছি, প্রয়াস পেয়েছি। বেশির ভাগই কল্পজগতে রয়ে গেল। অভিজ্ঞতার ডালি ভরে ওঠার সময় পেলাম না। তার আগেই আবার বন্দীশালার আমন্ত্রণ পৌঁছে গেল আমার কাছে। অসমাপ্ত রয়ে গেল দেশের সঙ্গে পরিচয়। অপূর্ণ রইল কত নিভৃত স্বপ্নের কামনা।

যে বঞ্চিত মানুষগুলির চোখের জল মোছাবার ব্রত নিয়ে দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলাম তাদের সত্যকার মুক্তি এখনও বহুদূরে। একেবারে নীচের তলার মানুষগুলির পক্ষে স্বাধীন ভারত আজও বৃহত্তর কারাগার হয়েই রয়েছে। তাদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই ত স্বাধীন দেশের জেলের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত হল—বেরোবার জন্য নয়, ভিতরে ঢোকার জন্য। এমনটি আরো কতজনের বেলায় ঘটেছে, বাইরের অবারিত আকাশ, সূর্যের আলো, বর্ষার জলে কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুঁসে ওঠা ঝরনা, শ্যামল অরণ্যে ঢাকা গিরিশৃঙ্গ, তরাইয়ের উদার বিস্তৃত তরঙ্গিত বনপ্রান্তর! তোমাদের কাছ থেকে আবার বিদায় নিতে হল। কতদিনের জন্য কে জানে।

আর কাঞ্চনজঙঘা! ছেলেবেলা থেকে আমার সমস্ত স্বপ্নের পটভূমি! কখনও মেঘহীন নির্মল নীল, কখনও বা ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের ঠিক যেন একটু নীচে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। পূব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত পর্বতশ্রেণীর বহু উপরে। সেই পটভূমিতে অপরূপ মায়াময় মনে হয় কাঞ্চনজঙঘাকে। নেপালীরা ওকেই বলে হিমালয়—হিম অর্থাৎ তুষারের আলয়। ওদিকে তাকালে সেই ছোটবয়স থেকে আমার মনে জাগে একটি ছবি। ছবিটি অতীশ

দীপঙ্করের—জ্ঞান দেওয়া আর নেওয়ার সন্ধানে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত তুষারস্তুপের উপর দিয়ে চলেছেন রহস্যের দেশ দুর্গম তিব্বতে। তাই ত' তাঁর শ্রীজ্ঞান নাম সার্থক হয়েছে।

আমার যাত্রা আজও শেষ হয়নি। এ যাত্রার ধরনটা যে আলাদা। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অচলায়তনকে ভাঙ্গার লক্ষ্য নিয়ে পথ চলা। শোন পাংস্তর দল কবে জেগে উঠবে তবেই না শুরু হবে একদিকে ভাঙনের অন্যদিকে নতুন সৃষ্টির মহান কর্মযজ্ঞ। তাদের জাগরণের প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণের সাথী হতে চেয়েছি বলেই ত' কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে বিদায় নিতে হল, ভালবাসি তার চিরতুষারে ঢাকা শিখরে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে বর্ণচ্ছটা দেখতে। ভালবাসি হিমালয়ের মহান গম্ভীর সৌন্দর্য এবং পাইন, দেবদারু বনরাজিকে। ভালবাসি বহু গিরিনদীর জলে স্নাত তরাইয়ের অরণ্যঘেরা রহস্য-লোককে। তাদের চাইতেও বেশি ভালবাসি বুভুক্ষু জনসাধারণকে, বা বাগানের নেপালী ভাষী ও আদিবাসী শ্রমিকদের, সমতলের রাজবংশী কৃষকদের। যতদিন তাদের উপর থেকে শোষণ ও নির্যাতনের অবসান না হবে ততদিন আমার যাত্রা এগিয়ে চলবে কারাগার থেকে কারাগারের মধ্য দিয়ে, বহু চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে।

মনের দিক থেকে যাত্রা শেষ না হলেও বাইরের দিক থেকে ত' আবার বরাতে জুটেছে বাধ্যতামূলক বিশ্রাম। কর্মহীন অখণ্ড অবসর। আপাত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ঘণ্টা আর প্রহর গুণে সময়ের খেয়া পাড়ি দেওয়া যে কত বিরক্তিকর, বিশেষত যখন বুকে আছে উৎসাহ, দেহে রক্তের জোর—তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। খানিকটা সময় কাটাবার এবং খানিকটা নিজের সঙ্গে হিসাব মিলাবার তাগিদে লেখায় হাত দিয়েছি। স্মৃতির উজান বেয়ে মন চলে যায় অনেক বছর আগে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে। প্রায় ভুলে যাওয়া কত ঘটনা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দার্জিলিং জেলার কর্ম-জীবনের সম্বন্ধে লিখতে গেলে আকৈশোর পরিচিত পটভূমিতে প্রথম

যৌবনের অনেক কথাই অনিবার্যভাবে লেখনীর মুখে এসে ভিড় করে।

'৩০-এর দশকের গোড়া থেকেই শুরু করি। ১৯২৭ সালে রাজসাহী কলেজে ভর্তি হওয়ার বছরখানেকের মধ্যেই গোপন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। ১৯২৯-৩০ সালে গুপ্ত সমিতিতে খানিকটা দায়িত্ব পেয়েছি। সংগঠনের কাজে নানা জায়গায় ঘোরার প্রকাশ্য আবরণ হিসাবে ছাত্র নেতা রূপেও পরিচিত হয়েছি। তখন গণবিপ্লব কথাটা বিপ্লবীদের এক অংশের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীনতার আন্দোলনে টেনে আনতে হ'ব। তারাও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। গণবিপ্লব বলতে ধারণাটা তার বেশি স্পষ্টতা লাভ করে নি। ইংরেজের দাসত্বের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে, বিদেশী শাসনের অবসান হলে মেহনতী মানুষের দুঃখ কষ্টের জীবনও শেষ হবে। স্বাধীন ভারতে সামাজিক অন্যায় অবিচার থাকবে না, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে। এইটুকু মোটের উপর বুঝেছি। সাম্যবাদ সম্বন্ধে, রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকটা বই আলগাভাবে পড়ে ফেলেছি। কিন্তু সেদিনের সারা দেশব্যাপী রোম্যান্টিক উত্তেজনার পরিবেশে বিপ্লবকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে বোঝার প্রয়োজন মনে ঠাঁই পায়নি। দু-কূলপ্লাবী আবেগ, পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ফেলার মহাযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেওয়ার কামনা—তাকেই সম্বল করে এগিয়ে চলেছিলাম। কলেজের ছুটির সময়টাতে স্বপ্নচারণের মতন একটা আবেশে পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়েছি। এখানকার মেঘলোক, নভেম্বরের ধবধবে সাদা অথবা গ্রীষ্মের জলভরা 'ফগ' রূপকথার রাজ্যে অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি জাগিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমী আর অসমসাহসী গোর্খাদের মধ্যে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথে পাড়ি দিয়েছি। পাহাড়ী দিনমজুর বা রেলের কুলির ঘরে মাঝে মাঝে রাত কেটেছে। চেনানেই, জানানেই তবু সরল গরীব মানুষগুলি ভিনজাতের অতিথিদের আশ্রয়

দিয়েছে। সযত্নে সামনে ধরে দিয়েছে "শুখারুটি" আর শাক, সঙ্গে 'ফীকা' অর্থাৎ দুধ চিনি ছাড়া চা। তাদের সহজ আতিথেয়তা আমাদের মনে রোম্যান্সের রংটাকে আরো গাঢ়ভাবে বুলিয়ে দিয়েছে। সেদিন অনভিজ্ঞতা এবং স্বপ্নিল কল্পনার প্রভাবে এমন সব কাজ করেছি যেগুলিকে আজ নেহাৎ ছেলেমানুষি বলে বুঝতে কষ্ট হয় না। নেতারা বলেছিলেন হিলকার্ট রোডের আশেপাশে বনের মধ্য দিয়ে যে সব 'পাকদণ্ডী' বা পায়ে চলার পথ রয়েছে সেগুলির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে। নেপালী ভাষায় এগুলিকে বলে "চোর বাটো"। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একবার সহপাঠী ও সহকর্মী দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে হাঁটা পথে দার্জিলিং গিয়েছি। "চোর বাটো" অনুসরণ করে চলায় হিলকার্টরোডের পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব অনেকটাই সংক্ষেপিত হয়েছে। নেতারা আর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সীমান্ত অঞ্চলে আস্তানা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে। প্রয়োজন হলে "অ্যাকশনের" পলাতক কর্মীরা সেখানে আত্মগোপন করে থাকবেন। আস্তানায় পৌঁছাবার পথে মাঝে মাঝে যদি সংগঠনের ঘাঁটি না থাকে তাহলে ঐ পরিকল্পনাটি যে কত অবাস্তব হয়ে পড়ে সে কথা তখন ভাবিনি। ঐ জেলার তদানীন্তন একজন কংগ্রেস নেতাকে গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস দেওয়াতে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি বিহারের মানুষ হলেও দীর্ঘদিন এই জেলার বাসিন্দা। দার্জিলিং শহরে আলুপেঁয়াজের ব্যবসা করতেন। 'সীমানা' অর্থাৎ সুখিয়াপোখরি বাজার ছেড়ে দার্জিলিং জেলা ও নেপাল সীমান্তে তাঁর অনুরক্ত দুজন তরুণ বিহারী দোকানদার আলু-পেঁয়াজের চালানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর চিঠি নিয়ে আমরা দুই বন্ধু এক সকালে বেরিয়ে পড়ি। ঘুম স্টেশন থেকে বাস চলে সুখিয়াপোখরি পর্যন্ত। বাস চলার পক্ষে পথটি যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। একদিকে সুউচ্চপর্বতগাত্র অন্যদিকে অতলস্পর্শী খাদ। এই পাহাড়টি ভনজেঙ্গ নামে পরিচিত। ভনজেঙ্গ কথাটির অর্থ গিরিসঙ্কট। উত্তর

থেকে দক্ষিণে প্রসারিত দুই বিশাল পর্বতবাহুকে যুক্ত করেছে পুব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই পাহাড়টি। সুখিয়াপোখরি থেকে শুরু হল পায়ে চলার পথ। দুপাশে ঝিল্লীমুখর অরণ্য। বাদল দিনে ঘন কুয়াশা এসে মুহূর্তে চারিদিক ছেয়ে ফেলে। মনে হয় যেন ধূসর ধোঁয়ার আবরণে সব কিছু ঢাকা পড়েছে। দুতিন হাত সামনে কিছু নজরে পড়ে না। শুনেছি এ পথে পাহাড়ী ভালুকের আবির্ভাব হয় মাঝে মাঝে। যদি হয় কি করব জানিনা। দুই বন্ধুর হাতে দুটি লাঠি মাত্র সম্বল। একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হতে উপযাচক হয়ে জানিয়ে দিল 'শোকপা'ও নাকি কখনও সখনও এদিকে এসে পড়ে। পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 'শোকপা' হল মনুষ্যাকৃতি গরিলা ধরনের এক বিশালকায় লোমশ জীব। তবে আমরা যতদূর জানি তিনি বিচরণ করেন হিমালয়ের আরো অনেক উচ্চতর অঞ্চলে, যে স্থান সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। হয়ত 'শোকপা' সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকেই "তুষার মানবের" অস্তিত্বের কথাটার উৎপত্তি হয়েছে। নিরাপদে পৌঁছাবার পর দেখা গেল যাদের কাছে এসেছি তারা আমাদেরই বয়সী। এই জন বিরল স্থানে দুজন সমবয়সী অতিথি পেয়ে তারা খুব খুশি। যাঁর চিঠি নিয়ে এসেছি তাঁকে এরা গুরুর মতই ভক্তি করে। 'সীমানায়' রয়েছে মাত্র কয়েকঘর দোকান। গরীব পাহাড়ী মানুষদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছোটখাটো প্রয়োজনের জিনিস সরবরাহ করে। সপ্তাহে একদিন হাট বসে। নেপাল থেকে চাষীরা আলুপেঁয়াজ বস্তায় ভরে নিয়ে আসে। দার্জিলিং থেকে আসে ব্যাপারীর দল। হাটের দিনটি বাদে জায়গাটা যেন ঘুমিয়ে থাকে। দোকানদার বন্ধু দুজনের নাম ভুলে গিয়েছি। তাদের পীড়াপীড়িতে সে রাত সেখানেই কাটাতে হল। আমাদের তরফ থেকেও খুব আপত্তি ছিলনা। ফিরতি পথে সুখিয়াপোখরি পর্যন্ত চড়াই বেয়ে উঠতে হবে। বেলা পড়ে এসেছে। অন্ধকারে বনের পথ ধরে যাবার খুব উৎসাহ নেই। স্বরাজের

গরম আলোচনায় সারা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম। বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার, নিঝুম নিস্তব্ধতা। স্বরাজ বাস্তবে কি রূপ নেবে, কি ভাবে আসবে, তার সন্ধান। এসবের হদিশ নিজেরাও পাইনি, ওদেরও দিতে পারি নি। সেই সময়টা দেশের আবহাওয়াটাই ছিল উন্মাদনায় ভরা। স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্প দেশবাসীকে পাগল করে তুলেছে। অথচ স্বাধীনতার রূপরেখা বা তা অর্জনের পথের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে খুব অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া কেউ মাথা ঘামায় না। অবশ্য আজ পঞ্চাশ বছর পরে দেশের দিকে চেয়ে ভাবি এখনও কি ঐ অবস্থার বড় একটা পরিবর্তন হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ 'লজিক' চায়না, 'ম্যাজিক' পছন্দ করে। যাহোক পরের দিন সকালে চা এবং পরোটার সদ্ব্যবহারের পর বিদায়ের পালা। একটি মাত্র রাত্রির পরিচয় তবু মনে হয় কতদিনের চেনা বন্ধুরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। স্বরাজ লাভের সঙ্কল্পই আমাদের হৃদয়কে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে, হোকনা কেন তার অনেকখানিই স্বপ্নকল্পনা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা-ও সফল হয়েছে। বন্ধুরা প্রয়োজন হলে এখানে একজন কর্মীকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন। তিনি যে ফেরারী হতে পারেন সে কথাটা অবশ্য এবারকার মত উহ্য রেখেছি।

কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর একটি দিনের স্মৃতি। চলেছি জেলার উত্তরতম প্রান্তে, সিকিম সীমান্ত অভিমুখে। সিঙ্গামারি বাজার পার হয়ে হিলকার্ট রোড ছেড়ে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে নেমে চলেছি রঙ্গীত উপত্যকার দিকে। শুধু সঙ্কীর্ণ নয়; খাড়া উৎরাই। একপাশে পাহাড়ের দেয়াল। অন্যপাশে পর্বতগাত্র ঢালু হয়ে নেমেছে নীলাভ বনরাজি ও লতাগুল্ম ঝোপে ঢাকা অতলস্পর্শী খাদে। নীচে নামতে নামতে দুই বন্ধু তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি অথচ কাছে কোথাও জল নেই! বহু নীচে থেকে একটানা শোঁ শোঁ গর্জনের আওয়াজ কানে আসে। বর্ষায় দুরন্ত গিরিনদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর আছড়ে প'ড়ে সমতল ভূমির দিকে অশ্রান্ত

গতিতে ছুটে চলেছে। ঐখানে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত জল পাওয়ার উপায় নেই। বনের এলাকা ছেড়ে যখন টাকভর চা বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করি তখনও জলের সন্ধান মেলে না। অন্ত পথে দুএকটা ঝরনার দেখা পাওয়া যেত এতক্ষণে, তাও চোখে পড়ে না। বহু কষ্টে যখন গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো গেল উপরের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন মেঘের রাজ্য থেকে পাতালে নেমেছি। উপত্যকাটি বড় রঙ্গীত আর ছোট রঙ্গীতের সঙ্গমস্থল। নাম সিঙ্গলা বাজার। ছোট রঙ্গীতের উপরের পুল পার হয়ে দ্বীপের মত আকারের উপত্যকায় পৌঁছাতে হয়। পাহাড়ের গায়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত মোটা লোহার শিকলে ঝোলানো পুল। উত্তরে বড় রঙ্গীতের উপরে রয়েছে অমনিই আর একটি ঝোলানো পুল। ওপারে সিকিমের এলাকা। তখনকার দিনে সরকারী অনুমতি ছাড়া সিকিমে যাওয়ার উপায় ছিলনা। তাই পুলের মুখেই রয়েছে সসস্ত্র পুলিশ ফাঁড়ি।

সিঙ্গলা বাজারে একটি মাত্র কুটির। মালিক একজন বিহারী ঘোড়াওয়ালা। সপ্তাহে একদিন এখানে হাট বসে। এখান থেকে দার্জিলিং শহরে মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য, বিশেষত ভারী বোঝা বহনের জন্য, ঘোড়া ছাড়া উপায় নেই। কুটিরের মালিক ঘোড়া ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করি ঐ বাহন দুটির সাহায্যে। সৌভাগ্য যে পরের দিন হাটের তারিখ নয়। নতুবা ছয় হাজার ফুট খাড়া চড়াই ভাঙ্গা দুঃসাধ্য হত। রাতের জন্য আশ্রয় মেলে ঐ কুটিরের বারান্দায় দুটি চারাপাই বিছিয়ে। উপত্যকার তাপমাত্রা প্রায় সমতলভূমির অনুরূপ বলে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। দুটো টাকা দিয়ে আহারের বন্দোবস্তও হল। সারাদিনের নিদারুণ পরিশ্রমের পর গরীবের ঘরে মোটা চালের ভাত আর কালো ডাল কি মিষ্টিই না লেগেছিল। কালো ডাল অর্থাৎ কলাই। পাহাড়ের মানুষদের খুব প্রিয়। ঘোড়াওয়ালা বিহারী হলেও পাহাড়ের জীবনযাত্রার প্রভাব পড়েছে তার উপরে। কোনরকম বিপদের মুখে

পড়তে হয়নি, যদিও সারা রাত আশঙ্কা করেছি কোন বন্য জন্তুর এসে পড়ার। ঘুম বিশেষ হয় নি। জেগে নদীর একটানা ক্ষ্যাপা আক্রোশের গর্জন শুনেছি। মনে হয়েছে যেন রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চারিদিক। রঙ্গীতের বুক থেকে উপরে ওঠে দুগ্ধ ধবল মেঘের পুঞ্জ। ওপারের বনচূড়ে, শৈলশিখরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর তরুণ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই রকম চাঁদনী রাতেই ত' 'সন্তান'দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্"।

এমনিভাবে অজানা অচেনা গরীব মানুষের ঘরে আরো রাত কেটেছে। তবে আসল কাজ বেশি দূর এগোয়নি। কার্শিয়ং এবং দার্জিলিং শহরে যে দুই একজন স্বদেশী মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এঁদের মধ্যে একজনের কথাই বিশেষভাবে বলব। কার্শিয়ং-এ ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন কর্মী যদু কুশারী। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন। জেলায় বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের সেদিনকার পরিবেশে তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব রাখা সম্ভব ছিলনা। তবু মনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—এখানে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে অল্প সংখ্যক আছেন তাঁদের মধ্যে থেকে কংগ্রেসের জন্য কর্মী সংগ্রহ করার সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে। বিপ্লবীদলের জন্য কর্মী পাওয়া ত' অনেক দূরের কথা। এঁদের প্রায় সবাই সরকারী চাকুরী-জীবী। অন্যেরাও গভর্ণমেন্টের বিষদৃষ্টিতে পড়ার ঝুঁকি নিতে চান না। নেপালী ভাষী শিক্ষিতদের ভিতর হাতে গোণা দুই একজন ছাড়া কেউ কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। নেপালীভাষী ছাত্রদের অভিভাবকেরা হয় অবসরপ্রাপ্ত অথবা কর্মরত সামরিক বিভাগের লোক নতুবা গভর্ণমেন্টের সমর্থক। ছাত্রেরা নিজেরাও তখন ইংরিজিয়ানার নকলে ব্যস্ত। অবশ্য ছাত্র সংখ্যাও বেশি নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলতেও একেবারে

নীচের তলার মানুষদের মধ্যে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যতুবাবুর যুক্তি মেনে নিতে আমার খুব অসুবিধা হয়নি। কেননা রোম্যান্টিক উন্মাদনা সত্ত্বেও শিলিগুড়ির অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমারও খুব দেরী হয়নি। প্রশ্ন হল শিলিগুড়ি শহরে, তরাই অঞ্চলে অথবা পাহাড়ের নীচের তলার মানুষদের হৃদয়ের দুয়ারে প্রবেশের উপায় কি? তাদের সঙ্গে যেটুকু মেলামেশার সুযোগ হয়েছে তাতে বুঝেছি পথ খুঁজে পাই নি। কবির ভাষায় আঙিনার বেড়া পার হয়ে উঠোনে নয়, ওদের ঘরের ভিতরেই প্রবেশ করেছি। তবে সেটা নেহাৎ আক্ষরিক অর্থে। মনের ভিতরে ঢুকতে পারি নি। ওদের অভাব অভিযোগ, দৈনন্দিন সুখদুঃখ, আশা বা আকাঙ্ক্ষা কিছুর সঙ্গেই পরিচয় ছিল না। সেগুলি জানার বা বোঝার তাগিদও ছিল না। আমাদের প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল বিদেশী শাসনের অবসানের আহবান। সঙ্গে সঙ্গে ভাসা-ভাসা ভাবে মেহনতী মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার কথা অবশ্যই বলেছি। তবে তা ছিল বিমূর্ত, অস্পষ্ট। এর বেশি সম্বল ছিল না।

তবু সেই দিনগুলির অভিজ্ঞতা একেবারে নিস্ফলা নয়। সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ করতে পেরেছি। বন্দীশালার আমন্ত্রণে কর্মজীবনে সাময়িকভাবে ছেদ না পড়লে ধীরে ধীরে পথের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত। যেটুকু পেয়েছি তা উত্তরকালের উপলব্ধিকে পরিষ্কার হতে সাহায্য করেছে। যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতের সমতলভূমিতে মুক্তি সংগ্রামের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে। হিমালয়ের পাদদেশে, এমন কি পাহাড়ের বুকে ঢেউয়ের দুই একটা ঝাপটা এসে পৌঁছায়নি তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। কেন যে সেই কূলহারা ঢেউয়ের নাচন এখানে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি তার কারণ বুঝেছি বহু বছর বাদে—যখন আন্দামানের নির্বাসনে অনেক সাধনা, সন্ধান ও জিজ্ঞাসার শেষে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে আপন করে নিতে পেরেছি।

সেদিনের দার্জিলিং-এর পরিবেশ কি ছিল! বাংলার মহামান্য লাটবাহাদুরের শৈলাবাস। সুতরাং গ্রীষ্মের সময় বলতে গেলে প্রদেশের গোটা প্রশাসনিক সদর দফতর এখানে স্থানান্তরিত হত। উচ্চ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসতেন উচ্চবিত্তেরা। পার্বত্য শহরগুলি বিত্তবানদের অবসর বিনোদনের রম্যভূমি হয়ে উঠত। শহরের ঘরবাড়ী,হোটেল, রেস্তর াঁ, জীবনযাত্রার ধরন সবটাই ছিল সাহেবী ছাঁচে ঢালা। দার্জিলিং ও কার্শিয়ং ছিল অভিজাত শহর। দেখে হঠাৎ মনে হত বুঝি ইংল্যাণ্ডের কোন নগরীকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরাজী উপন্যাসে ওদেশের পরিবেশ সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা পড়েছি এখানে থেকেই তার সম্পর্কে যেন কিছুটা আভাস পেয়েছি। দেড়শো পৌনে দুশো বছর আগে গোটা জেলাটাই ছিল বিরল বসতি এবং গভীর বনে ঢাকা। বর্তমান দার্জিলিং শহরের জায়গায় ছিল সিকিম রাজের অধীনে লেপচাদের একটি বড় গ্রাম। নাম তার "দোরজেলিং" অর্থাৎ বজ্রের দেশ। এই নামকে অবলম্বন করেই বাংলার তদানীন্তন গভর্নর, চলতি কথায় ছোটলাট সাহেব, লর্ড রোনাল্ডসে বই লেখেন "ল্যাণ্ড অফ দি থাণ্ডার বোল্ট"। সীমান্ত রক্ষার অছিলায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখানে ক্ষমতা প্রসারিত করে। দুর্বল সিকিমের রাজা একদিকে নেপাল এবং অন্যদিকে ভুটানের আক্রমণে বার বার বিপর্যস্ত হচ্ছিল। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সিকিমের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়ে নেপাল ও ভুটানের কবল থেকে অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে। তারপর ধীরে ধীরে নানা অজুহাতে সবটাই গ্রাস করে। শোনা যায় স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে দার্জিলিং প্রথম গুরুত্ব লাভ করে বর্ধমান রাজের এক পূর্বপুরুষের দৌলতে। কবিরাজের উপদেশে তিনি এখানে এসে বাস করেন। গঙ্গার উপরে বিহারে কারাগোলা ঘাট থেকে শিলিগুড়ি শহরের মধ্য দিয়ে মহানন্দা নদী পর্যন্ত প্রসারিত বর্ধমান রোড আজও তার সাক্ষ্য দেয়। ক্রমে ইংরেজ রাজপুরুষ এবং গোরা সৈন্যদের স্বাস্থ্যনিবাস গড়ার তাগিদে দার্জিলিং এর সঙ্গে সমতল

ভূমির যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তারপর আসে চা-কর সাহেবদের দল। তাদের মুনাফা মৃগয়ার তাগিদে জেলার দ্রুত উন্নতি শুরু হয়। হিমালয়ের সানুদেশের বহুশতাব্দীর শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে রেলপথ ও মোটরের রাস্তা তাকে হঠাৎ টেনে নিয়ে এল একেবারে বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে।

পাহাড়ের গা কেটে, স্থনে স্থানে ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড়ের প্রাচীর গুঁড়িয়ে দিয়ে গড়ে তোলা হল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ এবং হিলকার্ট রোড। আঁকা বাঁকা সর্পিল গতিতে নীচে থেকে উপরে ওঠে প্রায় পাশাপাশি দুটি পথ। কয়েকটি চা বাগানকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হল এক একটি রেল স্টেশন। শুকনা হল সমতলভূমি থেকে পাহাড়ে ওঠার ঠিক সন্ধিস্থানে অবস্থিত। তারপর বিচিত্র নামের স্টেশন রংটং, চুণভাট্টি, তিনধারিয়া, গয়াবাড়ী, মহানদী, কার্শিয়ং (স্থানীয় ভাষায় 'খরশাঙ্গ'), টুং, সোনাদা, ঘুম। অনেকগুলি নামে লেপচা ভাষার স্বাক্ষর। হোক না রেল গাড়ীগুলি খেলাঘরের গাড়ীর মত তবু সেগুলিই ত' এই অঞ্চলকে টেনে নিয়ে এসেছে ধনতান্ত্রিক জগতের আবর্তে।

কালের যাত্রা থেমে থাকে না। মানুষের হাতের ছোঁয়া পেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশেও পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের রূপকার যারা সেই মানুষগুলি যে সমাজ ও সভ্যতার প্রতিনিধি তার সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্গে বহন করে নতুন পরিবেশ রূপ পরিগ্রহ করে। পাহাড়ের গা কেটে চা বাগানের পত্তন করতে হবে, জায়গায় জায়গায় সুপ্রাচীন অরণ্য উচ্ছেদ করতে হবে। সেজন্য চাই কঠোর পরিশ্রমী অথচ নিতান্ত অনুগত একদল মানুষ যারা মুখ বুজে মুনাফা শিকারীদের হুকুম তামিল করে যাবে। পাহাড়ের বুক চিরে সোনা ফলাতে হলে চাই পাহাড়ী মানুষ। আড়কাঠির দল ছোটে প্রতিবেশী নেপালে। রাণাশাহীর সামন্তযুগীয় শোষণে জর্জরিত বুভুক্ষু মানুষেরা পূর্বনেপালে পার্বত্যবস্তির মায়া কাটিয়ে সপরিবারে দলে দলে চলে আসে।

আড়কাঠিদের মুখে শুনেছি "চিয়া কো বোট মা সুন ফলছ" (চায়ের গাছে সোনা ফলে)। সেই প্রলোভনে সুখের মুখ দেখার আশায় দুর্গম পথ পাড়ি দেয় তারা। সোনা তারা ফলিয়েছে ঠিকই তবে তা শ্বেতাঙ্গ মালিকদের মুনাফার শিখরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর করে তুলেছে। কঠিন পরিশ্রমে দুরারোহ পাহাড়ের বুকের প্রাচীন অরণ্য নির্মূল করে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগানের পত্তন করেছে। বন্য জন্তুর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে অনেকে। বিনিময়ে পেয়েছে মধ্যযুগীয় দাসত্ব। বিদেশী প্রভুরা চা-বাগিচাগুলিকে অন্ধ কারাগারে পরিণত করে রেখেছিল। বাইরের জগতের আলো যাতে কোন রকমে সেখানে পৌঁছাতে না পারে তার সব রকম ব্যবস্থা ছিল। অন্ধকারার ভিতরে চলেছে কুলি রমণীর ইজ্জৎ আর পুরুষ শ্রমিকদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং নির্যাতনের জগদ্দল পাথরের চাপে বোবা মানুষগুলি নিষ্পেষিত হয়েছে। বুকে দশকের পর দশক ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে অভিশাপ আর চাপা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তা চা-বাগানের চৌহদ্দির মধ্যেই গুমরে মরত। সুন্দর সাজানো শৈলনগরীর বিলাসব্যসনে কোন ব্যাঘাত ঘটত না। তবু কালে ভদ্রে আমাদের কানে বাগানের কুলিদের উপর সাহেব ম্যানেজারের জুলুমের দুই একটি ঘটনার কথা এসে পৌঁছাত। এর বেশি কিছু জানতাম না সেদিন। তরাইয়ের বুকে পথ চলতে অথবা রেলে দার্জিলিং যাতায়াতের পথে সমান করে ছাটা মাইলের পর মাইল সাজানো চা-ঝোপগুলি দেখে মনে হত যেন সবুজের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। কুলিদের উপর জোর জুলুমের কথা শুনেছি কৈশোরে পা দেওয়ার পর, যৌবনের সন্ধিক্ষণে। মনে সঙ্কল্প জেগেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করে যেন এই নিপীড়ন নির্যাতনের অবসান ঘটাতে পারি।

অন্যান্য উপনিবেশের মতই এখানেও বিদেশী শাসকের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এসে পৌঁছেছে। তারা প্রধানত শহরে এবং কৃষক বস্তিতে খ্রীষ্টধর্মের আলোক বিতরণ করে। যে কয়েকটি শিক্ষায়তন

গড়ে উঠেছিল পার্বত্য অঞ্চলে, সেগুলি ছিল তাদের হাতেই। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছাড়া কোন কালা আদমীর পক্ষে সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তবান ঐসব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতেন তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নেকনজরের লোক। যে সব ছেলেরা ঐসব সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসত তারা সাহেবী চালচলনের অনুকরণ-কেই আদর্শ মনে করত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতি আনুগত্যবোধ সঞ্চারিত করে দেওয়া হত তাদের রক্তে মাংসে, অস্থিমজ্জায়।

সীমান্ত এবং চা-মালিকদের স্বার্থরক্ষা ছাড়াও বিদেশী শাসকের কাছে এই জেলার আর একটি বড় গুরুত্ব ছিল গোর্খাসৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি হিসাবে। সেইজন্য সমতলভূমির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ যাতে পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়তে না পারে সেজন্য গভর্নমেণ্টের সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। সেদিন গোটা দার্জিলিং জেলা ছিল শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল। চলতি কথায় শুনতাম নন্ রেগুলেটেড এলাকা। কথা দুটির মধ্যে আইনগত তফাৎ কি জানি না। এইটুকু জানতাম, জেলার প্রধান কর্তার পদটির নাম ছিল ডেপুটি কমিশনার। অন্যান্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের চেয়ে তাঁর হাতে ঢের বেশি ক্ষমতা। কোন ব্যক্তি অবাঞ্ছিত বিবেচিত হলে যে কোন মুহূর্তে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারতেন। এরকম দুই একটি ঘটনা আমার ছেলেবেলাতেই ঘটেছে।

এত আঁটঘাট বাঁধা কড়াকড়ি সত্ত্বেও ১৯২০-২১-এর অ-সহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এখানে এসে পৌঁছেছিল। গোর্খাদের মধ্যে অগ্রণী দেশপ্রেমিকেরা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন দলবাহাদুর গিরি এবং কালিম্পংয়ের জঙ্গবীর সাপকোট্টা। দলবাহাদুর গিরির প্রভাব ছিল চা-শ্রমিকদের উপরে। শ্রমিকদের পুঞ্জিত বিক্ষোভের প্রাথমিক প্রকাশ হয় বাগানে বাগানে

চা-গাছ উপড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে। জেলাশাসক ডেপুটি কমিশনার দল বাহাদুর গিরির উপর বহিষ্কার আদেশ জারী করেন। আদেশ অমান্যের অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জঙ্গবীর সাপকোট্টাও দণ্ডিত হন। দণ্ডের মেয়াদ শেষে মুক্তিলাভের পর দলবাহাদুর গিরি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাকে স্বয়ং মহাত্মাগান্ধী আমন্ত্রণ করে সবরমতী আশ্রমে নিয়ে যান। যদিও অ-সহযোগ আন্দোলন এখানে খুব স্বল্পস্থায়ী হয়, তবুও জনসাধারণের মন থেকে তার প্রভাব মুছে যায়নি। তাই দেখা যায় ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু যখন দার্জিলিং-এ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন উদ্বেল জনতা শবানুগমন করে। শুধু এইটুকু অশুভ সঙ্কেতে ভীত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তার সুপরিচিত একটি অস্ত্রকে ব্যবহার করে। ভেদনীতি, জাতিতে জাতিতে, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী জনসমষ্টির মধ্যে বিবাদ বাধাবার অপকৌশল উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্যলাভ করে। নেপালীভাষী, লেপচা ও দার্জিলিং এ বসবাস-কারী ভুটে অর্থাৎ তিব্বতীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন অবস্থাপন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ইংরেজ সরকারের অনুগত ছিল তাদের সাহায্যে পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে "মধেশিয়া" বা সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মনোভাব উস্কে দেওয়ার পরিকল্পনা রচিত হয়। প্রধানত সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় "নে-ভু-লা"-নেপালী, ভুটে এবং লেপচা এই তিন জন সমষ্টির নামের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে সংগঠনের নামকরণ হয়। তিব্বতী বা তিব্বতীদের বংশধরেরা এখানে "ভোটে" নামে পরিচিত। তিব্বতীদের নিজস্ব ভাষায় তাদের দেশের নাম হল "ভোট"। ভুটানের অধিবাসীরা তিব্বতীমূল থেকে উদ্ভূত। তারা "ডুকপা ভোটে" নামে অভিহিত হয়। নেপালী ভাষায় সমতল ভূমিকে বলা হয় "মধেশ" তাই সমতলবাসীরা হল "মধেশিয়া"। "নে-ভু-লার" সংগঠকদের মধ্যে যারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তারা সিকিম ও তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নানাভাবে সাহায্য

করে প্রসাদপুষ্ট হয়েছিল। সেনাবাহিনীর কর্মচারী বা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত কয়েকজন নেপালী ও লেপচা সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়। "মধেশিয়া রাই" আমাদের উন্নতির পথে প্রধান বাধা— এই ছিল "নে-ভু-লা" র আওয়াজ।

অবশ্য সমতলবাসী কিছু সংখ্যক মানুষেরাও নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছিল। ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখানে আসে মাড়োয়ারী, বিহারী ও বাঙ্গালী ভাগ্যান্বেষীদের দল। জেলার অর্থনীতির সিংহভাগ ছিল ইংরেজদের হাতে—চা-বাগান, হোটেল, সিনেমা হল ইত্যাদি। তারপরই স্থান দখল করেছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। পাহাড়ে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের পাইকারী ব্যবসায় এবং মহাজনীর ক্ষেত্রে তারা ছিল বড় অংশীদার। বিহারীরা ঐ দুটি ক্ষেত্রে ছোট শরিক রূপে কাজ করা ছাড়াও দোকানপাট খুলে বসেছিল। উচ্চ সরকারী চাকুরী, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল বাঙ্গালীদের। কোচবিহার ও বর্ধমান রাজার সম্পত্তি জেলার বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। আমরা শুনেছি দার্জিলিং শহরের অর্ধেকের মালিক ছিলেন কোচবিহারের এবং বাকী অর্ধেকের বর্ধমানের রাজা। সাহেবদের দেখাদেখি সমতলবাসীদের যাঁরা গ্রীষ্মে ও শরতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে আসতেন তাঁরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অভিজাত অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ইত্যাদি। অন্য প্রদেশ বা অন্য ভাষাভাষী মানুষদের, এমন কি নিম্নবর্ণের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের উন্নাসিক মনোভাবের কথা সুবিদিত। যাঁরা বায়ুপরিবর্তনের জন্য আসতেন অথবা স্থায়ীভাবে এখানে বাস করতেন তাঁরা পাহাড়ের মানুষদের কাছে টানার চেষ্টা ত' করেনই নি, উপরন্তু অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এহেন পরিবেশে সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রূপ নিয়েছে প্রধানত বাঙ্গালী বিদ্বেষের। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাতে উস্কানি দিয়েছে, কেননা বাংলার বিপ্লব আন্দোলন তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের কারণ। '৪০ এবং

'৫০-এর দশকেও দেখেছি মাড়োয়ারী ও বিহারী ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করলেও সামাজিক জীবনে, দৈনন্দিন আচরণে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে খুব সহজভাবে মেশেন। চাকুরীজীবী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ব্যবধানকে বাড়িয়ে চলেছেন। উত্তরকালে, বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যখন স্থানীয় মানুষদের মধ্যে থেকে একটা শিক্ষিত অংশের উদ্ভব হয়েছে তারা দেখেছে চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সব কিছু মিলিয়ে ব্রিটিশের ভেদনীতি দীর্ঘকালের জন্য সাফল্য লাভ করেছে।

মোটের উপর, গোটা জেলার আবহাওয়া ছিল অ-রাজনৈতিক, বিদেশী শাসকের বশম্বদ বলাই বোধহয় ঠিক হবে। সেই সঙ্গে ছিল চোখ ধাঁধানো বিলাস ও ব্যসন। গ্রীষ্মে ও শরতে শহরের পথে দেখা যেত সুবেশ, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সমতল থেকে আগত নরনারীর ভিড়। তাঁরা মহাকালের শিখরে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য দেখতেন, দেখতেন টাইগার হিলের চূড়া থেকে সূর্যোদয়, আরও বিচিত্র কত কিছু। তখনকার দিনে অবশ্য ফালুট বা সনদকফু যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। হাটের দিনে গৌরাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, নানা উজ্জ্বল রংয়ের 'মুজেত্র' বা ওড়নাপরা পর্বতনন্দিনীরা দেশী ও বিদেশী আগন্তুকদের মনে মোহ বিস্তার করত। এখানকার মেয়েদের সাজ-পোষাকের দিকে ঝোঁক বেশি। যারা সপ্তাহে ছয়দিন ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় পরে শাকভাত খেয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তারাও হাটের দিনের জন্য ভাল কাপড়-জামা সংগ্রহ করে সযত্নে বাক্সে রেখে দেয়। সপ্তাহান্তে তার সদ্ব্যবহার হয়। সন্ধ্যায় সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, হোটেল, রেস্তরাঁ, সিনেমা হলের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে ওঠে। শহরের মাঝখানটায় গাছপালা নেই, পাহাড়ের গা কেটে ধাপের পর ধাপ ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছে। একটার পর একটা ধাপ উপর থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে। রাতে ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়িগুলিতে বিজলী বাতির পুঞ্জকে দীপালির আলোকমালার মতোই দেখায়। প্রকৃতির

মহান সৌন্দর্যের পটভূমিতে মানুষ শিল্পীর রচিত শহর, ভারতের শৈলাবাসগুলির রাণী। কিন্তু সেই সুন্দরকে লজ্জা দিয়ে তার বুকের মাঝখানে, বলতে গেলে সুরম্য হর্ম্যগুলির ঠিক নীচেই জমে আছে দারিদ্র্যের যে গ্লানি, সেদিকে চোখ পড়ত ক'জনের? যাদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে প্রাচীন বনভূমি পরিষ্কার হয়েছে, বন্যপশুর চারণক্ষেত্র পরিণত হয়েছে মানুষের বিশ্রাম নিকেতনে, তারা কোথায়? ম্যাকেঞ্জি রোড (বর্তমান নাম লাডেনলা রোড), চৌরাস্তা বা ম্যল, জলাপাহাড়, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠ আকৃষ্ট করে অনেকজনকে। অথচ এগুলিরই অন্তরালে দারোগা বাজার, বামুনবস্তি, বুচরবস্তির ঘিনজি গলিতে, ভাঙা ঘরে, দুর্গন্ধ নর্দমার পাশে যাদের প্রাণশক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে চলেছে—যাদের চাপা কান্না আর অসহায় আক্রোশ চা-বাগানের অন্ধকারায় গুমরে মরে—তাদের কথা ভেবে সহানুভূতি জাগত কজন ভ্রমণবিলাসীর মনে? অথচ তাদেরই অবজ্ঞাত, অনশনক্লিষ্ট জীবনের রক্তসিঞ্চনে রূপসী নগরীতে রংয়ের ইন্দ্রধনু রচিত হয়েছে।

বিহারী ও বাঙ্গালী ছোট ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবীদের মধ্যে জনকয়েক দেশপ্রেমিক ছিলেন না তা নয়। তবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের জীবনের যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া ডেপুটি কমিশনারের নোটিশ পাওয়ার ভয় মাথার উপরে খড়্গের মতই সদা উদ্যত। ফলে প্রকাশ্য রাজনীতির আসরে নামার সাহস হত না। এক আধজন ছিলেন নেহাৎ ব্যতিক্রম। মনে পড়ে ১৯৩১ সালের মে মাসে আমরা দুই বন্ধু খানিকটা চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে গান্ধী টুপী মাথায় 'ম্যল'এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সেই বিহারী ভদ্রলোক, যাঁর কথা আগে বলেছি। তিনি ত' নামকাটা সেপাই। ইতিমধ্যে দুবার অ-সহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে এসেছেন। ১৯৩০ সালে রাজসাহী কলেজে ধর্মঘট পরিচালনার ফলে ছাত্রনেতা হিসাবে আমার এবং

সহপাঠী বন্ধুটির নাম পুলিশের খাতায় উঠে গিয়েছে। সেদিন আমরা তিনজন গোটা শহরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। যে সব সুবেশ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বায়ুসেবন অথবা পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন হয়ত তাদের রসভঙ্গ হয়েছিল। তার চাইতে বেশি অবাক হয়েছিলেন তাঁরা আমাদের দুঃসাহস দেখে।

১৯৩২ সালে আর একবার দার্জিলিং ঘুরে গিয়েছি। তারপর থেকে শুরু হয়েছে দীর্ঘ কারাবাসের পালা। ১৯৪৫ সালে দার্জিলিং-এ ফিরেছি এক যুগের বেশি কালের ব্যবধানে। ততদিনে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙ্গার পালা শুরু হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে একটি নেপালী ভাষী নতুন জাতিসত্তা দানা বেঁধে উঠেছে চা-বাগানে কাজ করার জন্য এসেছিল, নেপালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাই, লিম্বু, মঙ্গর, গুরুং, তামাঙ্গ, শেরপা, প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির মানুষেরা। পূর্ব নেপালের রাই, লিম্বুরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। তারা সঙ্গে নিয়ে আসে নিজ নিজ উপজাতির কথ্য ভাষা। কয়েক পুরুষ ধরে চা-বাগানের কারাগারে একই শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার হয়ে পরস্পরের পাশাপাশি বাস করার ফলে ক্রমশ একটা ঐক্যের অনুভূতি বড় হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের সংমিশ্রণে নতুন সত্তা আত্মপ্রকাশ করে। নেপালী ভাষা হয়ে ওঠে ঐক্যচেতনা প্রকাশের মাধ্যম। ততদিনে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী নেপালী ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে গজিয়ে উঠেছে ছোট ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অঙ্কুর। তারা দেখেছে তাদের সামনে বিকাশের ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ। ইতিহাসের নিয়মে অন্য সব স্থানের অনুরূপভাবে এখানেও তারাই হয়েছে জাতীয় চেতনার পথিকৃৎ। নেপালী ভাষী মেহনতী মানুষদের সঙ্গে এই অংশের নাড়ীর টান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং যারা জাতীয় জাগরণের প্রথম ধারক ও বাহক তারা পদদলিত জনগণের দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব করার সঙ্কল্প নিয়ে সংগঠিত হয়েছে। প্রথমে স্থাপিত হয় "গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলন"। তার আশু লক্ষ্য ছিল

সমাজসেবা। তবে অল্পদিনের মধ্যেই নবজাগ্রত চেতনার প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় "অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগ"। নেপালী ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গৌরববোধের অভিব্যক্তি হয়েছে "নেপালী সাহিত্য সম্মেলন" প্রতিষ্ঠায়। নেপালী ভাষায় বেশ কয়েকটি পুস্তক রচিত হয়েছে। লিখিত হয়েছে নেপালী ভাষার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং নেপালী ভাষার ব্যাকরণ। নেপালী কবি ভানুভক্তর জীবনী এবং নেপালী লোককথা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ঘটনাসংঘাত, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের উত্তাল তরঙ্গ এদের প্রভাবান্বিত করেছে। এই অঞ্চল থেকে যারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে এসেছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। তারা যুদ্ধোত্তর বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তরঙ্গ প্রত্যক্ষ দেখে এসেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজেও যোগ দিয়েছিল গোর্খা সৈন্যদের বেশ কিছু সংখ্যক। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সুকৌশলে এই নবজাগ্রত জাতীয় চেতনাকে সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছিল। গোর্খা লীগ নেতৃত্বের মনে সমতলবাসীদের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছিল প্রবল। বাঙ্গালীরাই ত' নতুন উন্মেষিত গোর্খা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সরকারী চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা নাগা বা মিজোদের অনুরূপভাবে বিপথে চালিত হওয়ার খুবই আশঙ্কা ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি নির্দিষ্ট তারিখে ভারত ছেড়ে যাবে ঘোষণা করার পর গোর্খা লীগ নেতৃত্ব নানারকমের পরিকল্পনা করে। একটি পরিকল্পনা ছিল দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স-অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা। তাদের হিসাব ছিল যে আসামে যে সংখ্যক নেপালী ভাষী বাস করে তাদের সঙ্গে মিলে এরা সংখ্যালঘু হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হবে। অপর একটি প্রস্তাব

ছিল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য এলাকাগুলিকে সরাসরি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলরূপে পুনর্গঠন করা। ঐ সময়ে প্রতিবেশী সিকিমে চোগিয়ালের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছিল। তার নেতৃত্ব দান করছিল সিকিম কংগ্রেস অথবা প্রজাপরিষদ। আন্দোলনের একটি দাবী ছিল সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গোর্খা লীগ নেতৃত্ব সেদিকে দৃষ্টি রেখে সিকিমসহ দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স নিয়ে একটি "উত্তরাখণ্ড প্রদেশ" গঠনের আওয়াজ তুলেছিল। সাধারণ মেহনতী মানুষের মনে গোর্খা লীগ নেতৃত্বের বেশ প্রভাব থাকলেও সাংগঠনিক ভিত্তি খুব শিথিল ছিল। নেতারা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখকষ্ট নিয়ে কোন আন্দোলনের কর্মসূচী নেয় নি। সুতরাং তাদের উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি নিছক কাগুজে জল্পনা কল্পনাতেই পর্যবসিত থেকে গিয়েছিল। তবু কে জানে পরবর্তীকালে হয়ত ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিত। নিতে যে পারে নি, তার মূলে প্রধান অবদান কমিউনিস্ট পার্টির এবং রক্তপতাকার নীচে সংগঠিত চা-শ্রমিক আন্দোলনের। '৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে এখানে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা। মেহনতী মানুষের জাগরণের বাণী এবং সেই সঙ্গে ভাষা, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত অংশের শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের আহ্বান নিয়ে আসে রক্তপতাকা। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যেদিন দার্জিলিং শহরে ফিরে এসেছি সেই দিন বিকেলেই তা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হল।

হয়ত সেদিনের সেই দেখায় আমার চোখে স্বাভাবিকভাবেই রোম্যান্টিক রং গাঢ় হয়েই লেগেছিল। একে ত' দার্জিলিং পাহাড়ের বুকে জনজাগরণ আমার বহু বছরের স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলেছে। জেলখানায় বসে যখন খবর পেয়েছি এখানে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়েছে তখন থেকে সেই অনেকদিনের সযত্নে লালিত স্বপ্নের সঙ্গে রক্ত পতাকা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তার উপরে এবার

দার্জিলিং শহরে প্রবেশের পূর্বক্ষণে যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করেছি তা যেন আগামী দিনের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। শিলিগুড়ি থেকে দুপুরের ট্রেণে রওনা হয়েছি। 'ঘুম' স্টেশনে পৌঁছাবার আগে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্টেশনে গাড়ী থামতে শুনি কারা আমার নাম ধরে ডাকছে। গলা বাড়িয়ে দেখি শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইল এবং রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের সংগঠক পূর্ণেন্দু দত্তরায প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে একবছর হিজলী বন্দী শিবিরে ও মেদিনীপুর জেলে কাটিয়েছি। তাঁরা নেমে পড়তে বলায় বিছানা শুদ্ধ নিয়ে নেমে পড়ি। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা দার্জিলিং পেঁছে গিয়েছি। নামার পরে জানতে পারি এটা 'ঘুম' স্টেশন। বন্ধুরা আগামীকাল রাত্রি শেষে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা আমিও সঙ্গী হই। আমারও আগ্রহের অভাব হলনা। এতগুলি বছর ইঁট কাঠ পাথর লোহার আবেষ্টনে মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার উপর এই জেলার মানুষ হলেও টাইগার হিলের শিখর থেকে সূর্যোদয় দেখার সুযোগ হয় নি। রাতে পার্টির দরদী এক ভদ্রলোকের বাসায় অতিথি হয়ে থাকার ব্যবস্থা। নিশুতি শেষরাতে তিন মাইল খাড়া চড়াই পথে যাত্রা শুরু হল। আজকাল যে সব ভ্রমণবিলাসী সূর্যোদয় দেখতে যান তাঁরা দার্জিলিং শহর থেকে ভাড়া করা জীপে বা ল্যাণ্ডরোভারে একেবারে চূড়ায় পৌঁছে যান। তাতে পথকষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা তখনকার দিনে অর্জন করতে হত তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। পাহাড়ের শীত তখনও শুরু হয় নি বটে, সমতলভুমি থেকে সদ্য আগতদের পক্ষে ওটুকুই দুরন্ত শীত। নির্জন পথ, হালকা সাদা 'ফগ' আবছাভাবে পরিবেশের উপর একটা ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। পথের দুপাশে ঘন বন, 'সেঞ্চল ফরেস্টে'র পাইন গাছগুলি পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তাদের চূড়াগুলি ক্রমশ ছুঁচোলো হয়ে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। তলাটা এখনও দুর্ভেদ্য

অন্ধকারে ঢাকা, সেখান থেকে স্তূপীকৃত পাইনকোণের (cone) ভেজা সুগন্ধ ভেসে আসে। পথ যেন ক্রমশ আরো খাড়া হয়ে উঠেছে। যত এগোই ক্লান্তিতে পা ছুটো অবশ হয়ে আসে। চারিদিক নিস্তব্ধ, নির্জন। থামার উপায় নেই। বসার পক্ষেও সুবিধামত স্থান নেই। পাহাড়ী পথ, আঁকা বাঁকা গতিতে উপরে উঠেছে। যত উপরে উঠি ততই ঘন ঘন মোড় নিয়েছে। শেষের মোড়টির পর সামনে এমন চড়াই, মনে হয় বুঝি হেরে গেলাম। আর উঠতে পারা যাবে না। মরীয়া হয়ে উঠতে থাকি। হঠাৎ দেখি একেবারে চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছি। এ অভিজ্ঞতা বুঝি আমাদের সামনের সংগ্রামেরই প্রতীক। কিছুতেই হার মানা চলবে না। তাহলে তীরে এসে ভরাডুবি হবে। দাঁতে দাঁত দিয়ে লেগে থাকতে পারলে লাভ হবে সাফল্যের বাঞ্ছিত পুরস্কার। উপরে খানিকটা জায়গা সমতল করে ইটের গাথুনী দিয়ে মঞ্চ তৈরী করা। মঞ্চের নীচের অংশ ঘেরা। আজকাল সেখানে রেস্তরাঁ বসেছে। তখন ছিল সিমেণ্টের কয়েকটা বেঞ্চি, শ্রান্ত পথিকদের বিশ্রামের জন্য। তবে চূড়ায় পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন যাছুস্পর্শে পথের সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে যেদিকে তাকাই প্রকৃতির মায়াময় সৌন্দর্যের অপরূপ ছবি। আশে পাশের পাহাড়গুলিকে পায়ের নীচে ফেলে টাইগার হিলের শিখর চারিদিকে উদ্ধতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কোনদিকেই পার্বত্য প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। এক এক দিক যেন এক একটি ভিন্ন ধরনের স্বপ্নপুরী। উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর ত্রিশূল পর্বতের তুষার কিরীট। পদতলে অফুরন্ত পর্বতশ্রেণী, শ্যাম, ধূসর, গভীর বনে ঢাকা। দার্জিলিং শহরের পিছনের দিকটা চোখে পড়ে এখান থেকে। সাদা মেঘের পুঞ্জ তার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। দক্ষিণের পর্বতমালা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন এগোতে এগোতে বহুদূরে সমতল ভূমিতে মিলেছে। এখানে দাঁড়িয়ে তরাইয়ের অরণ্যভূমিকে নীল সাগরের মত দেখায়। সূর্য ওঠার আগে আকাশ সেজেছে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়। রমধমুর সব

কটি রং ফুটে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেমন পিছনে ফেলে আসা দিনগুলি রূপোলী পরদায় ছায়াছবির মতন ভেসে উঠেছে মানসনেত্রের সামনে তেমনি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে আগামী দিনের কল্পছবি। সে যাত্রাকে সহজ সরল মসৃণ মনে করি নি। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর সে পন্থা টাইগার হিলের চূড়ায় ওঠার অভিজ্ঞতাকেই প্রতি পদক্ষেপে মনে করিয়ে দেবে।

দার্জিলিং শহরে পার্টি 'কমিউনে' পৌঁছে সারাটা দুপুর ঘুমে অচেতনভাবে কেটেছে। 'ধোবিতালায়ের' সেই 'কমিউন' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন সেখানে বসবাসের নেহাৎ নিম্নতম ব্যবস্থাগুলি ছাড়া কোন বাহুল্য ছিলনা। আরামের প্রশ্নই ওঠে না। একটি তিনতলা বাড়ীর সব চেয়ে নীচের অংশটি ভাড়া নিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা। সঙ্কীর্ণ পরিসর। মাঝের কামরাটি দিনের বেলাতেও অন্ধকার। এসবের জন্য তৈরী হয়েই ত' এসেছি। বিকেল বেলা প্রত্যক্ষ করি অনাগত দিনের জীবন্ত ইঙ্গিত। রক্তপতাকা হাতে নিয়ে শহরের গরীবদের মিছিল বার হয়েছে। এজাতীয় মিছিল এই শহরে প্রথম। খালি পা, ময়লা ছেঁড়া 'দাওরা সুরু আল' (পাহাড়ের মানুষদের দুই প্রস্থ পরিচ্ছদ ঐ নামে পরিচিত) পরনে, অনেকের হাতে মুখে কয়লার কালিঝুলি মাখা—এই ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি। মেয়েরাও রয়েছে, পরণে দুভাঁজ করা শাড়ী, উর্ধ্বাঙ্গে 'চোলি', মাথায় 'মুজেত্র' বা ওড়না। জীবিকা দিন মজুরি। মেয়েদের পোষাক-ও মলিন, কালিমাখা। সরাসরি কর্মস্থান হতে এসে সবাই মিছিলে যোগ দিয়েছে। দাবি খুব বড় কিছু নয়। অন্ততঃ বিত্তবানদের চোখে। "কাঠকয়লার রেশনিং চালুকর"। পাহাড়ের শীতঋতু আসন্ন। উত্তর থেকে ভেসে আসা হিমেল হাওয়া তার আভাস দেয়। আগামী কয়েকমাস সূর্যের মুখ বড় একটা দেখা যাবে না। ঘন গাঢ় কুয়াশা প্রায় সব সময় চারিদিক ঢেকে রাখবে। মাঝে মাঝে কুয়াশার আবরণ সরে গেলে সূর্যের দেখা মেলে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে

মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারী অফিসে, হোটেলে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ঘরে চিমনীতে কাঠকয়লা নতুবা 'বৈদ্যুতিক' হীটার জ্বলে। নতুবা শীতবস্ত্রের প্রাচুর্য সত্ত্বেও হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা নেই। দিনের বেলায় চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে চলাফেরায় অতটা শীত বোধ হয় না কিন্তু রাত্রে তার কামড়টা বুঝিয়ে দেয়। গরীবেরা দিনের বেলায় মেহনতে সময় কাটায় বলে কোন রকমে চলে যায়। কিন্তু রাতে কয়লা জ্বালানো ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অথচ তাদেরই বরাতে কাঠকয়লা জোটা দুষ্কর। যারা দিন ভর কয়লার আড়তে কাজ করে তাদের দশাও চিনির বলদের মতই। বিত্তবানদের চাহিদা মিটিয়ে যতটুকু উদ্বৃত্ত হয় সেইটুকু নিয়ে ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কেননা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান কালোবাজার এই অঞ্চলেও এসে পৌঁছেছে এবং কাঠকয়লার ব্যবসাতে থাবা বিস্তার করেছে।

চকবাজার থেকে স্টেশনের দিকে ডান হাতের রাস্তায় একটু নেমে গেলে কয়লাপট্টি। সেখানে প্রথম দিন সকাল বেলাতেই দেখেছি কয়লার আশায় মেহনতী মেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের বরাত তারা একদিনের রোজগার নষ্ট করে তবে যদি বাঞ্ছিত জিনিস পেতে পারে। দুর্লভ সে পাওয়া। তাদের দাবিকে সংগঠিত রূপদানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। আরম্ভ সামান্য, কিন্তু বিরাট সম্ভাবনায় ভরা। পায়ের তলায় পড়া এতদিনের বোবা মানুষগুলি সংঘবদ্ধভাবে হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। তাদের আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাদের হাতে শক্তমুঠিতে ধরা রক্তপতাকা আন্দোলিত হয়। আমার কল্পনাপ্রবণ মন ভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। দেখে আরও অনেকে। তারা কল্পনা নয়। ঐ উপরে, 'ম্যল' এর একটু নীচে "প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব"—সেটা চা-করদের শুধু খানাপিনা, অবসর বিনোদনের স্থানই নয়, শলাপরামর্শের প্রধান কেন্দ্র। সেখান থেকে শ্বেতাঙ্গ

চা-মালিকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ওদের নিশ্চিন্ত আরাম ও শোষণের ভিত বুঝি এবার টলে উঠবে। তারই কি সূচনা। সেণ্টপলসের চূড়া আর জলাপাহাড়ের সৈন্যাবাস থেকে শ্বেতাঙ্গ পাদরী এবং সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসারেরা দূরবীণ দিয়ে দেখছে। তারা ভাবছে 'সিডিশান' বা 'রাজদ্রোহে'র ঢেউ শেষে এখানেও এসে পৌঁছালো। গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরেরা সাদা পোষাকে ঘোরাঘুরি করছে, চেয়ে দেখছে সতর্ক শ্যেনদৃষ্টিতে। যাঁরা সমতল ভূমি থেকে হাওয়া বদলের জন্য এসেছেন তাঁরাও দাঁড়িয়ে দেখছেন। কেউ হয়ত কৌতূহল, কেউ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। শহরের গরীবদের বুকে লেগেছে এক অজানা অচেনা আলোড়ন। আশা ও সংশয়, সন্দেহ এবং আনন্দ পালা করে দোলা দেয় তাদের বুকে। সেদিনটা ছিল সাপ্তাহিক হাটের দিন। দূর দূরান্তের কৃষক বস্তি আর চা-বাগান থেকে যারা হাট করতে এসেছে তাদের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। তারা আজকার মিছিলের তাৎপর্য বুঝুক না বুঝুক নতুন অভ্যুদয়ের বার্তা বহন করে ঘরে ফিরবে। তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। কয়েকদিন ধরে নানা জনের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে।

অতীত অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠপটে আজকার এই ঘটনাটুকু আমার কাছে আগামী দিনের পদধ্বনি রূপে প্রতিভাত হয়। ষোল সতের বছর আগেকার সেই পরিচিত পরিবেশ, সেই হিলকার্ট রোড প্রায় যেমন ছিল তেমনই আছে। তবু তাকে নতুন মনে হয়। মিছিলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে স্টেশনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ডান দিকে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের প্রাচীর। প্রাচীন দেবদারু আর পাইন গাছের ছায়ায় ঢাকা প্রশস্ত পথ এঁকে বেঁকে উপরে উঠেছে 'মাউণ্ট-এভারেস্ট' হোটেলের দিকে। শহরের মাঝখানটা যেমন বৃক্ষ বিরল, স্টেশনের উপরটা ঠিক সে রকম নয়। সেখানে বহু গাছপালা, দূর থেকে উপবনের মত দেখায়। মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলের সুরম্য উপত্যকার উপরে জলাপাহাড়ের ঘরবাড়ি। কিছুদূর উত্তরে দৃষ্টিপাত

করলে চোখে পড়ে সবুজ পাইন কুঞ্জে ঘেরা মহাকাল শিখর। তারও উত্তরে সবুজের বন্যার বুক চিরে আত্মপ্রকাশ করে তদানীন্তন লাট-প্রাসাদ এবং বর্তমান রাজভবনের নীল গম্বুজ। স্টেশনের দক্ষিণে নীচের দিকে নেমেছে কাকঝোরা। আরও নীচে পৌঁছে তার নাম হয়েছে 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্'। শ্রাবন ভাদ্র মাসে কাকঝোড়ার ফেনিল জলপ্রপাত দুরন্ত উচ্ছ্বাসে খাড়া নীচে বহু নীচে আছড়ে পড়ে, সেখান থেকে অশান্ত বেগে ছুটে চলে সিঞ্চাপংয়ের দিকে, উপত্যকায় পৌঁছে গিরিনদীর জন্ম দেয়। সিঞ্চাপংয়ের উপরে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে চা-বাগান—থাকে থাকে সাজানো। বাগানের মধ্য দিয়ে পাহাড়ী পথের সর্পিল রেখা, এতদূর থেকে মনে হয় যেন এক অতিকায় অজগরের কুণ্ডলী। দূরবীণের সাহায্যে কুলি বস্তির খড়ের বা টিনের চাল দেওয়া ঘরগুলি চোখে পড়ে। আর দেখা যায় ম্যানেজার সাহেবের সুদৃশ্য বাংলো। সাদা রংয়ের গুদাম ঘর আর ফ্যাক্টরির দরজা জানালার কাঁচে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে। খালি চোখে বাংলো আর ফ্যাক্টরিকে হাত খানেক উঁচু খেলাঘরের মত দেখায়। খড়ের ঘরগুলি খালি চোখে নজরে ধরা পড়ে না।

দক্ষিণে ভনজেঙ্গ থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ের আর একটি অতিকায় বাহু দার্জিলিং শহরের প্রায় সমান্তরালভাবে উত্তরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝে অতলস্পর্শী খাদ। পশ্চিমের বাহুটি যেখানে পুলবাজার উপত্যকার দিকে নেমেছে তার শেষ প্রান্তে চুংথুং বাগানের বাংলো ও গুদাম। এগুলিও খেলাঘরের মতনই দেখায়। বাংলোর লাল রংয়ের টিনের চাল যেন চারিদিকের বননীলিমার মাঝে একটি প্রকাণ্ড ফুল ফুটে রয়েছে। আরও পশ্চিমে নেপাল সীমান্তের পর্বতশ্রেণীর ওপারে তখন সূর্য নেমেছে অস্তাচলে। নিবিড় বনরাজি এখন ঘন নীল। বিদায় সূর্যের রশ্মি কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার কিরীটের উপর খেলা করে। অস্তরবির কিরণে ঝকঝকে সাদা বরফের স্তুপ সোনালী রংয়ে রঙীন হয়ে উঠেছে। একটু পরে হবে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ,

ধীরে ধীরে প্রথমে সোনালী তারপর সাদা হয়ে যাবে। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গিয়েছে। সবে মিলে যেন কোন মায়াবী লোকাতীত চিত্রকরের হাতে আঁকা অপরূপ ছবি, এছবি কিশোর বয়স থেকে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। কখনও তরাইয়ের বনপ্রান্তরের বুকে দাঁড়িয়ে, কখনও দার্জিলিং বা কালিম্পং বা কার্শিয়ংয়ের শৈলশিখর থেকে। আমার প্রবাসের সমস্ত কল্পনায়, কারাগারে বন্দী যৌবনস্বপ্নের সঙ্গে তা একাত্মভাবে মিশে আছে। রক্তপতাকা হাতে মিছিলের মধ্যে মিশে পথ চলতে সেই চিত্রপট আমার সামনে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিচিত পরিবেশে এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। পার্বত্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের পটভূমিতে সুন্দরের আর এক রূপের অঞ্জন লেগেছে—চোখে নয়, মনে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মানুষগুলি তাদের সমস্ত আপাত মলিনতা, কুশ্রীতার আবরণ ছিন্নভিন্ন করে নবরূপ পরিগ্রহ করছে। আগামী দিনের প্রতীক ওরা। ওরা হিমালয়ের বুকের ঘুমভাঙ্গা মানুষের প্রাণবন্যার প্রথম ইঙ্গিত।

তখনও হয়ত আমার চোখে স্বপ্নের ঘোর লেগে ছিল। হয়ত কাটেনি পুরোনো দিনের রোম্যান্টিকতার আমেজ। বহু বৎসর জেলখানার বিরামহীন স্বাদগন্ধহীন একঘেয়েমির চাপে ক্লিষ্ট তৃষ্ণার্ত উপোসী মন হয়ত ছোট সূচনা দেখেই কল্পনার পাখায় ভর করে উড়তে চেয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণ পড়ে কেউ কেউ আমার রোম্যান্টিক মেজাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এই রোম্যান্টিসিজমের জন্য সেদিন এতটুকু লজ্জা বোধ করিনি, ত্রিশ বৎসর পরে নতুনভাবে লিখতে বসেও লজ্জিত হওয়ার কারণ খুঁজে পাইনা। দার্জিলিং জেলায় কর্মজীবনের কঠিন অভিজ্ঞতায় পরবর্তীকালে স্বপ্নচারণ ছেড়ে কঠিন মাটিতে নেমে এসেছি। রাজনৈতিক জীবনের ভাল ও মন্দ উভয় দিকের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। সুধাভাণ্ডের সঙ্গে তিক্ততার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবু সেইদিনের অনুভূতি স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয়

হয়ে আছে। সে অনুভূতির রেশ আমাকে সমস্ত তিক্ততা, সাময়িক ব্যর্থতা, ক্ষণিকের হতাশা—সব কিছু অতিক্রম করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কর্মজীবনে স্বপ্নচারণ ছেড়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে এলেও আমার মন নিছক প্রাত্যহিকতা বা তাৎক্ষণিক বিষয়ের বাঁধা ছকে বন্দী হয়ে থাকেনি। সেইজন্যই কখনও পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলিনি। আমার রোম্যান্টিকতা ত' কল্পলোকবাসী ছিল না। তা বাস্তব ছেড়ে ছায়ালোকে পলায়নের পথ খোঁজে নি কখনও। তা হল ম্যাকসিম গোর্কীর সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজম, যা বর্তমানের শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে, পাথুরে মাটির বক্ষ দীর্ণ করে মাথা তুলছে ভাবীকালের যে অঙ্কুর, তাকে জানায় অভিনন্দন। অঙ্কুর আলোকের পানে মুখ তুলে তাকাবে, মহীরুহে পরিণত হবে সেই লক্ষ্য নিয়েই তাকে সযত্নে লালন করতে হবে। আজকার পরিবেশের অঙ্গহানি করে রেখেছে দারিদ্র্যের যে কুৎসিত গ্লানি, লাঞ্ছিত মানবতার দীর্ঘশ্বাস—তার অবসান হবে। প্রকৃতির তুলনাহীন সৌন্দর্যের মাঝখানে মানুষের মহিমার জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত হবে আপন মর্যাদায়। অনাগত দিনের প্রতীক উঠন্ত শক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করব বলেই এসেছি। আজ জীবনের অস্তাচলে পৌঁছে অকুণ্ঠভাবে বলতে পারি বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজমকে বর্জন করলে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সামনে না থাকলে, সংবেদনশীল মনের অধিকারী না হলে বিপ্লবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। অনেক সহকর্মীকে দেখি তাঁরা সে কথা ভুলে গিয়েছেন। রাজনীতির তাৎক্ষণিক মারপ্যাঁচে তাদের মনে দরকচা পড়ে গিয়েছে। তাঁরা মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। গোর্কীর নির্দেশ আমাকে সেরকম অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দার্জিলিং জেলায় স্থায়ীভাবে কাজ করব বলে আসি ১৯৪৬ সালের মে মাসে, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে। মাঝের সময়টা, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে কয়েকটি মাস কলকাতার উপকণ্ঠে একটি চটকল শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষানবিশীর কাজ সেরে এসেছি। তখনকার সংবিধান অনুসারে দার্জিলিং জেলায় বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র ছিল দুইটি— একটি সাধারণ কেন্দ্র, চা-বাগান এলাকা বাদে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত অংশ নিয়ে গঠিত, অপরটি ছিল চা-শ্রমিক কেন্দ্র। চা-শ্রমিক কেন্দ্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা ছিল পালাক্রমে একবার দার্জিলিং এবং পরের বার কার্শিয়ং কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। সেবার ছিল দার্জিলিং কেন্দ্রের পালা। সেখান থেকে নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী রতনলাল ব্রাহ্মণ। কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন লালা সিরিং। তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। রতনলাল ব্রাহ্মণের জয়লাভের পিছনে প্রধান কারণ ছিল দার্জিলিং জেলার প্রাদেশিক পার্টি সংগঠক প্রয়াত সুশীল চ্যাটার্জীর সংগঠন-ক্ষমতা এবং খানিকটা পরিমাণে রতনলালের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা। পাহাড়ের জনগণের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। ভোটের সময় পর্যন্ত অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত গণভিত্তিও খুব বেশি ছিল না। ১৯৪৩ সালে দার্জিলিং শহরে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির অধীনে একটি 'সেল' ছিল। তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত। তবে অতদূর থেকে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রাখা সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া দার্জিলিং-এর পরিস্থিতি ছিল সব দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এখানে পার্টিকে একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসাবে গড়ে

তোলায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন প্রয়াত প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল চ্যাটার্জী। তিনি অনেকটা নিজের উদ্যোগে এখানে এসে কাজ শুরু করেন এবং কিছুটা ভিত্তি গড়ে তোলার পর প্রাদেশিক কমিটি থেকে তাঁকে সংগঠক নিযুক্ত করে। সংক্ষেপে যাকে বলা হত 'পি সি ও'। আমি যখন স্থানীয়ভাবে এখানে কাজ করতে আসি তখন একটি জেলা সংগঠনী কমিটি গড়ে উঠেছে। তাতে ছিলেন সম্পাদক প্রয়াত গণেশলাল সুব্বা ছাড়া রতন লাল ব্রাহ্মণ, ভদ্রবাহাদুর হামাল, প্রয়াত ওয়াংদি লামা, এবং মদন কুমার থাপা। আমি আসার পর প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। তাতে সম্পাদক ছাড়া সভ্য ছিলাম আমি ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে প্রথম জেলা সম্মেলনে নির্বাচিত জেলা কমিটি গঠিত হয়। এবার প্রধানত রাজনৈতিক কারণে সম্পাদক নিযুক্ত হন রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং সম্পাদকমণ্ডলীকে সম্প্রসারিত করা হয়। সম্পাদক ছাড়া সভ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হই গণেশলাল সুব্বা, মদনকুমার থাপা এবং আমি। সুশীল চ্যাটার্জী ১৯৫৩ সালে নিজ জেলা নদীয়ায় ফিরে যান। গণেশলাল সুব্বা ১৯৫২ সালে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত অগ্রসর হন। সেই সময়ে গোর্খাদের মধ্যে যে কয়েকজন স্নাতক ছিল গণেশলাল তাদের অন্যতম। সুবক্তা এবং বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তবে অত্যন্ত কোপন স্বভাবের মানুষ হওয়াতে সেই অনুপাতে জনপ্রিয় হতে পারেন নি। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর রতনলাল ব্রাহ্মণ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ভদ্রবাহাদুর হামাল আছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। মদন থাপা ১৯৪৮ সালে পার্টির থেকে দূরে সরে যান। কিছুদিন পূর্বে তিনি জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন। বর্তমানে মদন থাপা গোর্খালীগের একটি অংশের নেতা। দীর্ঘদিন একসঙ্গে সুখদুঃখের

সাথী হয়ে কাজ করার দরুন এঁদের সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে মানুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে, নিখাদ প্রীতির সম্বন্ধ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। নানা প্রশ্নে মতান্তর হওয়াটা ত' খুব স্বাভাবিক। কিন্তু নানা জানা-অজানা মনস্তাত্ত্বিক কারণে কখন যে ব্যক্তিগত রেষারেষি, ভুল বোঝাবুঝি, পরস্পরের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। তিক্ততা ও মনোমালিন্য জমে উঠতে উঠতে তিল তালে পরিণত হয়, এমনও দেখেছি। আজ জীবনের অস্তাচলে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দ মনে বলতে পারি একেবারে দোষমুক্ত কেউ নয়। দোষের ভাগটা হয়ত কমবেশি হতে পারে। নিজেকে ত্রুটিহীন বলে জাহির করার ইচ্ছা আমার নেই। তবু অনেক ঠেকে, অনেক মাশুল দিয়ে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি। সহিষ্ণুতা বা মানিয়ে চলার চেষ্টা সর্বক্ষেত্রে নিভু'ল নীতি নয়। সহকর্মীরাও দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ। তাদের চরিত্রের কোন একটি দিকের প্রতি চোখ বুজে থাকাটা অনিবার্যভাবে একপেশে সুতরাং ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। যাক সে কথা। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ত' লিখতে বসি নি। নেতাদের চরিত্র বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি লিখতে চাই চা-শ্রমিক আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার বিবরণ। রাজনীতির পাশাপাশি তুলে ধরতে চাই মানবিক উপাদানকে। হয়ত প্রাধান্য পাবে শেষেরটিই। আমার রাজনৈতিক জীবন পাঁচ দশকের বেশি। কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক চার দশক পার হয়ে গিয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সে-ও সাড়ে তিন দশক হয়ে গেল। এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় অনেক জোয়ার ভাঁটা, ভাঙাগড়া, উত্থান পতন চোখে দেখেছি। দেখেশুনে এইটুকু শিখেছি, মানবিক উপাদানকে উপেক্ষা করে, মানবিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে দিয়ে মহান আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়।

আগের কথায় ফিরে আসি। সাধারণ কেন্দ্রে নির্বাচিত হন

গোর্খা লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডম্বর সিং গুরুং। তিনি ছিলেন কালিম্পংয়ের অধিবাসী। কালিম্পং মহকুমার গ্রামাঞ্চলে এবং পার্বত্য এলাকার শহরগুলিতে তাঁর প্রভাব ছিল। অন্যদিকে রতনলাল ব্রাহ্মণ পরিচিত ছিলেন গরীবের বন্ধুরূপে। তাঁর জয়লাভে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যে একটা আশার আলোড়ন শুরু হয়। সেটা শুধু দার্জিলিং কেন্দ্রের চা-বাগানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অল্পবিস্তর অন্যান্য অঞ্চলের চা-বাগান শ্রমিকদের মনেও সাড়া জাগায়। ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'দার্জিলিং জিলা চিয়া কমান মজদুর ইউনিয়ন'-এর সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়েছিল। ইউনিয়ন তদানীন্তন সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুসারে রেজিস্ট্রেশান লাভ করে। ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভদ্রবাহাদুর হামাল। জেলার পার্টি এবং ইউনিয়ন সংগঠক কারুরই শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই ছিল না। তার উপরে চা-বাগান শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিশেষ ধরণের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে তা ছিল ধারণার বাইরে। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচনে জয়লাভের ফলশ্রুতিস্বরূপ শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে অল্পদিনের ভিতরেই শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে তোলা যাবে। পঞ্চাশ হাজার সভ্য সংগ্রহ করা হবে এবং সংগৃহীত তহবিল থেকে ইউনিয়নের জন্য কতজন সর্বক্ষণের কর্মী নিয়োগ করা যাবে তা নিয়েও বেশ জল্পনা শুরু হয়েছিল। ধারণাগুলি যে ছিল কি পরিমাণে অবাস্তব, তার পরিচয় পাওয়া গেল একেবারে প্রাথমিক পর্বেই। শ্বেতাঙ্গ মালিক, জেলা প্রশাসন ও পুলিশী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল অনতিবিলম্বে।

চা-শ্রমিকদের অবস্থা ছিল যেন অনেকটা দাস শ্রমিকদের অনুরূপ, সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। চা-বাগানগুলি ছিল আইনত মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা জমিদারী। মালিকদের বিনা

অনুমতিতে বাগানের এলাকার মধ্যে বাইরে থেকে কারুর প্রবেশের অধিকার ছিল না। শ্রমিকদের সেখানে বাস করা বা না করাও নির্ভর করত মালিকের মরজির উপরে। আইনের সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ বাগানের চৌহদ্দিব মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রবেশ, সভাসমিতি বা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে। সেই সময়ে চটকল মালিকদের পক্ষ থেকেও অনুরূপ বাধা আসত। কিন্তু চটকল শ্রমিকদের বড় অংশ বাস করে মালিকদের নির্মিত বাসস্থানের বাইরে। সেই সব বস্তীতে ইউনিয়ন কর্মীদের যাতায়াতের সুযোগ ছিল। সেখানে বাস করাও যেত। আমি নিজে সেভাবে থেকে এসেছি। কিন্তু চা-বাগানগুলিতে গোটা শ্রমিকবাহিনী সপরিবারে বাস করে মালিকদের দেওয়া বাসস্থানে এবং সেই কুলিবসতিগুলি চা-বাগানের চৌহদ্দির মধ্যেই অবস্থিত। ইউনিয়নের কোন সংগঠক শ্রমিকদের বস্তিতে এসেছে খবব পেয়ে কর্তৃপক্ষ নিকটস্থ থানায় টেলিফোনে খবর দেওয়া মাত্র পুলিশবাহিনী এসে সে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত। অপরাধ—'ক্রিমিনাল ট্রেসপাস' অর্থাৎ অপরের সম্পত্তিতে দুরভিসন্ধিমূলক অনধিকার প্রবেশ। ধৃত ব্যক্তিদের আদালত থেকে জামিন মঞ্জুর করা হত এই শর্তে যে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে ঐ বাগানে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে না। ফলে নবগঠিত ইউনিয়নের স্বল্পসংখ্যক সংগঠকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা হল, অন্যদিকে তেমনি ইউনিয়নের কাঁধে চাপলো এতগুলি মামলা চালনার আর্থিক বোঝা ও গুরুদায়িত্ব। কিছুদিন পরে অবশ্য দুটি ক্ষেত্রে মামলার রায় ইউনিয়নের অনুকূল হওয়াতে এই অসুবিধা কিছু পরিমাণে দূর হয়। তখন কার্শিয়ং-এর মহকুমা হাকিম ছিলেন অশোক মিত্র আই, সি, এস। তিনি রায় দেন যে ইউনিয়ন গড়ার জন্য চা-বাগানের এলাকার মধ্যে প্রবেশকে 'ক্রিমিনাল ট্রেসপাস' রূপে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ চা-বাগানগুলির মধ্য

দিয়ে গিয়েছে পূর্ত বিভাগের যে সব সড়ক সেখানে সভা করলে বাগানের মালিকপক্ষের আপত্তি করার অধিকার নেই, কেননা ঐ সড়কগুলি চা-বাগান মালিকদের এক্তিয়ার বহির্ভূত। অবশ্য উপরোক্ত রায় দেওয়ার আগে মালিকপক্ষের পাল্টা আক্রমণের প্রথম পর্যায়টি শেষ হয়ে গিয়েছে।

পাল্টা আক্রমণের অন্যতম বা প্রধানতম হাতিয়ার ছিল 'হটাবাহার' প্রথা। শুধু পার্বত্য অঞ্চলেই নয়, তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতেওএকই প্রথা প্রচলিত ছিল। সমতলের চা-বাগানগুলিতে এটি 'হপ্তাবাহার' নামে পরিচিত। হটাবাহার প্রথার অর্থ সোজা কথায় মালিকপক্ষের হুকুমে কোন শ্রমিক পরিবারকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বাগানের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এর তাৎপর্যটি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। চা-বাগানগুলির যখন পত্তন হয় তখন কুলি আমদানি করা হয়েছিল এক একটি গোটা পরিবারকে ইউনিট হিসাবে গণ্য করে। শুধু পরিবারের কর্তাকেই নয়, তার স্ত্রী এবং কিশোর পুত্র বা কিশোরী কন্যাকেও কাজে নিযুক্ত করা হত। মালিকপক্ষের থেকেই তাদের বসবাসের জন্য ঘর এবং তার সংলগ্ন একফালি জমি দেওয়া হত ব্যক্তিগত চাষের জন্য। ঐ জমিতে পার্বত্য অঞ্চলে শ্রমিকেরা 'মকাই' বা ভুট্টা এবং এলাচের চাষ করত। এই ব্যবস্থা ছিল কাজে নিযুক্তিরই একটা অঙ্গ আর তার প্রচলন হয়েছিল মালিক-পক্ষেরই স্বার্থে। চা-বাগানগুলি এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বাগানের এলাকার বাইরে থেকে এসে শ্রমিকেরা কাজ করে যাবে তা সম্ভব নয়। পার্বত্য অঞ্চলে ত' নয়ই, তরাই বা ডুয়ার্সের বাগান-গুলিতেও সম্ভব ছিল না। এইসব অঞ্চলে বাইরে থেকে আমদানি করা 'গিরমিটিয়া' অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ মজুরেরাই বনজঙ্গল কেটে বাগানের পত্তন করে। তারপর থেকে তারা পুরুষানুক্রমে, অন্ততঃ তিনপুরুষ ত' বটেই, চা-বাগানেই কাজ ও বসবাস করে এসেছে। আদি বাসভূমির সঙ্গে অনেক পরিবারের সম্পর্ক হয় একেবারে ছিন্ন নতুবা ক্ষীণ হয়ে

গিয়েছে। অন্ততঃ দুই পুরুষের বা প্রজন্মের জন্মস্থান চা-বাগানেই। এখানেই তাদের আশৈশব বিচরণ ভূমি এবং মালিকদের দেওয়া কুটিরই পারিবারিক ভিটেমাটিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কোন শ্রমিক পরিবারকে বাগানের চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার অর্থ শুধুমাত্র কাজ থেকে বরখাস্ত নয়, উপরন্তু পুরুষানুক্রমিক ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা। অন্য বাগানে কাজ ও আশ্রয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এক একটি ম্যানেজিং এজেন্সীর দ্বারা অনেকগুলি বাগান পরিচালিত হয় আর মালিকেরা 'ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশান' বা সংক্ষেপে 'আই, টি, এ'তে সঙ্ঘবদ্ধ। ভারতীয় মালিকদের সংগঠন ছিল 'ইণ্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশান' বা 'আই, টি, পি, এ'।

আইন রচিত হয়েছে মালিকেরই স্বার্থে। আইন অনুসারে বসবাসের জন্য কুটির দেওয়া হয়েছে পরিবারের কর্তার নামে এবং কুটিরে বসবাসের অধিকার ততক্ষণই যতক্ষণ সে বাগানের কাজে বহাল আছে। কাজে বহাল থাকা না থাকা নির্ভর করে মালিকপক্ষের মর্জির উপর। 'হটাবাহার' প্রথাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিষ্ঠুর মনে হলেও তার বিরুদ্ধে বাইরে জনমত গঠন করার মত অবস্থা তখনও সৃষ্টি হয়নি। কেননা সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে 'হটাবাহার'এর ঘটনা ছিল বিরল। মাঝেসাঝে দুই একটি পরিবারের ক্ষেত্রে উক্ত প্রথার প্রয়োগ বাদবাকি সমস্ত শ্রমিককে ভয়ে নীরব করে রেখেছে। মালিকপক্ষ আইন এবং প্রথা উভয় দিক থেকেই 'হটা-বাহার' করার অধিকার দাবী করে এবং 'দার্জিলিং জিলা চিয়া কমান ইউনিয়ন'এর শাখার নেতা কিংবা উৎসাহী কর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।

'হটাবাহার' ছাড়াও প্রত্যেক সংগঠিত বাগানে নিয়মিত পুলিশী হামলা, গ্রেপ্তার আর পুলিসের সহায়তায় মালিকের ভাড়া করা গুণ্ডারা শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। মালিকপক্ষের পাল্টা আক্রমণের জবাব শ্রমিকেরা দিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত-

ভাবে। ইউনিয়ন নেতৃত্ব সুপরিকল্পিতভাবে কোন কর্মসূচী নিয়ে এগোতে পারে নি। রেশনকাটা, হটাবাহার, মারপিট, ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি নানা ধরনের জুলুমের প্রতিবাদে কোথাও কোথাও ধর্মঘট হয়েছে। অন্য কোথাও প্রতিবাদের অভিব্যক্তি হয়েছে ভিন্ন ধরনে। নিজেদের অগ্রণী সাথীদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে 'সুম' চা-বাগানের শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ম্যানেজারের টেলিফোন পেয়ে দার্জিলিং শহর থেকে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী গিয়ে বিক্ষোভের নেতা ও নেত্রীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে সমস্ত শ্রমিক মিছিল করে শহরে চলে আসে। 'ধজে' বাগানের মজুরেরা ওয়েলফেয়ার অফিসারের দুর্ব্যবহারের জবাব দেয় খুকরী খুলে। উত্তরে 'পান্দম', 'ফুবসিরিং' থেকে শুরু করে চুণভাট্টি স্টেশনের নীচে 'নরবুং' অর্থাৎ পাহাড়ের চা-বাগান এলাকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শ্রমিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। চা-বাগানগুলির প্রায় একশো বৎসরের প্রাচীন নিস্তব্ধতা সেই ঝড়ের হুঙ্কারে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

মালিকপক্ষের আক্রমণের সামনে বাগানগুলিতে সাময়িকভাবে পিছু হটতে হলেও পশ্চাৎপদ চা-শ্রমিকেরা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। ইউনিয়নের ডাকে দার্জিলিং শহরের সমাবেশে যোগ দিতে দূর দূরান্তের বাগান থেকে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে আসে মিছিলের পর মিছিল। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই মিছিলে যোগ দিয়েছে। তাদের বেশির ভাগের পক্ষে জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেদিন পর্যন্ত অনেকেই নিজেদের বাগানের চৌহদ্দির বাইরে রয়েছে যে দুনিয়া, তার সম্বন্ধে কোন খবরই রাখত না। অনেকেই এই প্রথম দার্জিলিং বাজার চোখে দেখে। অশীতিপর বৃদ্ধাও এসেছে নাতির হাত ধরে, বাগানের অন্ধকারার বাইরের আলো হাওয়ার ছোঁয়া পাবে বলে।

অত্যাচার ও দমননীতির সামনে ভেঙে পড়ার বদলে শ্রমিকদের

প্রতিরোধ নেপালী ভাষী জনগণের অন্যান্য অংশের, বিশেষভাবে শহরের শিক্ষিতদের বুকেও আলোড়ন জাগায়। এতদিন পর্যন্ত সদ্যউন্মেষিত ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে নেপালীভাষীদের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা প্রধানত সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত। "মদেশীয়া" অর্থাৎ সমতলবাসী অথবা 'উধোঁ কো মানছে' বা নীচের অঞ্চলের মানুষ কথাগুলি ব্যবহৃত হত অবজ্ঞাসূচকভাবে। নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা গোর্খালীগের নেতৃত্বে সমতলবাসী বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হয়েছিল। ফলে আসল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ নজরের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া উঠতি মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে চালিত আন্দোলনও ছিল নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের কাঠামোর মধ্যে বন্দী। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ চা-মালিক এবং শ্বেতাঙ্গ শাসকের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে চা-শ্রমিকদের লড়াই নেপালী-ভাষীদের জাতীয় আন্দোলনের রূপ বদলে দিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পতাকা বয়ে তার পুরোভাগে এসে দাঁড়াল সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন।

গোর্খালীগ নেতৃত্ব গোড়ার দিকে চা-শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেছিল। তার কারণ ছিল দুটি। প্রধান কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনকে তারা নিজেদের প্রভাবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেছিল। সেইজন্য নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাদের প্রচারের মূল আওয়াজ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি বাঙ্গালীদের 'পুছর' বা লেজুড়। পার্টির দুজন মুখ্য সংগঠক বাঙ্গালী হওয়াতে তারা খানিকটা সুযোগ পায়। দ্বিতীয় কারণটি গৌণ হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে উপেক্ষণীয় নয়। সেটি বুঝতে হলে একটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন। বাগানগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কেরাণী, সর্দার ইত্যাদি ছিল সাধারণত গোর্খালীগের সমর্থক। বাগানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় এরাই শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার এবং শ্রমিকদের মাঝে যোগসূত্র রূপে কাজ করে। ম্যানেজারের আদেশ, নির্দেশ, হুকুম ইত্যাদিকে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এদেরই

মাধ্যমে। জুলুম জবরদস্তির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে এরাই। তাছাড়া এদের নিজেদের তরফ থেকেও অশিক্ষিত শ্রমিকনরনারীর উপর কিছু কিছু জুলুম জবরদস্তি করা হয় না এমন নয়। সুতরাং আন্দোলনের একেবারে গোড়ার পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের শিকার হয়েছিল এই শ্রেণীর লোকেরাই। পরে অবশ্য ইউনিয়ন ও পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ভুলটা শুধরে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনকে পরিচালনা করা হয় প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে। দার্জিলিং শহরে জনসভায় চা-শ্রমিক আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রকৃতিকে সামনে তুলে ধরা হয় এবং দলমত নির্বিশেষে সকলে যাতে পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সেজন্য আবেদন জানানো হয়। তাতে কিছুটা সুফলও পাওয়া যায়। গোর্খা লীগের নেতারাও জনসভা ডেকে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বকে সঠিক রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনে সাহায্য করেন বিশেষভাবে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী। দার্জিলিং জেলার নেতৃত্বকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রাদেশিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাঁকে ঐ সময়ে পাঠানো হয়েছিল।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মালিকপক্ষ ও পুলিশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও আন্দোলনকে সাময়িকভাবে বেশ বে-কায়দায় পড়তে হয়েছিল। সদ্য গঠিত ইউনিয়নের সংগঠন ছত্রভঙ্গ হওয়ার অবস্থা। এক্ষেত্রে পালটা কোন সামগ্রিক কর্মসূচী নেওয়া ছাড়া অচল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার আশা নেই। অথচ আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বেই যদি সম্পূর্ণভাবে পিছু হটতে হয় তাহলে সে জের কতদিনে কাটিয়ে ওঠা যাবে কে জানে। পাঁচুবাবুর সঙ্গে পরামর্শের পর দ্বি-মুখী কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। একদিকে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হবে এবং অন্যদিকে শহরাঞ্চলে চা-শ্রমিকদের দাবীর

সমর্থনে রাজনৈতিক প্রচার অভিযান, গোর্খালীগ নেতৃত্ব এবং নেপালী ভাষী শহুরে বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ তথা আলোচনার দ্বারা তাদের সমর্থন আদায় করা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের যখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা তখন সাধারণ ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়াটা কি বাস্তবোচিত পন্থা ছিল ? কিন্তু চা-শিল্পের বিশিষ্ট চরিত্রের কথা মনে রাখলে নেটিশের তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে। চা-শিল্প হল কৃষি ভিত্তিক এবং মরশুমী শিল্প। এপ্রিল-মে মাসে প্রথম বৃষ্টি পড়ার পর চা-গাছে নতুন পাতা গজায় এবং নতুন পাতার প্রাচুর্য দেখা যায় পরবর্তী দুইতিন মাসে। এই সময়টি "ফ্লাশপাত্তি" নামে পরিচিত। ঠিক ফ্লাশপাত্তির সময়ে যদি অনেকগুলি বাগানে যুগপৎ পাতা তোলার কাজ বন্ধ থাকে, তাহলে সেই বছরের মত মালিকপক্ষের বিরাট লোকসান হয়। সুতরাং সংগঠনগত শক্তি আমাদের যাই থাকুক না কেন, সাধারণ ধর্মঘটের ডাকে শ্রমিকেরা কতটা সাড়া দেবে না দেবে সে সম্বন্ধে মালিকপক্ষেরও খুব নিশ্চয়তা ছিল না। ধর্মঘটের হুমকিকে উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শ্রম আইন অনুযায়ী ধর্মঘটের নোটিশ মালিকপক্ষ এবং সরকারী সহকারী লেবার কমিশনারের কাছে পাঠাতে হয়। নোটিশ পাওয়ার পর মালিকপক্ষের টনক নড়ে এবং সহকারী লেবার কমিশনারের অফিস থেকে মধ্যস্থতার প্রস্তাব আসে। গভর্ণমেন্টের দিক থেকেও সাধারণ ধর্মঘটের সম্ভাবনা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমতলভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে তখন শ্রমিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছে। শিল্পের পর শিল্পে ধর্মঘট, রাজনৈতিক ধর্মঘট, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলেও সেই ঢেউয়ের ধাক্কা এসে পড়ুক সেটা গভর্ণমেন্টের কাম্য ছিলনা।

সাধারণ ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে জেলা কমিটিতে

কোন মতভেদ হয় নি কিন্তু গোর্খালীগ নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সম্বন্ধে জেলা নেতৃত্বের প্রবল আপত্তি ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে কংগ্রেসের কোনদিনই গণভিত্তি গড়ে ওঠেনি। যে সময়ের কথা বলছি তখন ত' নয়ই। সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ছিল দুটি, গোর্খালীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি। উভয়েই পরস্পরকে পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গণ্য করত। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও যে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চলে এই সত্যটি গোর্খালীগ নেতৃত্বের পক্ষে উপলব্ধি করা স্বভাবতই কঠিন ছিল কিন্তু জেলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বকেও এই সত্যটি বোঝানো আদৌ সহজ ছিলনা। উপরন্তু, রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং গণেশ লাল সুব্বা উভয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বে গোর্খালীগের নেতৃস্থানীয় সভ্য ছিলেন। সুতরাং গোর্খালীগের তদানীন্তন নেতাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও স্বাভাবিকভাবেই ছিল অত্যন্ত তিক্ত। যাহোক আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা শেষ পর্যন্ত গোর্খালীগের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সম্মতি দান করেন, তবে ব্যক্তিগত ভাবে সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। দায়িত্বটা এসে পড়ে প্রধানত আমার এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার যে বিশেষ প্রতিনিধিকে দার্জিলিং-এ পাঠানো হয়েছিল তাঁর উপর। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম যোগাযোগটা তিনিই করেন। গোর্খালীগ নেতারা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেন যে শ্রমিকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা রাজী আছেন তবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যৌথভাবে নয়, নিজেদের পৃথক মঞ্চ থেকে। তখনকার পরিস্থিতিতে সেটারও গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না।

মালিকপক্ষের সঙ্গে যা আলোচনা হয় তা সহকারী লেবার কমিশনারেরই মারফতে। অন্য কোথাও তখন ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল কিনা জানিনা। দার্জিলিং-এ অন্ততঃ হয় নি। আইনগত অবস্থা তখন কি ছিল তাও আমার সঠিক জানা নেই।

তবে শ্বেতাঙ্গ চা-মালিকেরা শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসতে কিছুতেই রাজী নয়। সহকারী লেবার কমিশনারের অনুরোধে শ্রমিকপক্ষ আলোচনা চলা কালে ধর্মঘট স্থগিত রাখতে সম্মত হয়। মালিকপক্ষ থেকে সীমিত ভাবে চা-বাগানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। সীমিত অর্থে বলছি এইজন্য যে মালিক-পক্ষের স্বীকৃতি ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ রেজিষ্ট্রিকৃত ইউনিয়নের সভ্য এই অপরাধে কোন শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার পথে কোন বাধা সৃষ্টি, যথা, রসিদ বই কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি হবে না—মাত্র এইটুকু প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাদের তরফ থেকে। বাদবাকি অন্যান্য দাবী যথা মজুরী বৃদ্ধি, হটাবাহার প্রথা রহিত করা ইত্যাদি সম্পর্কে মালিকপক্ষ কোন কথাই বলতে রাজি নয়। তবু আলোচনা শেষে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। সে শক্তি আমাদের ছিল না। মোট লাভ হল এইটুকু যে মালিকপক্ষ এবং পুলিশের সন্ত্রাসের প্রচণ্ডতা খানিকটা হ্রাস পেল। ইউনিয়ন পেল প্রথম আক্রমণের চোট সামলে উঠে খানিকটা দম নেবার ফুরসত।

অঙ্কের হিসেবে লাভলোকসানের নীট ফলাফল যাই হোক না কেন, আমার চোখে এই অধ্যায়ের রাজনৈতিক তাৎপর্যটাই বড় হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিল পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের প্রথম সচেতন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। সাময়িক ভাবে পিছু হটতে হলেও শ্রমিকেরা পরাজিতের মনোভাবের সামনে আত্ম-সমর্পণ করে নি। তাদের মনে জেগেছে নতুন বিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা-বোধ। শহরের মানুষদের চেতনায়ও তা প্রতিফলিত হয়েছে। আর সমতলভূমির মানুষদের কাছে যেখানে যতটুকু সম্ভব 'গোর্খা' (পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে নেপালী ভাষীরা গোর্খা বা গুর্খা নামেই সমধিক পরিচিত। এমন কি এরা নিজেরাও গোর্খা বলেই আত্মপরিচয় দিতে অভ্যস্ত ছিল) শ্রমিকদের সংগ্রামের কাহিনী পৌঁছে দেওয়া গেছে

সেখানে তা নতুন সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের মানুষ এতদিন শুধু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গোর্খা সৈন্য এবং গোর্খা পুলিশকেই দেখেছে। তারা ব্রিটিশের প্রতি গোর্খাদের বিশ্বস্ততার কথাই জেনেছে। এবার দেখা পায় অন্যরূপে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অংশীদারের ভূমিকায়। দার্জিলিং পাহাড়ের সংগ্রামের কাহিনী কয়েকটি হিন্দী প্রবন্ধে বিবৃত করে প্রয়াত বিপ্লবী এবং প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক যশপাল সম্পাদিত 'বিপ্লব' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম। আমার হিন্দী লেখার ভুলত্রুটি সযত্নে সংশোধন করে নিয়ে যশপাল তাঁর পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের শিরোনামা দিযেছিলেন তিনি নিজেই "আংগরেজোঁ কে ওয়াফাদার গোর্খোঁ মেঁ জাগৃতি" অর্থাৎ ইংরাজদের বশম্বদ গোর্খাদের জাগরণ।

আমার কাছে তখন সেই জাগরণের মানবিক দিকটিই সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপূব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছিল। বহুদিন ধরে পায়ের তলায় পড়ে থাকা নিপীড়িত বোবা মানুষগুলি আলোকের দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। নবচেতনার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে তাদের মনের পাঁপড়িগুলি ধীরে ধীরে শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে। এক নতুন সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তাদের প্রাণে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে। আমি সেই অপরূপ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, এই কথাটি তখন সমস্ত অনুভূতিকে জুড়ে রয়েছে। কত ছোট বড় ঘটনার অভিজ্ঞতা, কতদিনের কত ছবি মনের মণিকোঠায় অমর চিত্রকল্পের মত স্থান করে নিয়েছে। রবিবারে হাটের দিন দার্জিলিংয়ের বাজারে মানুষের ভীড় উপচে পড়ে। সুদূর বস্তি থেকে শাকসবজী ফলমূল ইত্যাদি বেচতে আসে পাহাড়ী কৃষক নরনারী। আশেপাশের বাগানগুলি থেকে চা-বাগানের শ্রমিকরাও আসে। হাটের দিনে বহু মানুষের মেলা তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটু রং বুলিয়ে দেবে এই আশায় অনেকে সপ্তাহের রক্তজল করা খাটুনির পয়সা 'রকশির' (এখানকার বহুল প্রচলিত দেশী মদ) দোকানে ঢেলে দিয়ে আসত।

এখনও সবাই সে অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তবু এক নতুন নেশা তাদের পেয়ে বসেছে। তাহল নতুন জীবনের কথা শোনার নেশা। ইউনিয়ন অফিসে তিলধারণের ঠাঁই থাকে না। সেখানে তারা শোনে সমতল ভূমিতে এবং দূর দূরান্তর অনেক দেশে তাদেরই মতন মেহনতী মানুষদের লড়াইয়ের কাহিনী। আর শোনে সেই দেশের কথা যেখানে তাদেরই মতন নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষেরা ঐক্যের শক্তির জোরে প্রথম নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটিয়ে ধূলির ধরণীতে মানুষের জীবনে আনন্দের স্বর্গ রচনা করেছে। মহান সোভিয়েত ভূমির কাহিনী, অক্টোবর বিপ্লবের বাণী হিমালয়ের বুকের পশ্চাৎপদ মানুষগুলির অন্তরে এক মহান ভবিষ্যতের প্রেরণা জাগায়। নেতাদের মুখে শোনা কথার মাধ্যমে বিশ্বের প্রগতিশীল মানবতার নেতা মহান লেনিন, স্তালিন, পাহাড়ী জনতারও আপনার জনে পরিণত হন।

ইউনিয়ন অফিস ঘরটি অত্যন্ত ছোট, কোন জানালা নেই। তিন দিকে টিনের বেড়া, পিছনে পাহাড়ের দেয়াল। একটিমাত্র দরজা দিয়ে ঘরে আলো বাতাস ঢোকে। ঘরে ঢুকবার মুহূর্তে দরজার বাইরে থেকে পিছনের দেয়ালের দিকে চাইলে মনে হয় যেন গুহার মধ্যে প্রবেশ করছি। অপরিচ্ছন্ন, অনেকদিন স্নান না করা মানুষগুলির গায়ের গন্ধে আর নিঃশ্বাসে ঘরের ভিতরটা গুমোট ভারী হয়ে ওঠে। 'রকশির' নেশা নিয়েও আসে দুই একজন, তারা কোন উপলক্ষ্য নিয়ে অনর্গল বকে চলে। আমার মধ্যবিত্ত মন প্রথমটা বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা শুধু ক্ষণিকের জন্য। ঘরের গুমোট আবহাওয়া ছাপিয়ে, বাইরের মলিনতা আর নোংরামির আবরণ ভেদ করে বড় হয়ে ওঠে একটি পরম উপলব্ধি। আশেপাশের এই মলিনতার মধ্য থেকেই ত' নবজীবনের অঙ্কুর মাথা তুলছে আকাশের দিকে।

এদের মধ্যে রয়েছে যারা তাদের অনেকেই চা-শ্রমিকদের লড়াইতে প্রথম অধ্যায়ের বীর নায়ক নায়িকা। দুদিন আগে হয়ত কেউ

তাদের নামও জানত না। প্রকৃত অর্থে নাম বলতে যা বোঝায় এখনো তা অনেকের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত। কেননা এরা নামের বদলে 'মায়লা' (মেজো), সাঁয়লা, (সেজো), 'কানছা (ছোট) বা মায়লী, সাঁয়লী, কানছী নামেই পরিচিত। তফাতের মধ্যে পদবীটুকু। কেউ মায়লা রাই, কেউ 'জোঠ' (বড়) লিম্বুনী, কেউ কানছা গুরুং নামে পরিচিত। এটাই এদেশের সামাজিক রেওয়াজ। রতনলাল ব্রাহ্মণ সর্বত্র পরিচিত 'মায়লা বাজে' বা মেজো বামুন নামে। 'বাজে' শব্দটির অবশ্য আরো অর্থ আছে যথা ঠাকুর্দা, কর্তা ইত্যাদি। লক্ষ চা-শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষত্বহীন একজন হয়ে এদের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে। তারাও জানতনা যে সংগ্রামের দীপশিখা উচুঁতে তুলে ধরার গৌরব অর্জন করবে। এখানে এসে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। এক বাগানের বীর শ্রমিক মন দিয়ে শোনে অন্য এক বাগানের বীর নায়ক বা নায়িকাব কথা। অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়। নিজেদের জীবন্ত অভিজ্ঞতায় তাদের সামনে সংগ্রামী ঐক্যের রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। বৃহত্তর এক দুনিয়ার আহ্বান ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ঐযে এক কোণে বসে আছে 'জেঠি লিম্বুনী', মাথার চুলে পাক ধরেছে তবু শক্ত সমর্থ চেহারা, মুখে সলজ্জ হাসি। ওকে দেখে কে বলবে যে এই বুড়ীই একদিন 'সুম' চা-বাগানে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে ম্যানেজারের অফিসে চড়াও হয়েছিল সকলের দাবী জানাতে, গোরা পুলিশ সাহেবের হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়েছিল! সেদিনও আর দশজন কুলি মেয়ের মতই সকাল না হতে 'পাতির' টুকরি মাথায় ঝুলিয়ে কাজে গিয়েছিল, দুপুরের পাতি ওজনের সময় লাইনে নিজের জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত নিরীহভাবে। কেরাণীবাবু ম্যানেজার সাহেবের হুকুমে কয়েকজন শ্রমিকের তোলা 'পাতি' ওজন করতে অস্বীকার করায় হঠাৎ সবার ধৈর্যের বাঁধ টুটে যায়। কেরাণীবাবুর সঙ্গে কথা কইতেও যাদের মধ্যে ফুটে উঠত

একটা অসহায় বিনম্র ভাব, তাদেরই একজন আকস্মিকভাবে সকলের সমবেত প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। সেই ভূমিকা যে নেবে সে কথা কি 'জেঠি লিম্বুনী' নিজেও কোনদিন ভেবেছিল! ওদের সবারই মনে আজ জেগেছে প্রাণবন্যার আলোড়ন—সেই আলোড়নই ত' ওকে এনে দাঁড় করিয়েছে সংগ্রামী শ্রমিকদের একেবারে প্রথম সারিতে, সম্মানের আসনে।

শক্ত সমর্থ গড়ন যুবতী মেয়ে মধুমায়া। কালো রং, উঁচু চোয়াল, চ্যাপ্টা মুখের আদল, সুন্দরী নয় আদৌ। তবু, নারীর ভূষণ যে ব্রীড়া পুরুষের দৃষ্টিতে মনোরম তার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত নয়। কথার জবাব দিতে ওর গাল দুটিতেও লজ্জার রক্তিম আভা দেখা দেয়। ওর দুনিয়ার পরিধি কতটুকু! লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি। ওদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই পায়নি। দেখে কে বলবে যে ঐ মেয়েটি 'খুকরী' হাতে মালিকের দালালদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে! বেশী কথাও বলে না মেয়েটি। কোন কাজের ভার দিলে সলজ্জ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। সেই ভঙ্গিটিই ওর বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দেয়।

পরিচয় হয় আরো অনেকের সঙ্গে। পান্দম চা-বাগানের বুড়ো 'বাজে' পূজাপাঠ ছেড়ে আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়েছে। এককালে পাতা তোলার কাজও করত। এখন ছেলেরা করে। বুড়োর যজমান বাগানের কুলিরাই। তাই পূজাপাঠ আর ব্রাহ্মণের ছুঁৎমার্গ তাকে সবার লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। কপালে আঁকা রক্তচন্দনের ত্রিপুন্ড্রক, খাওয়া ছোঁয়া সম্বন্ধে বাছবিচার যায়নি এখনও। কিন্তু মনে জেগেছে নতুন আন্দোলনের কথা জানার অনির্বাণ আগ্রহ। সবার সঙ্গে বসে শোনে—ব্রতকথা শোনার মতই শ্রদ্ধা আর কৌতূহল নিয়ে। কতজনের কথা আলাদা করে বলব! এমনি অনেকেই রয়েছে। অনাগতের শিল্পী এরা, ভাস্করের মতন হিমালয়ের কঠিন পাষাণে ভাবীকালের রূপ ফুটিয়ে তুলছে। শিলাতলে রেখে

যাচ্ছে বলিষ্ঠ পদচিহ্ন ; বহুজনের পায়ের রেখায় আঁকা পথের নিশানা। আজ যারা এসেছে সবাই হয়ত সমানভাবে সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবে না। কেউ হয়ত পথের কষ্টে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে থেমে যাবে। কিন্তু সেই কাফিলার অগ্রদূত এরা। এদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলবে আরও কত অজ্ঞাত অপবিচিত পথিক, আগামী দিনের কত বীর সেনানী, নেতা, কত নাম হীন শহীদ। তাই ওদের ছেড়া, ময়লা, দুর্গন্ধ কাপড়জামা, প্রসাধনহীন রুক্ষ কেশবেশের দৈন্য, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর কপোল—সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে একটা উজ্জ্বল আলোক শিখা, ভবিষ্যতের অনিন্দ্য জ্যোতি।

ওদের কারুরই দাবী তুচ্ছ করার মত নয়। কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে বলে ত' শেষ করা যাবে না। তবু একজনের কথা বিশেষভাবে বলতেই হবে। সে হল ওয়াংদি লামা, অগ্রণী নেতাদের অন্যতম। সে ছিল কৃষক, নিজ হাতে সিঁড়ি ক্ষেতে অর্থাৎ পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে তৈরী ক্ষেতে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য হিসাবে সে চা-শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৪৮ সালে বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব নিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে দিনের পর দিন দূর দূরান্ত ঘোরার কঠোর পরিশ্রমে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করার মতন পরিস্থিতি ছিল না। ফলে অকালে তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। কালের নিষ্ঠুর হস্ত তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নতুবা হয়ত এতদিন সে আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করত। লামা পদবী থেকে বোঝা যায় তার পিতৃ-পিতামহেরা ছিল ভারতবাসী তিব্বতী, বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। ওয়াংদি লামার মুখচ্ছবিতেও যেন ধ্যানী বুদ্ধের আভাস। পরম শান্ত, ধীর, স্থির মানুষ। বাইরের চেহারা দেখে কে বলবে ঐ মানুষটির ভিতরে সংকল্পের এত দৃঢ়তা, যা

লড়াইয়ের সময় আগুনের ভীষণ হলকার মত ফুটে বেরোয়। ফুবসিরিং বাগানে একলা দাঁড়িয়ে অনেকগুণ বেশি সংখ্যক গুণ্ডার মোকাবিলা করেছে, প্রতিরোধ করতে করতে বেহুঁশ হয়ে না পড়া পর্যন্ত। অথচ সহকর্মীর জন্য তার অন্তর যে কত কোমল সে পরিচয় পেয়েছি প্রথম দিনের আলাপেই। তারপর কতদিন লামার কুটিরে রাত্রিযাপন করেছি। আমার কাছে সে হয়ে উঠেছিল হিমালয়ের বুকের নবজাগ্রত মানুষগুলির প্রতীক।

বাতাসিয়া লুপের কাছে হিলকার্ট রোড ও রেল লাইনের মতই মস্ত বড় বাঁক নিয়েছে। মোটর রাস্তার থেকে বেশ কিছুটা উপরে রেল পথের বাঁক আরও বড়, প্রায় একটা বৃত্ত রচনা করেছে। সেই বৃত্তেরই নাম বাতাসিয়া লুপ। হিলকার্ট রোড থেকে ডাইনে নেমে গিয়েছে সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এখানে ওখানে দুই-একটি কুটির দেখা যায়। কোনটির কাঠের বেড়া, কোনটির টিনের চাল, কোনটিতে মাটির দেয়ালের উপর খড়ের ছাউনি। এগুলি হল বাতাসিয়া বস্তির কৃষক। গাড়োয়ান বা দিন মজুরদের কুটির। তখনও পাহাড়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র ভারী মালপত্র বহনের জন্য মোষের টানা গাড়ীর প্রচলন উঠে যায় নি। এমনি একটা সর্পিল পথের রেখা ধরে নেমে গেলে লামার কুটিরে পৌছানো যায়। সামনের দিকে হাত দু'য়েক পুবেই পাহাড়ের দেয়াল। সেই দেয়াল আবার পিছনের দিকে ঢালু হয়ে অনেকটা নীচে পর্যন্ত প্রসারিত। মাঝখানে কয়েক হাত চওড়া সমান জমির উপরে কুটির তৈরী হয়েছে। ছোট্ট আঙ্গিনায় পা দেওয়ার মুখে 'হানিসাকল' ফুলের গুচ্ছে শোভিত লতাকুঞ্জ গৃহস্বামীর সৌন্দর্য প্রীতির পরিচয় দেয়। ঘরের পিছনেই সিঁড়ি ক্ষেত, ইংরেজীতে নাম 'টিরেস কালটিভেশান'। লামা আর তার গৃহিণী কঠিন পরিশ্রমে সোণা ফলায়। কপি, আলু, মূলা, মকাই (ভুট্টা) প্রভৃতির ফসল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বস্তির কৃষক এবং গাড়োয়ানদের সংগঠিত করে। তাদের অন্তরে

জাগিয়ে তোলে জ্ঞানের তৃষ্ণা, নতুন জীবনের স্বপ্ন। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক উপাদানের সংমিশ্রণে যে নতুন জাতিসত্তা গড়ে উঠছে তার নমুনা দেখা যায় ওয়াংদি লামার ঘরে। সে নিজে গোর্খাদের অনুরূপ 'দাওরা সুরু আল' ব্যবহার করে, মাথায় গোর্খালি টুপি। নেপালী ভাষাকে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু ওয়াংদির গৃহিনী পরিচ্ছদে এখনও 'ভোটে' রমণীর বিশেষত্ব বজায় রেখেছে। ওয়াংদি দম্পতি নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় 'ভোটে' ভাষা ব্যবহার করে। তাদের শিশুপুত্র কথা বলে 'নেপালী' ভাষায়।

বাতাসিয়া আর ঘুমপাহাড়—সারা বছরই গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা থাকে। ভনজেঙ্গের চূড়ার উপর ভোটে'দের সমাধিস্তম্ভ দেখা যায়। উত্তরপশ্চিম একেবারে খোলা। সেদিক থেকে ভেসে আসে সুদূর উত্তরের হিমেল হাওয়া। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু হাওয়া কাঠের বেড়া ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে চায়। তার দাপটে বেড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভিতরে কেরোসিনের কুপি প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ করছে। দেয়ালে হিন্দী 'জনযুগ' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে কাটা লেনিন আর স্তালিনের ছবি আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ঐটুকুর তাৎপর্যই ত' অনেক। লেনিন-স্তালিনের বাণী সুদূর হিমালয়ের বুকে এসে পৌঁছেছে তারই জীবন্ত জাগ্রত নিদর্শন। পাশের কামরায় লামার অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা তিব্বতী ভাষায় একটানা মন্ত্র জপ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে কানে আসে "মানে পেমে হুঁম"। লামা নিজে আমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনায় ব্যস্ত। হিন্দী 'জনযুগ' পত্রিকার সমস্ত খবর খুঁটিয়ে পড়ে। আলোচনায় পরিষ্কার বোঝা যায় তার জানার আগ্রহ কত গভীর এবং অধ্যবসায়ী। আন্তর্জাতিক অবস্থা থেকে শুরু করে ভারতের কোন এক প্রান্তের জনগণের লড়াই, সব কিছু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। তীক্ষ্ণ বোধশক্তি আর বিচার বুদ্ধির ছাপ রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নে। এমনি রাতগুলিতে তার কুটিরে অতিথি হয়ে দিনের পর দিন তার বজ্র কঠোর অথচ কুসুম কোমল ব্যক্তিত্বের

দীপশিখা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠতে দেখেছি, দেখেছি সুন্দর, সহজ, কৃত্রিমতার লেশহীন অভিব্যক্তি।

লামার গৃহিণী টেবিলের উপর ভাতের থালা সাজিয়ে দেয়। নতুন পরিচিত অতিথির সামনে সযত্নে খাদ্য পরিবেশনের সময় তার মুখে গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণী রূপটি ফুটে ওঠে। তিব্বতী রমণীর কঠিন উঁচু চোয়াল সলজ্জ হাসির আভায় রূপান্তরিত হয়। ভাতের সঙ্গে শূয়োরের মাংস, ক্ষেতের কপি ও শালগমের তরকারী তারপর কিছুটা দুধ। খাওয়ার পর আবার লামার অফুরন্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে হয়। নেপালী ভাষায় সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রাথমিক বইও নেই। হিন্দী যেটুকু জানেন তারা সেটুকুকে সম্বল করে বেশিদূর এগোন চলে না। সুতরাং প্রশ্নের অন্ত সেই। অতীতের স্মৃতিকথাও শোনাই তাকে—১৯৩০-৩১ সালে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা। বলি 'সেদিন তোমার সঙ্গে পরিচয় হলে কত ভালো হত'। লামা হেসে উত্তর দেয় 'সেদিন কি একজন চাষীর সঙ্গে এই রকম মন খুলে মিশতে পারতে'। কথাবার্তা এক সময় শেষ হয়। রাত তখন নিশুতি, সবাই ঘুমে সচেতন। বাইরেও প্রকৃতি নিস্তব্ধ। শুধু কানে ভেসে আসে সেঞ্চল আর ভনজেঙ্গ বনের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস।

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হওয়ার পরও লামার সঙ্গে বার কয়েক দেখা হয়েছিল। যেদিন খবর পাই ওয়াংদিলামা আর ইহজগতে নেই, সেদিন মনে একটা বিরাট শূন্যতা বোধ করেছিলাম। পার্বত্য অঞ্চলের মেহনতী মানুষদের মধ্য থেকে একটি অপূর্ব আলোকশিখা ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময় রূপে আত্মপ্রকাশ করছিল। কিন্তু তার সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার আগেই নিভে গেল। তবু তার সেই প্রাণের প্রদীপ অন্যকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশায় বুক বেঁধেছি। তার উৎস হল মেহনতী মানুষের জাগরণ। তাই এক হিসাবে সে শিখা অমর, অনির্বাণ, মৃত্যুহীন। সেই জন্যই ত' আরও অনেক ক্ষেত্রে, অনেকের মধ্যে কত ছোটখাট ঘটনার

মধ্যে দেখেছি সেই জ্যোতিরই আবির্ভাব। প্রত্যক্ষ করেছি তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে মানুষের মহিমার অপরূপ আত্মপ্রকাশ।

চা-শ্রমিক আন্দোলনের উপর মালিকপক্ষের আক্রমণের প্রথম ঝাপটা কেটে যাওয়ার পর স্থির করি যেসব বাগানে আমাদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছে সেখানে গিয়ে সরেজমিনে সংগঠনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করব। আমার কাজের পদ্ধতিটাও এমনি। নিজের চোখে দেখে, কানে শুনে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে অবস্থা যাচাই করে দেখতে চাই। ভ্রমণের এই পরম্পরায় হিসেবের খাতায় জমার ঘরটি ভরে উঠেছে। পার্বত্য প্রকৃতিকে দেখেছি নানা রূপে, দার্জিলিং জেলার যে সব অঞ্চল হিলকার্টরোড থেকে, শুধু দূর থেকে চোখে পড়ত তার অলি-গলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সব চেয়ে বড় সম্পদ লাভ হয়েছে মানুষের সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ পরিচয়। যাত্রা শুরু করি সিঙ্গেল চা-বাগান থেকে। তখনও চড়াই উৎরাই ভাঙ্গায় অতটা অভ্যস্ত হইনি। সুতরাং হিলকার্ট রোডের সব চেয়ে কাছে যে বাগানটিতে ইউনিয়নের সংগঠন শক্তিশালী তাকে বেছে নিই। কার্শিয়ং শহরের নীচে ছবির মতন যে উপত্যকাটি দেখা যায়, চারিদিকের পাহাড় সেখানে চায়ের পেয়ালার আকারে ঢালু হয়ে নেমেছে। পূর্তবিভাগের বাঁধানো সড়ক সমস্ত চা-বাগানের মত সিঙ্গেলের মধ্য দিয়ে নেমে গিয়েছে। কাথে-বাড়ি বাগান পার হয়ে নামচু উপত্যকার দিকে। যত নীচে নামি ততই সড়কও যেন খাড়া উৎরাই হয়ে নামতে থাকে। তারপর দূরত্ব সংক্ষেপ করার জন্য বাঁধান রাস্তা ছেড়ে চলা শুরু হয় 'চোরবাটো' ধরে। সঙ্গে স্থানীয় শহরের দুজন তরুণ সহকর্মী কানু সিং ও হরি শর্মা, তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। চা-ঝোপের মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ। উপরন্তু একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে পিচ্ছিল। সন্তর্পণে নামতে হচ্ছে। বৃষ্টির সময় বর্ষাতি গায়ে দিয়েছিলাম। দুএকজন চেনা শ্রমিকের সঙ্গে দেখা হতে বেশ মজার খবর পাওয়া গেল। বর্ষাতিপরা অপরিচিত লোককে বস্তিতে ঢুকতে দেখে শ্রমিকেরা বেশ

চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এই সময়টাতে শ্রমিকেরা নিজ নিজ ঘরে 'মকাই' থেকে 'রকশি' তৈরী করে। ঠাণ্ডা দেশে স্বল্প পরিধেয় এবং অর্ধাহারে কঠিন পরিশ্রমের পর 'রকশি'ই তাদের একমাত্র সম্বল যা মেহনতের ক্লান্তি অপনোদন করে। আর ঠিক বছরের এই সময়টাই আবগারী বিভাগের কর্মচারীরা বাগানে বাগানে হানা দেয় বিনা লাইসেন্সে যারা রকশি তৈরী করে তাদের ধরবার জন্য। তাই সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে যারা মাতব্বর তারা এগিয়ে এসেছিল ব্যাপারটা বোঝার উদ্দেশ্যে। আমার সঙ্গীদের দেখে এবং আমিও কমরেড শুনে সবাই আশ্বস্ত হল। হাসাহাসির পালা শেষে আমন্ত্রণ জানাল ফেরার পথে যেন অতি অবশ্য 'চিয়া পানি' বা চা খেয়ে যাই।

আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থল সিঙ্গেলের নিচে কাফেবাড়ি। সেখানে শ্রমিকদের সভা ডাকা হয়েছে। মনে হয় নেমেই চলেছি। অবশেষে চলা শেষ হল। সন্ধ্যায় আঁধার ঘন হতে শুরু করেছে। মজুরেরা জমায়েত হয়েছে এর মধ্যেই। আমি বাগানে এসে সভা করছি এই প্রথম। নেপালী ভাষা তখনও বিশেষ আয়ত্ত হয়নি। হিন্দী আর নেপালী মিশিয়ে বক্তৃতা করি। তরুণ সহকর্মী হরি শর্মা পাশে বসে। যখন উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে কথা আটকে যায় তিনি শব্দ যুগিয়ে দেন। অভিজ্ঞতায় নতুনত্বের সঙ্গে রোমান্সের আমেজ লাগে আরও একটি কারণে। যেখানে সভা হচ্ছে সে জায়গাটি বাগানের এলাকার ভিতরে। সেখানে শ্রমিকদের একত্র বসে আলোচনা করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকের এসে সভায় বক্তৃতা দেওয়া এখনও নিষিদ্ধ। শ্রমিকেরা সংঘশক্তির জোরে অধিকার আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু একেবারে গোড়াতেই বাধার মোকাবিলা করতে না হয় সেজন্য সভার আয়োজন করা হয়েছে গোপনে। মালিকপক্ষ আগে থেকে খবর পেলে অনধিকার প্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে সভা আরম্ভ হয়ে গেলে জমায়েতের মাঝখানে এসে ব্যাঘাত সৃষ্টির

সাহস হয়ত হবে না। হলও তাই। নির্বিঘ্নে সভা শেষ করে যখন ফিরতি পথে চলা শুরু করি তখন আঁধার গাঢ় হয়ে নেমেছে। সংকীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে উপরের দিকে তাকালে মনে হয় কোথায় নেমেছিলাম। এখান থেকে কার্শিয়ং শহরের দীপমালা চোখে পড়ে না। চারিদিকের পাহাড়ের উপর অন্ধকারের যবনিকা। একটু দূরের ঝোপঝাড়, গাছ পালা, পাহাড়ের বন্ধুর গাত্র সব কিছু মুছে গিয়ে শুধু যেন কয়েকটি অতিকায় মসৃণ দেয়ালের আকার চোখে পড়ে। ঘন কালো তাদের রং। ডান পাশে একটু পরে আবছা অন্ধকারে ঢাকা পর্বতগাত্রের উপর পাঙখাবাড়ি রোডের আলোক রেখা। ওদিককার পাহাড়কে বিশাল একটি দুর্গপ্রাকার বলে মনে হয়। পথের এক এক জায়গায় সঙ্গীরা হাত ধরে সাহায্য করে। ভাদ্রের শেষ বর্ষণের জলে ফুলে ওঠা ঝরণার পাশ দিয়ে, কোথাও বা বড় বড় পাথরের উপর পা ফেলে পথের উপর দিয়ে প্রবাহিত ঝরণার ক্ষ্যাপা জলস্রোত অতিক্রম করতে হয়। যাওয়ার সময় কারুর সাহায্য দরকার হয় নি। অন্ধকারে অসহায়ভাবে সঙ্গীদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিই।

চড়াই ভাঙার পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত, তার উপরে ক্ষুধায় অবসন্ন। কিছু পেটে না পড়লে এক পা উপরে উঠতে পারবো না। ভাগ্যক্রমে খাবার জুটে যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। ইউনিয়নেরই একজন অগ্রণী কর্মী কানছারাইয়ের আজ বিয়ে। দূর থেকে কানে আসছিল সস্তা হারমোনিয়ামের বেতালা বাজনা আর সেই সঙ্গে মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে একঘেয়ে অথচ মিষ্টি সুরের গান। নেতাদের দেখতে পেয়ে শ্রমিকেরা বিয়ে বাড়ীতে টেনে নিয়ে যায়। কৃত্রিম শিষ্টাচারের বালাই নেই। তাদের উৎসবের ছোঁয়াচ নেতাদের মনকে স্পর্শ করবে একথা তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়। কুলি লাইনের ঘর। ঘরের মালিক কোম্পানী। দুখানা পাশাপাশি ঘরের মাঝখানে হাত তিন চারেক মাত্র আঙ্গিনা। কাঁচা মাটির দাওয়ার উপর খড়ের বেড়া, খড়ের চাল। কোন কোন কুটিরের দেয়ালটা মাটির। ঘরেরই এক

কোণে রান্নার ব্যবস্থা। জানালা না থাকায় ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারছে না। একটি মাত্র নির্গমন পথ দরজাটি জুড়ে মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। উৎসবে মত্ত এই মানুষগুলি বাধ্য হয়ে ধোঁয়া ভরা ঘরে বাস করায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। অনভ্যস্ত আমি হাঁপিয়ে উঠি। ঘরের আর এক কোণে খানকয়েক তক্তা জুড়ে মাচানের মত বানানো, ছোট ছেলেমেয়েদের শোয়ার জন্য। মাচার উপরে আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়। অকৃত্রিম আগ্রহে গরীবের উৎসবের যৎসামান্য উপচার হাতে তুলে দেয়। পুরী, আলুকোয়াসের তরকারি আর কয়েকখণ্ড শূয়োরের মাংস। ওদের কাছে এই আয়োজন আদৌ সামান্য নয়, বরং দুর্লভ জিনিস। যাদের দৈনিক মজুরি হল মাগগিভাতা সহ ছয় আনা—অবশ্য রেশান সস্তাদরে পাওয়ার ব্যবস্থা সহ—তাদের দৈনন্দিন জীবনে দুর্লভ ত' বটেই। বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে চায়ের জন্য কিছুটা দুধ চিনির ব্যবস্থা হয়েছে। খাওয়া হলে একটা পিতলের গ্লাস সামনে এনে রাখে। দ্বিতীয় বার চা দিচ্ছে ভেবে গ্লাসে চুমুক দিতে যাবো এমন সময় সঙ্গীদের একজন বাধা দিয়ে বলে 'কমরেড! ওটা রকশির আমরা খাবো না জেনে গৃহকর্তা অনুনয় করছে অন্তত আঙ্গুলের ডগায় একটু ছুঁয়ে দিন। নইলে বরবধূর অকল্যাণ হবে।' অগত্যা তাই করতে হল। দাওয়ায় বসে নেপালী ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করে চলেছে। বহু মানুষের একসঙ্গে কথাবলার মধ্যে তার দুর্বোধ্য স্বর কানে আসে।

কার্শিয়ং এখনও অনেক দূরে, অনেক উপরে। দেরী করলে পৌঁছাতে রাত গভীর হয়ে যাবে। তাই ওদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। ওদের উচ্ছল আনন্দের এক অংশ সঙ্গে নিয়ে আবার চড়াই ভাঙা শুরু করি। সৌভাগ্যের বিষয়, ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে আকাশে। 'ফগ' হীন নির্মল আকাশ চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে। চাঁদের আলোয় নীল বনানী যেন জানায় অজানা রহস্যের ইঙ্গিত। ঝরণার ফেনিল শুভ্র জলপ্রপাত

আলোয় ঝলমল করে। উপল খণ্ডের উপর সাবধানে পা ফেলে পার হওয়ার সময় হেঁট হয়ে সেই জলধারা স্পর্শ করি। পথের পাশে দেবদারু আর পাইন গাছের তলায় আলোছায়ার খেলা। অনেক উপরে 'গিদ্ধা' পাহাড় আর 'ভাউহিলে'র চূড়ায় পাইন অরণ্য চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল। শহরে যখন পৌঁছাই তখন নিশুতি রাত। পথঘাট নির্জন, চারিদিক শ্রান্ত কূজন, স্তব্ধ, ঘুমে অচেতন। কমিউনে ক্লান্ত দেহকে কম্বল শয্যার উপরে এলিয়ে দিই। দেহ অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে অথচ অনেকক্ষণ ঘুম নামেনা চোখে। সমস্ত অনুভূতি জুড়ে কি এক আনন্দের মূর্চ্ছনা। ভাবি, এইত চেয়েছি জেলের বন্ধ সেলে, কত বিনিদ্র রজনীর কল্পনায় চাঁদনী রাতে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো রহস্যের আমেজ লাগা পরিবেশে। তার সঙ্গে মিশে আছে ধরিত্রীর সন্তানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রথম স্বাদ। কর্মের যে প্রেরণা এতদিন ছিল বিমূর্ত, জনগণের সংস্পর্শে এসে তাতে প্রাণের সঞ্চার হতে শুরু করেছে। এই ত' পরিপূর্ণ বৃহৎ জীবনের পথে পদক্ষেপ।

ঐ দিনটিই ত অভিজ্ঞতার শেষ নয়, সূচনা মাত্র। কয়েকদিনের ভিতরেই পাশের আমবুটিয়া চা বাগানে হল নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা, একাধারে মধুর ও তিক্ত। যেমন শ্রমিকদের হৃদয়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, তেমনি প্রত্যক্ষ করা গেল ইংরেজ ম্যানেজারের উদ্ধত, দুর্বিনীত আস্ফালন। বাগানটিতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের ভিতর কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিরোধ চলেছে। অল্পকাল মাত্র পূর্বে সহকারী লেবার কমিশনারের মধ্যস্থতায় ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহৃত হয়েছে। তবু কিছু কিছু বাগানের কর্তৃপক্ষ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিরোধ জীইয়ে রেখেছে। সহকারী লেবার কমিশনারের কাছে থেকে প্রস্তাব এল, রতনলাল ব্রাহ্মণ যদি এম, এল,এ হিসাবে ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে তবে হয়ত মীমাংসা হতে পারে। কার্শিয়ং শহর থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বাগানের সহকারী ম্যানেজার সম্মতি জানায়। সুতরাং রতনলাল, আমি ও হরিশর্মা আমবুটিয়ার পথে

রওনা হই। স্টেশনের নীচে দিয়ে পশ্চিমের দিকে প্রসারিত পাঙখাবাড়ি রোড। মাইল দুয়েক সোজা যাওয়ার পর একটা টিলার পদপ্রান্তে তার গতি রুদ্ধ। টিলার উপরে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত এস, ডি, ও সাহেবের বাংলো। সেখানে পৌঁছাবার আগেই রাস্তাটি বাঁদিকে মোড় নিয়েছে পাঙখাবাড়ির আর ডাইনে মিরিকের দিকে। পাঙখাবাড়ি রোড থেকেই পূর্ত-বিভাগের আর একটার সড়ক ঘুরে ঘুরে আমবুটিয়াতে পৌঁছেছে। সড়ক ছেড়ে সঙ্গীরা 'চোরবাটো' বেছে নেয়। সময়ও কম লাগে, দূরত্ব সংক্ষেপ হয়। 'চোরবাটো'র সঙ্গে অপরিচিত নই, অনভ্যস্তও নই একেবারে। কিন্তু এটি এমন খাড়া ভাবে নেমেছে যে তাতে ওঠানামা দুঃসাধ্য মনে হয়। তাই বলে মুখে সে কথা প্রকাশ করিনা। পিছপা'ও হই না। পায়ের দাগে দাগে চিহ্নিত পথ মাত্র হাতখানেক কি হাত দেড়েক চওড়া। স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে, কতবার যে আছাড় খাই তার ইয়ত্তা নেই। একটু বে-কায়দায় পড়লেই যেতে হবে সোজা হাজার দেড় হাজার ফুট নীচে। অথচ এই 'চোরবাটো' ধরেই চা-পাতা বোঝাই টুকরি পিঠে ঝুলিয়ে কুলি মেয়েরা অনায়াসে ওঠানামা করে। দুই এক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। উপরে উঠছে কিশোরী মেয়ে মাইলী। হরি শর্মার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। 'মায়লা বাজে' কেও দূর থেকে দেখেছে নানা সভা সমিতিতে। অপরিচিত শুধু আমি। হরি শর্মা বলে, নতুন কমরেড 'উঁধো' থেকে এসেছে শ্রমিকদের আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে। পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাইলীর মুখে। নবাগত ব্যক্তি 'কমরেড' শুনে পরিশ্রম ও সূর্যালোকে আরক্ত গাল দুটিতে সলজ্জ হাসির টোল পড়ে। চোখে কিশোরীসুলভ লজ্জার সঙ্গে ফুটে ওঠে না-বলা অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট আন্তরিক অভিনন্দন। ভাবি, অভিনন্দন আমার জন্য নয়। এই অচেনা কিশোরীর কাছে আমি অনাগতের প্রতীক। তাই না ক্ষণিকের পরিচয়ে পাই এত স্নিগ্ধ সংবর্ধনা।

ম্যানেজার সাহেবের সুদৃশ্য বাংলোটি—একটি টিলার উপরে অবস্থিত। বাংলোর হাতায় প্রবেশ করে চাপরাশির মারফত খবর দেওয়া হল রতনলাল ব্রাহ্মণ, এম, এল, এ দেখা করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ পরে যে অভ্যর্থনা লাভ হল তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। সাহেব পুঙ্গব বাংলোর বারান্দায় এসেই অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করে 'হু ইজ রতনলাল ব্রাহ্মণ? ইউ আর অলরেডি ক্রিয়েটিং এ লট অফ ট্রাবল। নাউ জাস্ট ক্লিয়ার আউট' (রতনলাল ব্রাহ্মণ—কোন জন? যথেষ্ট উৎপাত সৃষ্টি করেছো। এখন কেটে পড়ো।') জবাব দিলাম 'তোমার সহকারী ম্যানেজার আসতে বলেছে বলেই এসেছি। এখন তুমি মেজাজ দেখাচ্ছো কেন'? সাহেব রুক্ষভাবে বলে 'আমি জানি না কে তোমাদের আসতে বলেছে। আমি বলি নি। অতএব কাল বিলম্ব না করে কেটে পড়ো'। ইংরাজীতে কথোপকথনের সবটা রতনলালের বোধগম্য না হলেও বলার ধরন দেখে খানিকটা আঁচ করতে পারে। তার মেজাজও চড়ে উঠছিল। যে কোন মুহূর্তে একটা নিতান্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অথচ প্রাদেশিক নেতৃত্বের জরুরী ডাকে তাকে সেদিনই কলকাতা রওনা হতে হবে। বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করি, বলি 'তুমি চলে যাও। আমরা এর মোকাবিলা করছি'। শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়। আমরা ঠিক করি বাংলোর হাতার বাইরে এসে ঠিক সামনে পূর্তবিভাগের সড়কের উপর, সাহেবের নাকের সম্মুখে শ্রমিকদের সভা করবো। আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দেখে ইতিমধ্যে সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক জড়ো হয়েছে। রতনলালকে রওনা করে দিয়ে আমরা দুজন তাদের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিই। ইতিমধ্যে সাহেব আবার লাঠি হাতে এসে হাজির। অভদ্রভাবে বলে, 'তোমরা এখনও বেরিয়ে যাও নি'! হরি শর্মা উত্তর দেয় 'এটা পি, ডাব্লিউ, ডি-র রাস্তা। এখানে তোমার হুকুম চলে না'। সাহেব ভয় দেখায় 'তাহলে থানায় ফোন করবো'। এবার আমি বলি 'তোমার ইচ্ছা হলে করতে পার। এখন আমাদের

কাজে বাধা না দিয়ে সরে পড়ো'। জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে একজন রাগ সামলাতে না পেরে ম্যানেজার সাহেবের ভগ্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় ঘোষণা করে। নিজের এক্তিয়ারের সীমা এবং সমবেত মজুরদের মেজাজের নমুনা দেখে সাহেবকে শেষপর্যন্ত লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়। আমাদের সভা বেশ কিছু সময় চলার পর ফিরতি পথে রওনা হই। হরি শর্মার তরুণ রক্ত কম গরম হয় নি। সে বলে 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা সভা চালিয়ে যাবো'। তাকে বোঝাই কার্শি'য়ং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিমের রায়ের পর পুলিশ এখানে আসবে না। এ বাগান ত' ঐ মহকুমারই এলাকার মধ্যে। আর যদি আসে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তখন মোকাবিলা করা যাবে'। শ্রমিকেরা দল বেঁধে সঙ্গে আসে আমাদের পৌঁছে দিতে একেবারে বাগানের চৌহদ্দির বাইরে পা না দেওয়া পর্যন্ত। কোথায় পুলিশ বাহিনী? তার কোন নিশানা চোখে পড়ে না। পাঙখাবাড়ি রোড ধরে শহরে ফেরার পথে থানার সামনে দিয়ে আসতে হয়। লক্ষ্য করে দেখি সেখানেও কোনরকম চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। মনে মনে সবদিক হিসেব নিকেশ করে দেখি, ফলটা মোটের উপরে আমাদের অনুকূলে। মজুরদের সামনে সাহেবের সঙ্গে মোকাবিলা হল। পুলিশে খবর দেওয়ার ভয় দেখানো সত্ত্বেও পুলিশ আসে নি। ঘটনাটা শ্রমিকদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে।

কয়েকটা বাগান ঘুরে আসার ফলে বুঝতে পারি যে দার্জিলিং শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। মালিকপক্ষের দালালেরা শ্রমিকদের মধ্যে অবিরাম প্রচার করে চলেছে, লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন খতম হয়ে গিয়েছে। ইউনিয়ন অফিসের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। যে সব বাগান দার্জিলিং শহরের কাছে সেখানকার পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিকেরা হাটের দিন শহরে এলে ইউনিয়ন অফিস ঘুরে যায়। তাদের মনে দালালদের প্রচার দাগ কাটে না! কিন্তু যে সব বাগান দার্জিলিং শহর থেকে দূরে দূরে

অবস্থিত সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে বেশ খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বৈকি! শ্রমিকদের চোখে ইউনিয়ন আর পার্টির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ইউনিয়নের সভ্য হলেই মনে করে পার্টির সভ্য হয়ে গিয়েছে। শত্রুপক্ষও তাই বলে থাকে। সুতরাং আন্দোলনের সাময়িক ভাঁটার সুযোগ নিয়ে তারা বলে বেড়াচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টি এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। তখন বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির যে তিনজন প্রতিনিধি ছিলেন তাঁদের অন্যতম হিসাবে বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশে যোগদানের জন্য রতনলালের আমন্ত্রণ আসে। পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব মনে করেন অন্যান্য জেলায় পার্টি সমর্থক মেহনতী মানুষদের নৈতিক সাহস যোগাবার জন্য রতনলালের ঐসব অমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত। ফলে এই জেলায় গণআন্দোলনের কাজে সময় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। শত্রুপক্ষ তার অনুপস্থিতির ঘটনাকেও প্রচারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে জেলা কমিটিতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ডাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য বেশির ভাগ সভ্যের দ্বিধা ছিল। তাঁদের আশঙ্কা জমায়েত যদি বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় না হয় তাহলে শত্রুপক্ষ আমাদের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে যাবে। অথচ অন্যদিকে যে পার্টির অস্তিত্ব নিয়েই অপপ্রচার চলছে! যাহোক শেষ পর্যন্ত স্থির হল গণ-সমাবেশের বদলে কর্মী সমাবেশ নাম দেওয়া হবে, যাতে বেশি সংখ্যায় মানুষ জমায়েত না হলেও মুখরক্ষা হবে। অবশ্য এটা এক হিসাবে নিজেদের বুঝ দেওয়া। বাইরের লোক সমাবেশের সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। নির্দিষ্ট দিনে জমায়েত একেবারে উপেক্ষণীয় হয় নি। বেশ কয়েক মাস বাদে রক্তপতাকা হাতে মিছিল শহরের প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করে। তখন 'ম্যল' বা লেডেনলা রোডে প্ল্যান্টার্স-ক্লাবের সামনের রাস্তা দিয়ে মিছিল যাওয়ার উপরে সরকারী বিধিনিষেধ ছিল। তবুত' শহঁরের মানুষ বলাবলি করে, 'অনেকদিন পরে লালঝাণ্ডার জুলুস বেরোল'। এইটুকু কি কম লাভ! হাটের দিন,

সুতরাং খবর চলে যাবে দূর দূরান্তের বাগানে। সেই সময়টা দার্জিলিং ছাড়া কার্শিয়ং শহরেও জনসভা করতে হলে কাছের চা-বাগান থেকে মিছিল নিয়ে আসতে হত। দার্জিলিং এর চৌক বাজারে যে কোন দলের সভা হলেও বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতার অভাব হত না। এই শহরের সাধারণ মানুষেরাও তুলনামূলকভাবে রাজনীতি সম্পর্কে বেশ আগ্রহী ছিল। কালিম্পং ও কার্শিয়ং শহরের অবস্থা ছিল একেবারে আলাদা। বাইরে থেকে সংগঠিত মিছিল না এলে ফাঁকা মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার মত অবস্থা। উপরন্তু কাশিয়ং-এর সভায় জমায়েত নাহলে গোর্খা-লীগের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা ছিল।

কর্মী সমাবেশ হল সেপ্টেম্বরের শেষে। নভেম্বর থেকে দুরন্ত শীতের মরশুম। আন্দোলনে ও সংগঠনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে ইনটেরিম গভর্ণমেণ্ট' বা অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বছরের শেষ দিকে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রামের আহ্বানে চা-শিল্পের বিরোধ সম্পর্কে প্রথম ত্রি-দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিং জিলা চিয়া কমান মজদুর ইউনিয়নও প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ পায়। প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন সুশীল চ্যাটার্জী। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চলের চা-শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির যে সুপারিশ শ্রমমন্ত্রী উত্থাপন করেন সেটি শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মজুরী যে হারে বৃদ্ধির দাবী আমাদের ইউনিয়ন এতদিন করে আসছিল, সম্মেলনে স্বীকৃত হার তার চেয়ে বরং একটু বেশি। অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে শিল্পে শান্তি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মনে সহানুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করছিল। ত্রি-পক্ষীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে দার্জিলিং এবং কাশিয়ং শহরে দুটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের কর্মীরা বাগানে বাগানে ঘুরে প্রচার অভিযান চালায়। ফলে দুটি সমাবেশই বেশ বড়সড় আকারের হয়। শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটার টান কেটে গিয়ে নতুন

জোয়ারের সূচনা হয়। স্থির হয় ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে গোটা ফেব্রুয়ারী ও মার্চমাস ভদ্রবাহাদুর হামালকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়নের শক্ত ঘাঁটিগুলি পরিক্রমা করি। সে অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দেওয়ার আগে এখানকার গণআন্দোলনের অন্য কয়েকটি দিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কাঞ্চনজঙঘার ঘুম ভাঙ্গার কাহিনী ত' কেবলমাত্র চা শ্রমিকদের জাগরণের কাহিনীতে সীমাবদ্ধ নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পার্বত্যঅঞ্চলের কৃষক, শহরের খেটে খাওয়া মানুষ এবং উদীয়মান বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হওয়াব ইতিবৃত্ত।

কৃষকদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু অবশ্য বলা যাবে না। কারণ, কৃষক আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি এখানে। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা তাদের সমস্যার সঙ্গে পরিচয়ের পুঁজি স্বল্পই থেকে গিয়েছে। তবু, যেটুকু সূচনা হয়েছিল তার কথাকে এড়িয়ে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। দার্জিলিং জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল প্রায় 'চিযা কমান' মজতুর ইউনিয়নের সঙ্গে একই সময়ে। দায়িত্ব ছিল ওয়াংদি লামার উপবে। কৃষক আন্দোলনের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি অনেকগুলি কারণে। প্রথমত, চা-শ্রমিকদের আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনার কাজেই জেলা পার্টি নেতৃত্বকে সময়ের সিংহভাগ ব্যয় করতে হয়। দ্বিতীয়ত, ঠিক দায়িত্ব নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। পার্টি'তে বুদ্ধিজীবী বা ছাত্রদের মধ্য থেকে কর্মী তুইএক জনের বেশি পাওয়া যায়নি। মাঝে মাঝে পার্টি'র সভ্য হয়েছে অথবা কাছাকাছি যারা এসেছে তাদের মধ্যে হাতে গোণা তুই একজন ছাড়া কেউ স্থায়ী হয়নি। পার্টি'সভ্যদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একেবারে প্রাথমিক সূত্রগুলি সম্বন্ধেও শিক্ষাদান ছিল

দুঃসাধ্য ব্যাপার। নেপালী ভাষায় এ সম্পর্কে কোন বই ছিল না। হিন্দীতে যে সব বই পাওয়া যেত তা ওয়াংদিলামা, হামাল প্রভৃতি জনকয়েক মাত্র নেতৃস্থানীয় পার্টি সভ্য ছাড়া অন্যদের পক্ষে বোঝা আদৌ সহজ ছিল না। চা-বাগানের দায়িত্বশীল ক্যাডারদের অধিকাংশ ছিল প্রায় নিরক্ষর অথবা সাক্ষর হলেও শিক্ষার মান প্রাথমিক স্তরেরও নয়। পরবর্তীকালে ক্বচিৎ কারুর কারুর দেখা পেয়েছি যারা হিন্দী জনযুগ পড়ে কিছুটা বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটাই অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম ও সময়-সাধ্য ব্যাপার। সাম্প্রতিককালে কতটা উন্নতি হয়েছে বলতে পারি না। যখনকার কথা বলছি তখন পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। যাঁরা পাহাড়ী পথঘাটের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, দার্জিলিং শহর থেকে পুলবাজার বিজনবাড়ি এলাকার দূরত্ব মাইলের অঙ্কে বেশি নয়। বড় জোর ৫।৬ মাইল। কিন্তু ঐটুকু পথ অতিক্রম করতে খাড়া নামতে হবে পাঁচ ছয় হাজার ফুট। একবার নামার পর সেদিনই চরণ যুগলের উপর ভরসা করে ফেরার কথা পাহাড়ী রাস্তায় চড়াই উৎরাই অতিক্রম করায় অভ্যস্ত মানুষেরাও খুব সহজ মনে করে না। সব কিছু মিলিয়ে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে যেখানে যেখানে প্রাথমিক স্তরে সংগঠন গড়ে তোলা হয় সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। একটু স্থায়ী যোগাযোগ যা ছিল তা বাতাসিয়া, রংবুল এবং কালিম্পং শহরের 'ডেভলপমেণ্ট এরিয়া'র সঙ্গে। কালিম্পং-এর কথাটা আলাদাভাবে বলা যাবে একটু পরে। দার্জিলিং সদর মহকুমার অধীনে পুলবাজার বিজনবাড়ি বা নেপাল সীমান্তে 'মানে ভনজেঙ্গ' এলাকার সঙ্গে সংযোগ হত কালেভদ্রে। তবু অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতে হয় লাল ঝাণ্ডার প্রতি এই সব এলাকার মানুষদের আন্তরিক আনুগত্যের কথা। পার্টির প্রয়োজনে ডাক দিলে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে

এরা দ্বিধা করেনি। পার্টির বিশেষ তহবিলে চাঁদা দেওয়া হোক অথবা জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে শাক সবজী সরবরাহ করেই হোক, তাদের যথাকর্তব্য করেছে।

কালিম্পং মহকুমাই হল জেলার কৃষি প্রধান অঞ্চল। এখানে পাহাড়ের গা অনেক বেশি ঢালু হওয়াতে সিঁড়ি ক্ষেতগুলির আয়তন লম্বা ও চওড়া দুদিক থেকেই অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ বড়। দার্জিলিং ও কার্শিয়ং মহকুমায় কৃষিপণ্যের মধ্যে বেশিরভাগ ফুলকপি, বাঁধাকপি, প্রভৃতি মরশুমী সবজী, এলাচ, মকাই, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি পাহাড়ের গ্রীষ্মের মরশুমের ফসল। বিজনবাড়ি পুলবাজার এলাকায় কমলালেবুর চাষ হয়। কালিম্পং-এ প্রধান ফসল কমলালেবু, ধান ও 'কোদো'। এই মহকুমাতেও যারা সত্যকারের কৃষক তাদের মধ্যে সে যুগে আমাদের সংগঠন গড়ে ওঠে নি। 'ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া' তে যাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের জীবিকার মুখ্য উপায় ছিল শহরে দিনমজুরের কাজ এবং দুগ্ধ সরবরাহ ইত্যাদি। কালিম্পং বাজার থেকে যে সড়কটি ক্রমশ খাড়া হতে হতে 'দুরবীন ভাড়ায়' গিয়ে পৌঁছেছে তার নাম 'রিং কিং পং রোড'। ঐ সড়কের দুপাশের এলাকা 'ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া' নামে পরিচিত ছিল। দুপাশে পাকাবাড়ি তৈরীর জন্য অনেকগুলি প্লট ভাগ করে সরকার থেকে গৃহনির্মাণেচ্ছুক ব্যক্তিদের 'লিজ' দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা 'লীজ' নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশ কলিকাতার বাসিন্দা বাঙ্গালী উচ্চবিত্ত মানুষ। অবসর যাপনের জন্য শৈলাবাস নির্মাণের ইচ্ছা থেকে 'লীজ' নিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু যে কোন কারণেই হোক প্লটগুলি খালি পড়েছিল। কর্তৃপক্ষ আবার খালি প্লটগুলিকে এক বৎসরের অস্থায়ী পাট্টায় স্থানীয় লোকদের বসবাস এবং কুটির সংলগ্ন জমিতে যতটুকু কৃষিপণ্য উৎপাদন সম্ভব তার জন্য দিয়েছিলেন। বৎসরান্তে যখন নতুনভাবে পাট্টা দেওয়া অথবা না দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন ওদের উপর নোটিশ

দেওয়া হয় ওখান থেকে উঠে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না হলে মানুষগুলি যাবে কোথায়! আর বিকল্প স্থানও হওয়া চাই শহরের কাছাকাছি যাতে ওরা এসে বাজারে তাদের নিয়মিত জীবিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এক একবার ওদের উপর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নোটিশ জারি হত আর আমাদের কাজ হত কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন সংগঠিত করা যাতে বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা হওয়ার আগে ওদের উচ্ছেদ করা না হয়।

আন্দোলনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে কালিম্পং-এ স্মৃতির ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য কিছু জমা পড়েনি, তবে দার্জিলিং-কার্শিয়ং অঞ্চলের তুলনায় এখানকার মানবিক উপাদানে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তার কথা যেমন ভুলতে পারিনি তেমনি এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপটিও মন জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর উপভাষাভাষী মানুষদের সংমিশ্রণে নেপালীভাষী জাতিসত্তা গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়াটি দার্জিলিং-কার্শিয়ং অঞ্চলে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখেছি, কালিম্পং-এ তার গতিবেগ তুলনামূলকভাবে মন্থর। দার্জিলিং-কার্শিয়ং শহরে বা আশে-পাশের বস্তীতে লেপচাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নিদর্শন খুব কম চোখে পড়ে। শহরে লেপচা মেয়েদের পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য অবশ্য তাদের চিনিয়ে দেয় তবে পুরুষদের বেলায় সে কথা খাটে না। কালিম্পং কৃষিপ্রধান হওয়াতে লেপচা বস্তীগুলিতে তাদের জীবনযাত্রা ও ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে লেপচারা 'ভোটে' দের থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর হলেও ভাষা 'ভোট' ভাষা পরিবারেরই শাখা। সংস্কৃতিতেও 'ভোটে' প্রভাব প্রবল। সিকিমে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন তিব্বত থেকে এসে লামা লাৎসুন চেনপো। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসেন অনেকে। শুধু ধর্মগুরুই নয়, নানা ধরনের মানুষ। সিকিমের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তিব্বত থেকে আগতেরা। তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও কিন্তু লেপচাদের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য মুছে যায় নি। সংস্কৃতির নিজস্ব ধারাটিও অব্যাহত

গতিতে বয়ে চলেছে। লেপচাদের পরেই কালিম্পং-এ 'ভোটে' দের অস্তিত্ব বিশেষভাবে নজরে পড়ে। দার্জিলিং শহরে ঘুম স্টেশনের উপরে বৌদ্ধ গুম্ফা রয়েছে। ঘুম সন্নিহিত রংবুল বস্তীতেও রয়েছে 'ভোটে'দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। শহরের বুকে মহাকাল শিখরের ঠিক নীচে 'ভোটে' বস্তী ও গুম্ফাও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কালিম্পং-এ বাজার ছেড়ে উত্তরের দিকে, আলগাড়া এবং পেডং হয়ে যে পথ গিয়েছে তিব্বত সীমান্তের অভিমুখে, সে পথ ধরে একটু এগোলেই 'দশ মাইল' নামে বস্তীটি অবস্থিত। মনে হবে যেন "ক্ষুদ্র তিব্বতে" এসে পৌঁছেছি। এখানকার বাজারে অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে দেবনাগরী হরফের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী হরফ চোখে পড়ে। ঠিক সেই সময়টাতে লেপচা ও তিব্বতীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানার সুযোগ পাই নি বটে, তবে যে ছাপটি মনের পটে জীবন্ত হয়ে রয়েছে তার তাগিদে উত্তর কালে জানার প্রচেষ্টা করেছি। অধ্যয়নের পরিধি বাড়িয়ে চলেছি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ দার্জিলিং পাহাড়ের বুকের কিছু মানুষের বুকে দোলা লাগালেও সাধারণভাবে খেটে খাওয়া মানুষের উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি তার প্রমাণ পাই কালিম্পং-এ এসে ছোট একটি ঘটনায়। এই জেলায় কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর চা-বাগানে অথবা অন্য কোন কোন স্থানের জনসভায় গিয়েছি, ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিয়েছি। সঙ্গে নেপালী ভাষী যে সহকর্মী থাকত সে আমার পরিচয় দেওয়ার সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু বৎসর কারাবাসের ঘটনাটিও উল্লেখ করত। কালিম্পং-এ আমাদের পার্টির ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিল ভবেশ নামে একটি ছেলে। তার পুরো নামটি ভুলে গিয়েছি। 'ডেভেলপমেণ্ট এরিয়া'য় একটি ঘরোয়া বৈঠকে সে-ও অমনি ভাবে আমার পরিচয় দিয়েছিল। পরে একদিন সে হাসতে হাসতে বলে 'কমরেড দাওয়া লামা কি বলেছে জানেন' ? দাওয়া লামা স্থানীয় একজন মাতব্বর কর্মী। তার

মতামতকে গুরুত্ব দিতেই হয়, সুতরাং আমি জানার আগ্রহ প্রকাশ করি। ভবেশ বলে "আপনি চৌদ্দ বৎসর জেলে ছিলেন শুনে দাওয়া লামা মন্তব্য করেছে নিশ্চয়ই আপনি কোন ইংরেজকে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং এরকম বিপজ্জনক লোককে এখানে আসতে দেওয়া উচিত নয়"। ভবেশ অবশ্য তাকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে এবং মনে হয় আপাতভাবে দাওয়া লামা তা মেনেও নিয়েছে। কিন্তু আমি ঘটনাটির তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করি! এখানকার শ্রমজীবী মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে তাদেরই দুঃখবেদনার অংশীদার হয়ে, সংগ্রামের সাথী রূপে নিজেকে তাদের চোখে প্রতিষ্ঠিত করে।

হিমালয়ের বুকের মানুষগুলিকে আমি পার্বত্য প্রকৃতির পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে শিখেছি। সেজন্য কেউ কেউ বলেছে আমার মধ্যে রোম্যান্টিক প্রবণতা বড় বেশি। তবু এ অভ্যাস আমি ছাড়ি নি, ছাড়বার দরকার আছে বলে মনে করি নি। অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে এখানকার মানুষের জীবনের দৈন্য, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার বৈপরীত্য আমার চোখে বড় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই বুঝি ধীরে ধীরে আমার মনে একটা ধারণা দানা বেঁধে উঠেছে—এদের সামনে জীবনের একটা সামগ্রিক দিগন্ত ফুটিয়ে তুলতে হবে। কালিম্পং-এর বৈশিষ্ট্যময় পৃষ্ঠপট তাই আমার মনের রূপোলী পরদায় স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে। যখনই কোন কর্মসূচী নিয়ে কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছি, সেই কয়েকদিন শুধু মানুষজনের সঙ্গেই মিশিনি, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করে নিতে চেয়েছি। কোন দিন রিংকিংপং রোড ধরে চলতে চলতে পৌঁছেছি দূরবীণ 'ডাঁড়া'য়। রিংকিংপং রোড বাজারের একটু দক্ষিণ থেকে বেরিয়ে ক্রমশ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। বাঁ দিকে স্নিগ্ধ ছায়া ঘন 'বং' বস্তী। বং বস্তীর পাদদেশ বেয়ে চলেছে কলনাদিনী 'রিলি'। ওপারে 'সমলবং' বস্তীর খড়েছাওয়া মাটির কুটিরগুলি চোখে পড়ে। রিলি দূরবীণ ডাঁড়ার ওপার দিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে তিস্তার

দিকে। বাজার থেকেই রিংকিংপং রোডের বাঁ পাশে বেরিয়ে গিয়েছে 'বং' রোড আর ডান পাশে 'রিশি রোড'। রিংকিংপং রোডের ডানপাশ বরাবর চলে গিয়েছে পাহাড়ের দেয়াল। সেই দেয়ালকে প্রায় বেষ্টন করে নীচের দিকে রিশিরোডও দূরবীণ ডাঁড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। রিশি রোড প্রায় সমতল, ছায়া ঘন, রোম্যান্টিক মনের কোণে ব্যক্তিগত নিভৃত স্বপ্নের খোরাক যোগায়। দূরবীণ 'ডাঁড়ার' উপরে তিব্বতী বৌদ্ধদের অসংখ্য সাদা পাতাকা আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আর একপাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে রিলি এবং তিস্তার সঙ্গমে পৌঁছাবার 'চোর বাটো'। কালিম্পং শহরের উত্তর সীমায় অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে 'ঝাণ্ডা ডাঁড়া' সেটাই এখানকার সর্ব্বোচ্চ সীমা। বাজার থেকে চূড়ায় পৌঁছাতে বেশ কয়েক মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত অনাথ শিশুদের 'হোমস' ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে পাগডণ্ডী। ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে হয় খাড়াভাবে। 'ঝাণ্ডা ডাঁড়া'র একটি দিক সবুজ বনরাজি ও ঘাসে ঢাকা, ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে বাজারের অনেক নীচে 'সিধে' বস্তীতে এসে মিলেছে। চূড়ার উপরে পাইনের বন শহরকে ঝড় ঝাপটার দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করে। সূর্যের প্রথম কিরণ বন-চূড়াকেই চুম্বন করে। অন্য দিকে পর্বতপৃষ্ঠ এক মসৃণ দেয়ালের মত সোজা হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। তারই পাদদেশকে ঘিরে চলেছে তিস্তার সুনীল জলধারা। ওটা সিকিমের এলাকা। তিস্তা নদীই দার্জিলিং জেলা আর সিকিমের সীমানা চিহ্নিত করে, আবার দার্জিলিং মহকুমা থেকে কালিম্পং মহকুমার সীমারেখা নির্দেশ করে বয়ে চলেছে। কালিম্পং-এর নয়নাভিরাম রূপটি আমার চোখে বারবারই সব চেয়ে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে ফেরার পথে নীচে নামার সময়। উত্তরে সিকিমের পর্বতশ্রেণী, সেগুলির মাথার উপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তিস্তা যেখানে দক্ষিণের দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে উত্তরপূর্ব দিক থেকে রঙ্গীতের অশান্ত উদ্দাম প্রবাহ এসে মিলেছে

তিস্তার জলধারায়। ওপারে চোখে পড়ে পাইনবনে ঢাকা টাইগার হিলের উদ্ধত চুড়া। কালিম্পং-এ আসার সময় ওদিকে নজর দেওয়ার সুযোগ বা মেজাজ কোনটিই থাকে না। তিস্তার উপরের সেতুটি পার হয়ে মোটরে বা বাসে কালিম্পং বাজারে পৌঁছাতে দশ মাইলের দূরত্বে চার হাজার ফুট উচ্চতা অতিক্রম করতে হয়। মোটরের সড়কটি এখানে ঠিক এক প্রাগৈতিহাসিক অজগরের কুণ্ডলীর মতই আঁকা বাঁকা। একটু পর পরই মোড়। চালককে যেমন অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়, আরোহীদের পক্ষেও অনিবার্যভাবেই বিপজ্জনক পথের উপরই মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করে রাখতে হয়। তাছাড়া সমস্ত দৃশ্যপটটিই থাকে পিছনের দিকে। ফেরার সময় ঝুঁক থাকলেও দৃষ্টি প্রসারিত হয় সম্মুখের পানে। তাই বোধ হয় প্রতিবারই কালিম্পং ছেড়ে আসার সময় মনে বেদনা অনুভব করেছি। দুচোখভরে দেখার মত অনেক কিছু ছিল তবু দেখা হল না। শুধু সৌন্দর্যের অনুভূতির দিক থেকেই নয়, কাঞ্চনজঙঘার ঘুম ভাঙ্গাবার প্রচেষ্টায় কালিম্পং মহকুমাকে উপেক্ষিত হয়েই থাকতে হয়েছে। আমাদের যেটুকু সাংগঠনিক শক্তি সেদিন গড়ে উঠেছিল, তাতে এই অঞ্চলের উপর একটানাভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় নি।

আন্দোলনের নতুন পর্যায়ে ঠিক করি যতগুলি সম্ভব চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করে আসব। পার্টির জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে শুরু করি প্রথমে 'সিপাইধুরা' তারপর 'নববুং' বাগান দিয়ে। এখানকার শ্রমিকরা যথেষ্ট সংগ্রামী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং এইসব বাগানকে মনে হয় একাধারে তীর্থক্ষেত্র এবং হাতে কলমে আন্দোলনের নেতৃত্বের শিক্ষালাভের বিদ্যালয়। বাগান দুটি প্রায় পাহাড়ের শেষ সীমায় অবস্থিত। 'সিপাইধুরা' ঠিক চুনভাট্টি স্টেশনের গোলাইয়ের নীচে। গোলাই অর্থ, এই জায়গায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ এবং হিলকার্ট রোর্ড দুটিই একটা গোল চাকার রূপ নিয়েছে।

'সিপাইধুরা' তে সভা করার মতন প্রশস্ত সমতল জায়গা নেই। স্টেশনের নীচে মোটরের রাস্তা যেখানে প্রকাণ্ড বৃত্ত রচনা করেছে— সেইখানে হয়েছে সভার আয়োজন। এত রাতে মোটর চলাচলের বালাই নেই অতএব রাস্তার উপরই সবাই জমায়েত হয়েছে। উত্তরে তিনধারিয়ার আলোকমালা। দক্ষিণে বহু নীচে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের শক্তিশালী সার্চলাইট চোখে পড়ে। গভীর অন্ধকারে পাহাড়ের পাদদেশের অরণ্যবলয় মুছে একাকার হয়ে গিয়েছে। একটি গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে সভা হচ্ছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সবাই ধৈর্য ধরে শোনে। পাহাড়ের জনসভার সঙ্গে সমতলের, বিশেষত কলকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সভাগুলির একটি পার্থক্য চোখে পড়ে। এখানে শ্রোতারা ঘন ঘন হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। নতুন এক জীবনের বাণী যতটুকু শোনে এবং তার যতটুকু বোঝে সবটুকু অন্তরে ধরে নিতে চায়। এতদিনে নেপালী ভাষাকে অনেক রপ্ত করে এনেছি। নেপালী ভাষার প্রবচন, প্রবাদগুলিও কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করেছি। কোন বিষয় বুঝিয়ে বলার জন্য ঐ সব প্রবচন দেখেছি শ্রোতাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সভা শেষে মশাল জ্বালিয়ে সবাই ফিরে চলে আপন আপন কুটিরে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে 'ফুলমায়া' দিদির কুটিরে। দার্জিলিং থেকে এই জায়গাটা অনেক নীচে বলে শীত খুব কম। কুটিরের দাওয়ায় দুটি বেঞ্চের উপরে কম্বল বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা। চা-বাগানে রাত্রি যাপন এই প্রথম। সকালে প্রাতকৃত্য সারবার জন্য যেতে হয় সামনের জঙ্গলে। পাহাড়ের এই ভাঁড়ার ওপারেই 'পাগল ঝোরা' উপত্যকায় নেমে 'মহানন্দা' নাম নিয়ে ছুটে চলেছে। ফুলমায়া দিদির সঙ্গে পরেও দেখা হয়েছে বহুবার। আমার নিজের কোন দিদি নেই। বোধ হয় সেইজন্য ভাইয়ের জন্য দিদির স্নেহকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই তাঁর সংস্পর্শে এসে। চা খেয়ে বিদায় নেওয়া চলবে না। ভাত বসিয়ে দিয়েছেন। কালকে খরগোস মারা

হয়েছিল। সে মাংস রয়েছে। খেয়ে তবে যাওয়ার অনুমতি মেলে। ফেরার পথ খরচ সঙ্গে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পর দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অন্য শ্রমিকেরা 'এম পি' কাকে বলে ঠিক না বুঝলেও আমি যে একজন কেউকেটা ব্যক্তি হয়েছি সেটুকু বোঝে। খবরটা ফুলমায়া দিদিও শুনেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে আমি সেই ছোট ভাইটিই আছি। ভাত খাওয়ার পর রওনা হওয়ার সময় আগের মতই জিজ্ঞাসা করেন 'পথ খরচ' আছে কিনা, না থাকলে তিনি দেবেন।

'নরবুং' বাগান এখান থেকে সাত আট মাইল দূরে। একসঙ্গে দুটি বাগানে সভার ধকল আমি সামলাতে পারবো না ভেবে সঙ্গী ভদ্রবাহাদুর হামাল সেখানকার সভার তারিখ স্থির করেছেন সপ্তাহ খানেক পরে।

'সিপাইধুরা' বাগানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে পূর্ত বিভাগের যে সড়কটি সেই পথেই 'নরবুং' যেতে হবে। পথ বিশেষ বন্ধুর নয় তবে সন্ধ্যার পর বাঘের ভয় আছে। নীচেই শুকনা-শিভোক গহণ অরণ্য। সেখান থেকে ব্যাঘ্ররাজ মাঝে মাঝে এদিকটায় সফরে এসে থাকেন। তাই আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেছে কয়েকজন। কিছুটা নীচে নামার পরই তারা মশাল জ্বালিয়ে নেয়। এ-ও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পূর্তবিভাগের সড়ক নেমে নিয়েছে উপত্যকার দিকে। ঠিক সেইখানে ডান পাশে একটি উঁচু টিলার উপর 'নরবুং' অবস্থিত। এখানে পৌঁছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আরো কিছু বিচিত্র উপাদান জমা পড়লো। দূরের দুই একটি বাগান থেকে মশাল হাতে দল বেঁধে এসেছে শ্রমিক নরনারী। মেয়েরা কালে ভদ্রে উৎসবে পার্বনে ব্যবহারের জন্য যে সৌখীন শাড়ী তুলে রেখেছে তাই পরে এসেছে সভায় যোগ দিতে। মাথায় উজ্জ্বল রংয়ের 'মুজেত্র' বা ওড়না। এই সভাটিও তাদের কাছে উৎসবেরই মতন। এই বাগানের প্রধান নেতা বিরধাসিং। নিরক্ষর অথচ এমন সাধারণ বুদ্ধি

সম্পন্ন ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ মানুষ আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে খুব কমই দেখেছি। ১৯৪৮ সালে যখন কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবাংলায় বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং পার্টির উপর দমননীতির খড়গ নেমে আসে তখন দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে যারা সব রকম ঝুঁকি নিয়ে পার্টিকে রক্ষা করেছে তাদের প্রথম সারিতে বিরধা সিং এর নাম লেখা থাকবে। দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে জেলা পার্টি নেতৃত্ব এই লোকটিকে বিশেষভাবে অবহেলা করেছে। বিরধা সিং-এর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৫২ সালে। দ্বিতীয় বারের বন্দীজীবন থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছি শুনে দেখা করতে এসেছিল। জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিমান জানিয়ে গেল। কিন্তু সে নিজে তখন যে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থায় ভুগছে, এমনকি অর্ধাশনে দিন কাটাতে হচ্ছে সে কথাটি ঘুণাক্ষরে জানায় নি। জানালে সামান্য কিছু আথিক সাহায্য করার মতন সঙ্গতি তখন আমার ছিল। কিছুদিন পরে যখন তার মৃত্যুসংবাদ পাই আর সেই সঙ্গে জানি অর্ধাশনে দিন কাটাবার সংবাদ তখন অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। আজও বেদনার ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে যায় নি।

ফিরে আসি অতীতের কথায়। যে সময়টা চা-বাগান পরিক্রমা শুরু করেছিলাম তখন নতুন পার্টি সদস্য সংগ্রহের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। যে সব শ্রমিক আমাদের ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিল শুধু তারা নিজেরাই নয়, তাদের পরিবারের সবাই মনে করত আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়ে গিয়েছি। বাইরের লোকেরাও তাদের তাই বোঝাত। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নে যোগ দেওয়া মানেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া। উপরোক্ত মনোভাবে লালঝাণ্ডার প্রতি শ্রমিক নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য এবং আন্তরিকতার প্রতিফলন হয় ঠিকই। কিন্তু একটি মজবুত পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে তা খানিকটা বাধাও সৃষ্টি করেছে। পার্টিসভ্য এবং ইউনিয়ন সভ্যের মধ্যেকার পার্থক্য-সূচক সীমারেখা বলে কিছু ছিলনা কার্যত। সংগঠন

গড়ে তোলার সময় জনগণের চেতনার স্তর এবং প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে চলতে অবশ্যই হয়। ইউনিয়নের সভ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়েছিল। জেলা নেতৃত্ব স্থির করে যে ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা বাড়াতে হবে। কেননা সরকারী আইন অনুসারে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার সময় হিসাব দিতে হয়। কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কথা ওঠে, এক পরিবার থেকে একজন যখন ইউনিয়নের সদস্য হয়েছে তখন গোটা পরিবারই ত' সদস্য হয়ে গিয়েছে। নতুন করে প্রত্যেককে 'রসিদ কাটতে' অর্থাৎ চাঁদা দিতে হবে কেন? আপত্তির পিছনে কিছুটা অর্থনৈতিক কারণ ছিল ঠিকই তবে সেটাই সব নয়। নতুন পার্টি সভ্য সংগ্রহ অভিযানের পর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখা গিয়েছে। হয়ত কোন বাগানের নবগঠিত পার্টি 'সেল'-এর সভা ডাকা হয়েছে। সভার সময় দেখা গেল যে ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে 'পার্টি সেল'-এর সভ্য তার বদলে হয়ত তার ভাই উপস্থিত হয়েছে। তারা মনে করে ইউনিয়নের সভাই হোক বা পার্টি সভাই হোক, পরিবারের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেই হল। নতুন পার্টি-সভ্য সংগ্রহ অভিযানের সময় ঐ অভিজ্ঞতা নজরে না থাকায় কার্যক্ষেত্রে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। নরবুং-এর সভায় যখন এমনি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখন বিরধাসিং তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে আমার চোখ খুলে দেয়। রাজনৈতিক চেতনার স্তর কিছুটা উন্নত হওয়ার আগে ঢালাওভাবে পার্টি সভা করাটা যে ভুল হবে সেটা সে খুব সোজা কথায় বুঝিয়ে দেয়।

এই পর্যায়ে চা-বাগানগুলির পরিক্রমা শেষ করি 'ধজে' বাগানে। বালাসন নদীর ওপারে নাগারী 'ভাঁড়া'র ওপারে অবস্থিত এই বাগানটি, চা-শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সকলের সামনের সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। ১৯৪৬ সালে এখানে দেড়মাস ধর্মঘট চলেছিল। সাহেব ম্যানেজার অনেক চেষ্টা করেও, ভাড়া করা দালাল আর পুলিসের সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে সমর্থ

হয় নি। সেই থেকে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম সেখানে একবার যেতেই হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যায় এসে হাজির হই। সঙ্গে ভদ্রবাহাদুর হামাল। পথে পরিশ্রম হয়েছে খুবই। 'সোনাদা' স্টেশন বাঁ হাতে ফেলে যখন 'পচেঙ্গ' বাজারের পথে নীচের দিকে রওনা হই তখনও প্রচণ্ড শীত। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে রেখেছে। কিন্তু খাড়া উৎরাই পথে যত নামছি ততই পরিশ্রমে শীত দূর হয়ে যায়। জামা ঘামে ভিজে জবজবে। একে একে ওভারকোট, কোট খুলে কাঁধে ফেলি। আগাগোড়া পূর্ত বিভাগের সড়ক ধরে গেলে হয়ত খাড়া উৎরাই কিছু কম হত। কিন্তু ঘুরতে হত অনেকখানি। তাই 'চোরবাটো' ধরে চলি! কিছু দূর নামার পর কাঁধের কোট ওভার-কোটের বোঝাও ভারী মনে হয়। দয়াপরবশ হয়ে অনভ্যস্ত কমরেডের প্রতি স্নেহকোমল ভদ্রবাহাদুর সে বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। পাইন গাছের কুঞ্জে ঘেরা 'রামতাল' সামনে। চা-কর সাহেবদের অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় হিসাবে এটি তৈরী করা হয়েছিল 'সুইমিংপুল' রূপে। এখন অবশ্য সে ভাবে ব্যবহার হয় না। সুদীর্ঘ পথ অতিবাহনের পর বালাসন নদীর উপরের ঝোলানো পুলে যখন পৌঁছাই তখন নাগারী 'ভাঁড়া'র শিখরে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ মিলিয়ে যায়নি বটে, তবে নীচে চারদিকে আবছা আঁধার নেমে এসেছে। সাত মাইল পথে প্রায় ছয় হাজার ফুট নেমেছি। পুলের ওপারে আবার হাজার দেড় হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বালাসনের দুরন্ত জলধারার দিকে চেয়ে দেখি। তরাইতে শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার পথে মাটিগড়া বাজার পেরিয়ে বালাসনের সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। সেখানে তার প্রবাহ এক বর্ষায় ছাড়া কত শান্ত। এখানে যেন সমতলভূমিতে পৌঁছাবার আগ্রহে উন্মাদ হয়ে ছুটে চলেছে।

ওপারে নানা জাতের পাহাড়ী গাছপালার ফাঁকে কুলিবস্তীর লাল-মাটি দিয়ে লেপা কুটিরের দেয়াল আর খড়ের ছাউনি চোখে

পড়ে। এখানে শ্রমিকদের সংগঠন খুব জোরদার। তাই প্রায় প্রকাশ্যেই বাগানে ঢুকি। সূর্যরাইয়ের কুটিরে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। খড়ের চাল অনেক নীচু। মাটির দাওয়ার উপরে উঠতে মাথা নোয়াতে হয়। বারান্দার এক কোণে মকাইয়ের ছোট একটি স্তূপ, সামনের বছরের বীজ তুলে রাখা হয়েছে। শ্রমিক মেয়ে পুরুষেরা দিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরছে। মেয়েরা মাথায় ঝোলানো টুকরি নামিয়ে রেখেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জল আনতে ছোটে। বড় বড় তামার ঘড়ায় করে জল আনবে দূরের ঝরনা থেকে। অজস্র জলধারা পাহাড়ের বুক চিরে নীচের দিকে ছুটেছে। অতি অল্প আয়াসে, অল্প ব্যয়ে কুলিদের ঘরে ঘরে নাহলেও কাছাকাছি জায়গায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু যাদের আধ-পেটা খেতে দিয়েই মালিকেরা ভাবে যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন করেছে তাদের লাঘবের কথা তাদের মনের কোণে ঠাঁই পাবে কি করে ?

'ধজে' বাগানের কয়েকজন নেতা এখনও জেলে, দণ্ডিত বন্দী। গত ধর্মঘটের জের হিসাবে এক মামলায় তারা অভিযুক্ত হয় এবং শাস্তি পায়। তাদেরই একজনের কুটিরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের। গৃহকর্ত্রী সযত্নে পরিবেশন করে। অতিথি সেবায় মেয়েদের মন সর্বত্র একই রকম। আয়োজন সামান্যই। লাল মোটা চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল, তারপর একটু দুধ। শেষের দুটি উপকরণের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে অতিথিদের জন্য। নইলে এরা নিজেরা শুধু ভাত আর নামমাত্র একটু তরকারি দিয়ে খাওয়া সারে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর উঠোনের কোণে মুখ ধোওয়ার সময় গৃহকর্ত্রী নিজ হাতে জল ঢেলে দেন। উপচারের দৈন্য পুষিয়ে দিতে চান অন্তর-ছেঁচা যত্ন দিয়ে।

খাওয়ার পর সভা শুরু হবে। ঘরের দাওয়ায় অতিথিদের বসার ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নীচে আঙিনা। নেতাদের বক্তৃতা শোনার জন্য উন্মুখ নরনারীতে ভরে গিয়েছে। এখানকার উচ্চতা কম হওয়ায়

শীতের প্রকোপ দার্জিলিং শহরের তুলনায় অনেক কম। লোক আসা শেষ হয় নি। মশাল জ্বালিয়ে বাগানের বিভিন্ন বস্তি থেকে আসছে এক এক দল। সন্ধ্যার পর চারিদিক গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যায়, পায়ে চলার পথের বন্ধুর রেখা অভ্যস্ত চোখেও ধরা পড়ে না। আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘোরার সময় একটুখানি বে-ঠিক পদক্ষেপ পৌঁছে দেবে অনেক নীচে। মালিকপক্ষের তরফ হতে পথ আলোকিত করার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ সামনের 'ভাঁড়া'য় ম্যানেজার সাহেবের বাংলো বৈদ্যুতিক আলোকে দিনের মত উজ্জ্বল।

মিষ্টি একঘেয়ে সুরে গান গাইতে গাইতে আসছে পাহাড়ী তরুণীরা। ওদের একঘেয়ে জীবনে এই সভাটিই বৈচিত্র্যপূর্ণ। উত্তরে ভনজেঙ্গের চূড়া থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসে। নীচে থেকে কানে আসে অশান্ত বালাসনের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ। ওপারের পর্বতগাত্র অন্ধকারে মসৃণ। মেয়েদের মিষ্টি সুরেলা আওয়াজ প্রকৃতির ঐকতানের সঙ্গে সুর মেলায়। বোধ হয় এমনি পরিবেশেই পর্বতনন্দিনীদের গান শুনে মহাকবি কালিদাস গীতকণ্ঠী কিন্নর কুমারীদের কল্পনা করেছিলেন।

চা-বাগান পরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটা কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। আমাদের অর্থাৎ সংগঠকদের অজানিতেই—চা-শ্রমিক আন্দোলন অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়ার জন্য লড়াইয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে এদের কাছে অনেক বড় তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা নিজেরাও হয়ত সে বিষয়ে সচেতন নয় কিন্তু আন্দোলন তাদের অবচেতন মনে এক বৃহত্তর জীবনের বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে। আপাতদৃষ্টিতে যে ঘটনাকে হয়ত নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয় সেই সবের মধ্যে তার আভাস পাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন কমরেডকে দেখবে বলে দাওয়ার সামনে এসে ভিড় করে। কয়েকটা কেরোসিনের কুপি সম্বল। তাতে ওদের উৎসাহের অন্ত নেই। বড়রা অপেক্ষা করে আছে 'কথা' শোনার অপেক্ষায়। এরা 'রামায়ণ,' 'সত্যনারায়ণ' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়

ব্রাহ্মণেরা যে উপাখ্যান বর্ণনা করে তাকেই বলে 'কথা'। আন্দোলনের কাহিনীও 'কথা'র পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। এমনটিও দেখেছি দার্জিলিং শহরের কাছে কোন চা-বাগানে, সত্যনারায়ণ কথা হবে সেজন্য শ্রমিক প্রতিনিধিরা পার্টি অফিসে এসেছে লালঝাণ্ডা নিয়ে যেতে। উঠোনে ঝাণ্ডা পুঁতে তার সামনে 'কথা' হবে। বুদ্ধিজীবী কমরেডরা যে যাই ভাবুন আমি দেখেছি এই ছোট্ট ঘটনায় রক্ত পতাকার প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্যেরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

গভীর রাত পর্যন্ত তারাভরা আকাশের নীচে বসে শ্রমিক নরনারী একমনে বক্তৃতা শোনে। তাদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া, আন্দোলনের নতুন পর্যায়—এসব প্রসঙ্গ শেষ করে শোনাই সারা দেশব্যাপী গণজাগরণের কাহিনী। বাল রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন সমাজ গঠনের কর্মকাণ্ডের কথা, বিশ্বের নানা দেশের গণসংগ্রামের বিবরণ। আমিও চেষ্টা করি সাদামাটা কথায়, নেপালী ভাষার প্রবচন এবং উপমার সাহায্যে বক্তব্যকে তাদের অন্তরে পৌঁছে দিতে। ওদের নীরবতা সত্ত্বেও বুঝি যে যতটুকু বুঝতে পারে সেটুকুকে মনের গভীরে ধরে রাখছে। চা-শ্রমিক আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসছে। '৪৬ সালের লড়াইয়ের ফলে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাতে এদের মনে জেগেছে আত্মবিশ্বাস, সংগঠিত শক্তির উপর অবিচল আস্থা। আর নেতাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে অনেক গুরু দায়িত্ব। মধ্যযুগীয় অত্যাচার এবং শোষণের বহু উপসর্গ এখনও প্রবলভাবে বজায় রয়েছে। সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে লড়াইয়ের পরবর্ত্তী পর্যায়ের জন্য। কিন্তু নেতৃত্ব সে বিষয়ে কতটুকু সচেতন। তাঁদের মধ্যে দেখেছি আত্ম-সন্তোষের মনোভাব প্রবল।

ঐ সব কথা ভাবি সভাশেষে সূর্য রাইয়ের ঘরের দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে। সভা যখন শেষ হয় তখন চরাচর ঘুমে অচেতন। আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে দাওয়ার উপরে কম্বল বিছিয়ে। ঘরের ভিতরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গৃহকর্ত্রীর নিজেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না।

ভদ্রবাহাদুর শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নামে না সহজে, এটি আমার আ-কৈশোর অভ্যাস। নতুন কোন অভিজ্ঞতা হলে তার রেশ বহুক্ষণ পর্যন্ত মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সচল করে রাখে। অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক হলে তার মূর্চ্ছনা হৃদয়বীণার তারগুলিতে ধ্বনিত হতে থাকে। সারা দিনে যা যা ঘটছে সেগুলিকে নতুনভাবে স্মরণ করি। কল্পনার শাখায় ভর দিয়ে মন চলে যায় অজানা অনাগত দিনগুলির সন্ধানে। বিনিদ্র চোখে চেয়ে আছি আকাশের দিকে, শেষ রাতের কুয়াশার জাল ছড়িয়ে পড়ছে। বাঁ দিকে কুয়াশার আস্তরণের অনেক উপরে 'ঘুম' পাহাড়ের বিজলী বাতিগুলি চোখে পড়ে। তারাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। সব কিছু ঘুমিয়ে—জেগে রয়েছি শুধু আমি আর জেগে আছে বালাসন। অশান্ত গর্জন তার। পাহাড়ের বুক চিরে, বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের উপর আছড়াতে আছড়াতে তার জলরাশি ছুটে চলেছে সমতলের দিকে। গভীর বনে ঢাকা পর্বতের সানুদেশ পিছনে ফেলে তরাইয়ের অরণ্যপ্রান্তরের বুক চিরে মিলবে মহানন্দায়, সেখান থেকে পদ্মায়, তারপর সাগরে। তেমনি সদ্য-ঘুমভাঙা নেপালীভাষী জনতার আন্দোলনও এগিয়ে চলেছে বিশ্ব গণমুক্তি সংগ্রামের সাগরসঙ্গমে। জনতার সঙ্গে মিশে নতুন ইতিহাস রচনায় অংশ নিচ্ছি। অংশ নেওয়াতে থেমে থাকা যথেষ্ট নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

চা-বাগানগুলিতে ঘোরার আশু প্রত্যক্ষ ফল হয় জেলা পার্টি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের দিনে দার্জিলিং শহরে অভূতপূর্ব জন সমাবেশ। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস। পাহাড়ে তখন শীতের জের প্রকটভাবে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে, জেলা সম্মেলন উপলক্ষে প্রাদেশিক নেতৃত্বের তরফ থেকে এসেছেন কমরেড ভবানী সেন এবং সরোজ মুখার্জী, প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে প্রত্যেকটি বাগানের অর্থাৎ যেখানে যেখানে আমাদের সংগঠন আছে সেখানকার অগ্রণী কর্মীরা। তাদের সংখ্যাও কম নয়। কমরেড স্নেহাংশু আচার্যদের দুখানা বাড়ী ছিল দার্জিলিং শহরে, জলাপাহাড়ের পথে। তার একটির নীচের তলাটা তিনি পার্টি কমিউন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'ধোবিতালাও'তে যে কমিউন ছিল তার অবস্থার কথা আগেই বলেছি, ১৯৪৬ সালের পূজাবকাশে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী স্নেহাংশু বাবুর দার্জিলিং বাসের সঙ্গী হয়েছিলেন। 'ধোবীতালাও' এর কমিউন দেখে এসে তিনিই স্নেহাংশু আচার্যকে বলেন তাঁর একটি বাড়ীর নীচের তলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে। স্নেহাংশু বাবুও রাজী হয়ে যান। ফলে আমাদের যেন একেবারে পাতাল থেকে স্বর্গে আরোহণ। তিনটি প্রকাণ্ড ঘর, আলো বাতাসের দাক্ষিণ্য। সামনের দিকে তাকালে নীচে শুধু দার্জিলিং শহরই নয়, সামনের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হয়না। পিছনে একদিকে টাইগার হিলের সুউচ্চ শিখর চোখে পড়ে, অন্যদিকে তিস্তার উপত্যকার ওপারে কালিম্পং-এর পাহাড় শ্রেণী। প্রতিনিধিদের জন্য ঢালাও বিছানা মেঝেতে পেতে একটি ঘরেই কুলিয়ে গেল। বিভিন্ন বাগান এবং কৃষক বস্তী থেকে চাল ডাল সবজী সংগৃহীত হয়েছে প্রতিনিধিদের খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য। কলকাতা থেকে আগত

নেতারা প্রতিনিধি সমাগম দেখেই অত্যন্ত অভিভূত। অন্যান্য জেলার তুলনায় একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই শ্রমিক। দার্জিলিং শহর এবং শিলিগুড়ির প্রতিনিধিদের নিয়ে মধ্যবিত্তের সংখ্যা জন দশেকের বেশি নয়। পার্টির এই সামাজিক গঠন ভবিষ্যতের পক্ষে সম্ভাবনাপূর্ণ হলেও সাময়িকভাবে বেশ কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। পার্টি অফিসের লেখাপড়ার নিম্নতম প্রয়োজনীয় কাজটুকু অনেক সময় ঠেকে থেকেছে। সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যারা এসেছে তারা লড়াইয়ের ময়দানে জঙ্গীপনার পরিচয় দিলেও রাজনৈতিক চেতনার স্তর খুব উন্নত নয়। কর্মীদের একেবারে প্রাথমিক স্তরে যে ভাবে বোঝাতে হয় ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় প্রতিনিধি সম্মেলনে। দায়িত্ব এসে পড়ে আমারই উপরে। প্রথমে বিভিন্ন বাগানের জঙ্গী কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিই। লড়াইয়ের সময় কে কি রকম ভূমিকা নিয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার সময় লক্ষ্য করি শ্রোতাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন যারা নিজ নিজ বাগানের সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে থেকে কাজ করেছে তাদের সামনে অধিবেশনটি পরস্পরের সঙ্গে মিলনের মঞ্চে পরিণত হয়। সম্মেলন যে প্রকৃত অর্থে তাদেরই সম্মেলন সে কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পরবর্তী করণীয়, পার্টি এবং ইউনিয়নের পার্থক্য বোঝানো, পার্টি কর্মীদের দায়িত্ব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে অবহিত করা। তত্ত্বগত সূত্রগুলিকে উপস্থিত করতে হবে ওদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে। এমন সব উপমা, উদাহরণ দিতে হবে যা তারা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। ভেবে স্থির করি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের উদাহরণটাই সব চেয়ে উপযোগী হবে। পার্টি হল ইঞ্জিন, আর ইউনিয়ন হল রেলের কামরাগুলি, টিকিট কেটে কামরাতে বসলেই চূণভাট্টি থেকে দার্জিলিং পৌছাবে না, যদি না ইঞ্জিন কামরাগুলিকে টেনে না নেয়। ইঞ্জিন চালকের দায়িত্ব কত বেশি সেটা পাহাড়ের রেলপথের

যাত্রীদের পক্ষে বোঝা কঠিন নয়। 'লুপ' বা নেপালীদের ভাষায় 'গোলাই' এবং "জিগ জ্যাগ" (zig zag) এই দুটির উপমা খুব কাজে লাগে। তিনধারিয়া স্টেশন থেকে যাত্রা করা ট্রেনটিকে খানিকক্ষণ পরেই অপর একটি লাইন দিয়ে অনেকখানি পিছনের দিক হটে যেতে হয়। সেখান থেকে আর একটি লাইন ধরে পাহাড়ের উপরের ধাপের দিকে এগিয়ে চলতে হয়। ছোটখাটো zig zag আরো দুই একটা আছে। তারপরে বর্ষার দিনে ট্রেনের লাইন পিচ্ছিল হয়ে থাকে। ইঞ্জিনের সামনে বসে একজনকে লাইনের উপর বালু ছড়াতে ছড়াতে যেতে হয়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জিনচালক হলেই চলবে না তার অন্যান্য সহকর্মীদেরও নিপুণ হওয়া চাই। ঠিক অমনি ভাবে পার্টির ইঞ্জিন চালকদের প্রশিক্ষণ লাভ করতে হবে। শ্রোতাদের মুখ দেখে বুঝতে পারি যে বিষয়টি তাদের পক্ষে নতুন হলেও খানিকটা বোধগম্য হয়েছে।

প্রতিনিধি সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম নির্বাচিত জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন রতনলাল ব্রাহ্মণ, সম্পাদক-মণ্ডলীর অপর সভ্যেরা যথাক্রমে গণেশলাল সুববা, মদন থাপা এবং আমি। জেলা কমিটিতে ভদ্র বাহাদুর হামাল, ওয়াংদি লামা, কালুসিং গহতরাজ, কালিম্পং-এর সংগঠক ভবেশ স্থান পায়। শিলিগুড়ি থেকে জেলা কমিটিতে স্থান পায় নৃপেন বসু এবং শান্তি বসু। শেষের দুজন এখন শুধু কমিউনিস্ট রাজনীতিই নয়, রাজনীতির ময়দান থেকে সরে গিয়েছেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন দার্জিলিং শহরে যে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল তা আমাদের আশাতীত। দূর দূরের চা-বাগান থেকে মিছিল করে রক্তপতাকা হাতে নিয়ে শ্রমিক নরনারীর এক একটি দল আসছে। রাত্রির আঁধার ভাল করে কাটবার আগেই রওনা হয়েছে তারা। সকাল দশটা বাজতে না বাজতে পার্টি অফিসের সামনের চত্বরে মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি। অন্যেরা এসে পৌঁছালে ভীড়ের চাপে

হয়ত অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদয় হতে পারে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য তখন থেকেই সবাইকে চার চার জনের এক এক সারিতে দাঁড় করিয়ে সুশৃঙখলভাবে মিছিল সংগঠিত করা হয়। পার্টি অফিসের চত্বরে ঢোকার সামনের দিক দিয়ে আসবে নবাগতেরা, যারা আগে এসেছে তারা উত্তরের নিষ্ক্রমণ পথ দিয়ে এখন থেকেই হিলকার্ট রোডের উপর গিয়ে দাঁড়াতে থাকবে। গোটা দার্জিলিং শহর পরিক্রমা করবে মিছিলটি। তার সম্মুখের অংশ যখন 'চকবাজারে' অর্থাৎ পার্টি অফিস থেকে বেশ কিছুটা দূরে পৌঁছেছে তখনও অন্যান্য চা-বাগান থেকে নতুন নতুন মিছিল আসছে। সুতরাং চক বাজারের কাছেও হিলকার্ট রোডে ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হয় নেতাদের। রাস্তার একপাশ দিয়ে মিছিলের সম্মুখের অংশ এগিয়ে চলবে 'জজ বাজার' পার হয়ে স্টেশনের দিকে আর বাঁপাশ দিয়ে নবাগতেরা যাবে পার্টি অফিসের সামনের চত্বরে। জন সমাগম শুধু আমাদের কাছেই নয়, শহরের সকলের কাছেই অভাবনীয়, অচিন্ত্যপূর্ব। শহরের আকাশ যেন সেদিন রক্ত-পতাকায় ঢেকে গিয়েছে। বাতাস মুখরিত হয়েছে 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ' 'রাতো ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। নেপালীরা লাল ঝাণ্ডাকে বলে 'রাতো ঝাণ্ডা'। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং চা-বাগানের মালিকেরা কিরকম সন্ত্রস্ত হয়েছে তা বোঝা যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। কথা ছিল মিছিল স্টেশনের কাছে পৌঁছে 'লেডেনলা রোড' ধরে যাবে সোজা চৌরাস্তায়। সেখান থেকে 'ভিক্টোরিয়া রোড' ধরে নেমে আসবে চকবাজারে। চৌরাস্তায় যাবার সময় পাশেই পড়বে 'প্ল্যান্টার্স ক্লাব'। 'লেডেনলা রোড' যেখানে চৌরাস্তার দিকে উঠবে দেখি সেখানে কয়েকজন ইংরেজ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। তারা বলে মিছিল বাঁদিকে 'দারোগা বাজারের' পথে ঘুরিয়ে দিন। কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তারা খুব নম্রভাবে বলে, 'ডেপুটি কমি-শনারের অনুরোধ। কোন নিষেধাজ্ঞা নেই'। আছে বল্লে হয়ত জনতাকে সেদিন বাগ মানানো সম্ভব হত না। নেতাদেরও রক্ত গরম হয়ে

উঠত। কিন্তু 'ডেপুটি কমিশনারের অনুরোধ' বলাতে আমরা মেনে নিয়ে মিছিলের গতিপথ নীচের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। পরে এই বিষয়ে নেতাদের মধ্যে কিছুটা মতান্তর হয় তবে সেটা মিটেও যায়। ডেপুটি কমিশনারের অনুরোধ কেন মেনে নেওয়া হল সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা যাবে।

পার্টি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে জন-সমাবেশ হয়েছিল তার অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। সেটি হল সমাবেশে শিলিগুড়ি থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এবং বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী শ্রমিকের যোগদান। শিলিগুড়িতে সেই সময়টাতে পার্টির গণভিত্তি বলতে করাত কলগুলির শ্রমিকদের ইউনিয়ন। তরাই অঞ্চলের চা-বাগানে তখনও আমরা প্রবেশ করতে পারি নি। কৃষকদের মধ্যে খানিকটা প্রভাব গড়ে উঠলেও তার পরিধি সঙ্কীর্ণ। শহরের ছয় সাতটি 'করাত কলে' (কাঠচেরাইয়ের কল) শ'তিনেক শ্রমিক কাজ করে। লালঝাণ্ডার ডাকে তারা যে কোন সময়ে সাড়া দিয়ে থাকে।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের কাজ হয়েছে সমতল অঞ্চলের বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পাহাড়ের মেহনতী মানুষের ঐক্যের সত্যটি তুলে ধরা। এমনিভাবেই গোর্খালীগ নেতৃত্বের প্রচারের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের খেটে-খাওয়া মানুষেরা যাতে বোঝে যে সমতল ভূমির খেটে-খাওয়া মানুষেরাও রক্ত পতাকার নীচে সংগঠিত হয়ে একই লক্ষ্য নিয়ে একই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমরা নানা ভাবে চেষ্টা করেছি। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে'র অধিবেশন হয়। চা-শ্রমিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বাগান থেকে অগ্রণী শ্রমিকদের বাছাই করা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আমরা ঐ অধিবেশনে যোগ দিই। প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন কলকাতার

রাজপথে শ্রমিকদের যে বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা শেষে ময়দানে মিলিত হয় তাতে দার্জিলিংএর শ্রমিক প্রতিনিধিরা সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলে। তাদের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ময়দানের সমাবেশকে তাদের প্রায় সবারই মনে হয়েছিল কল্লোলিত জনসমুদ্র। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যে যার বাগানে ফিরে গিয়েছে। যা দেখেছে, বা শুনেছে, নিজের মনের রংয়ে রঙীন করে অন্যদের কাছে বর্ণনা দিয়েছে। এমনিভাবেই আমরা চেষ্টা করেছি শ্রমিকশ্রেণীর আন্ত-র্জাতিকতার শিক্ষাকে ওদের সামনে জীবন্ত করে তুলতে। চক বাজারের সমাবেশেও সমতলভূমি থেকে আগত প্রতিনিধিদের অংশ-গ্রহণের কথাটা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলিতে সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাহের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের নবজাগ্রত নেপালী ভাষী জনগণের সংহতির কথা ঘোষণা করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বাধীন ভারতের কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে তুলে ধরা হয় ঐ প্রস্তাবে। তখনও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট একটা ধারণা গড়ে না উঠলেও রাজনৈতিক শ্লোগান হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন এই প্রথম। তখন পর্যন্ত দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষীরা নিজেদের 'গোর্খা' বলেই পরিচয় দিত। 'গোর্খা' শব্দটির বদলে 'নেপালী' শব্দটির প্রচলন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকেই করা হয় পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৫০এর দশকে। আমরা উপলব্ধি করি যে 'গোর্খা' সংজ্ঞাটি এখানে নবগঠিত 'নেপালী' জাতিসত্তার চরিত্রকে পুরোপুরি প্রকাশ করে না। যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলার সমতল অঞ্চলে 'গোর্খা' কথাটিই প্রচলিত ছিল। সাধারণ ভাবে সর্বদা একটা ধারনা ছিল এই যে গোর্খারা ইংরেজ বংশবদ ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যবাহিনীতে 'গোর্খা রেজি-মেণ্ট' ছিল এবং সেই রেজিমেণ্ট যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গণে অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তা থেকেই উক্ত ধারণার ব্যাপক প্রচলন হয়। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের

জাগরণের তথা সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করে নি। সম্ভবত সেই জাগরণ রক্ত পতাকার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল বলেই তাকে উপেক্ষা করা হয়। দার্জিলিং জেলা পার্টি সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফের শিরোনামে ছাপা হয় "দার্জিলিং-এ গোর্খা জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার জাগরণ" অথবা এই জাতীয় কিছু। এতগুলি বছরের ব্যবধানে সঠিক কথাগুলি মনে পড়ছে না।

যে সময়টার কথা বলছি অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক, তখন সারা দেশের উপরে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগের কালো মেঘের ছায়া। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের কলকাতায়, তারপর বিহারে এবং নোয়াখালীতে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার প্রত্যক্ষ প্রভাব দার্জিলিং জেলায় পড়েনি ঠিকই। শুধু দার্জিলিং জেলা কেন, উত্তর বাংলার জেলাগুলিই সেই অশুভ প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী কৃষকদের সম্মিলিত তেভাগা সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারকারীদের প্রতিহত করেছে। তবুও অনিশ্চয়তা দূর হয় নি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছে কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদের ঐক্য হোক বা না হোক, তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারত ছেড়ে চলে যাবে। রাজনীতি সচেতন দেশপ্রেমিক মানুষদের কাছে এই অন্তর্বর্তী দেড় বৎসর উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কূট চক্রান্ত কতরকম খেলা দেখাবে কে জানে। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি বাধিয়ে দেওয়ার নীতিও তারা বরাবর অনুসরণ করে এসেছে। পার্বত্য অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার আশঙ্কা ততটা নেই। দার্জিলিং ও কার্শিয়ং শহরে সামান্য সংখ্যক যে কয়েকটি মুসলিম পারিবার বাস করে তাদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্ক ভালই। এখানে কোন বিপদ যদি আসে তা আসতে পারে

ভাষাগত অর্থাৎ সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে পাহাড়ের জনগণের বিক্ষোভের আকারে। শ্বেতাঙ্গ চা-মালিকদের পক্ষ থেকে উস্কানি এবং ইন্ধন সরবরাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে গোর্খালীগও তখন দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার আওয়াজ তুলেছে। এহেন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সব সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী নির্দল ব্যক্তিদের নিয়ে শান্তিকমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সুখের কথা সে চেষ্টায় সবাই সাড়া দেয়।

সরকার পক্ষেও যথেষ্ট আতঙ্ক আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সারা ভারতে গণবিক্ষোভের যে তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেটাইত' ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ। কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃত্ব সাময়িক ভাবে বিক্ষোভের রাশ টেনে ধরতে সমর্থ হলেও কতদিন তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং ক্রোধ যদি বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের আকার নেয় তাহলে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সামরিক শক্তির জোরে তাকে দমন করা সম্ভব নয়। সেকথা ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ভালভাবেই জানে। সেইজন্যই তারা কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। সরকারী মহলে সামগ্রিক ভাবে যে আতঙ্ক রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মনেও তার ছায়া পড়েছে। ছোট্ট একটি ঘটনায় সে কথা বুঝতে পারি। ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে চকবাজারে জনসভায় পার্টির দুজন শীর্ষনেতা জ্বালাময়ী বক্তৃতাদানকালে আবেগের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার সম্বন্ধে গোয়েন্দাবিভাগ অতিরঞ্জিত রিপোর্ট দাখিল করায় জেলায় ডেপুটি কমিশনার শহরে তিনমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেণ। সভাসমিতি মিছিল সবই নিষিদ্ধ। অথচ মাসখানেক পরেই জেলা পার্টি সম্মেলন। দুএকদিনের মধ্যে গোর্খালীগের পক্ষ থেকে জনসভার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সুশীল চ্যাটার্জী এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ দুজনেই শহরে অনুপস্থিত। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর যে কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম তারা আলোচনায় ঠিক করি শান্তি কমিটির নেতাদের কাছে যাওয়া যাক। শান্তি কমিটির সদস্যেরা যদি রাজী হয় তাহলে যা করনীয় তা যৌথ উদ্যোগেই হবে। পার্টির পক্ষ থেকে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হল ভদ্রবাহাদুর হামাল এবং আমাকে। গণেশলাল সুব্বা কোপন স্বভাবের দরুণ এই ধরণের আলোচনায় যোগ দেওয়ার অনুপযুক্ত। শান্তি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করে প্রত্যেককে বৈঠকে মিলিত হতে রাজী করা গেল। বৈঠকে কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে ১৪৪ ধারা অমান্য করা হোক। অন্যেরা অতদূর যেতে রাজী নন। অবশেষে ঠিক হল প্রথমে ডেপুটিকমিশনারের কাছে সকলে মিলে যাওয়া যাক্। সেই সময়টাতে যে ইংরাজ ভদ্রলোক জেলাশাসক হয়ে এসেছিলেন তিনি অন্যান্য ইংরাজ আমলাদের মত উদ্ধত বা অভদ্র নন। সাক্ষাতে সহজেই সম্মত হলেন এবং আলোচনার সময়ও যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। কি কারণে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন 'কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতারা বলেছে যে গোয়েন্দা ইনস্পেক্টারকে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেওয়া হবে"। আমাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ করে বলাহয় যে আমাদের নেতারা যত জ্বালাময়ী বক্তৃতাই দিন না কেন, এই ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করতে পারেন না। উপস্থিত অন্যান্যেরাও আমাদের বক্তব্য সমর্থন করেণ। তখন ডেপুটি কমিশনার বলেন "যদি আপনারা সকলে মিলিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে শহরে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব নেবেন তাহলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারি।" এইভাবে একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আমাদের গণসমাবেশের দিন যে ডেপুটি কমিশনারের অনুরোধে চৌরাস্তায় ওঠার পথের মুখ থেকে মিছিল নীচের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা করা হয় এই কারণেই।

১৯৪৭ সালের জুন জুলাই মাসে দার্জিলিং শহরের নেপালীভাষী মধ্যবিত্তের মন আর একটি ঘটনায় খুব উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে নেপালে রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথম সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। রাণাশাহী তার মোকাবিলা করে চিরাচরিত বর্বর দমননীতির সাহায্যে। নেপালী কংগ্রেসের কিছু নেতা এবং গণআন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি তখন দার্জিলিং-এ নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডঃ দিল্লী রমন রেগমি। ডঃ রেগমি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নেপালের ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে বিদ্বৎ.সমাজে যথেষ্ট পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। নেপালী কংগ্রেসের মাধ্যমে রাণাশাহীব দমন নীতির অনেক সংবাদ এখানে এসে পৌছাতে থাকে। তার আশু প্রতিক্রিয়া হয় গোর্খা লিগের ভাষণ। অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগের সভাপতি রণধীর সুব্বা কালিম্পংএ একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে নেপালে যান এবং রাণাশাহীর বিশ্বস্ত সমর্থক রূপে কাজ করেণ কিন্তু তরুণেরা এই কাজকে বরদাস্ত করতে পারে না। তাদের চাপে গোর্খা লীগের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য জনসভায় রাণাশাহীর নিন্দা করা হয়।

সেই বহু বছর আগে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে ছোট বড় কত ঘটনার কথাই না মনে পড়ে। সেগুলির মধ্যে অনেক নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করি। সবগুলির কথা বলাত' সম্ভব নয়। তাই যেগুলির তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—সেইগুলিই উল্লেখ করে চলেছি।

বিপুল জনসমাবেশ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জেলা পার্টি সম্মেলন অনুষ্টিত হল। নেতাদের চোখে বড় হয়ে ওঠে সাফল্যের দিকটিই। সংগঠনগততাবে ও নেতৃত্বের দক্ষতার বিচারে যে দুর্বলতা গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল তা নজড় এড়িয়ে যায়। আমি নিজেও ব্যাতিক্রম নই—। এমনি একটি দুর্বলতা ধরা

পড়ে 'ধজে' বাগানের পরবর্তী ঘটনায়। সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন শীর্ষ নেতা বেরিয়ে পড়েন কলকাতা অভিমুখে। আমিও দিন কয়েকের জন্য শিলিগুড়ি ঘুরে আসবো বলে রওনা হই। পার্টির সদর দপ্তরে যারা থাকে তাদের মধ্যে একমাত্র ভদ্রবাহাদুর হামালের সঙ্গেই চা-বাগান শ্রমিকদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। হামাল ছিল অক্লান্ত নিষ্ঠাবান কর্মী কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তাছাড়া চা-শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তখন নেতাদের সবারই—পক্ষে নতুন। সাফল্যের পবে নিজেদের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত কবে দেখার ঝোঁকটা অল্প বিস্তর প্রায় সবারই মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং তারা উপস্থিত থাকলেও ঘটনার গতি অন্য দিকে মোড় নিত এমনটি বলা চলে না। অনভিজ্ঞতার খেসারত হল 'ধজে' চা-বাগানে এপ্রিলমাসেই কতৃপক্ষ কর্তৃক 'লক-আউট' ঘোষনা। এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর চা-ঝোপে কচিপাতার উদগম হয়। তখন থেকে পাতাতোলার মরশুমের সূচনা। ম্যানেজিং এজেন্সীর অফিস কলকাতায়। শ্রমিক সম্পর্কিত নীতি নির্ধারিত হয় ছয়টি অ্যাসোসিয়েশানের দ্বারা। সুতরাং নতুন কোন দাবী নিয়ে লড়ায়ে নামতে হলে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সংগঠিত প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 'ধজে' বাগানের নেতারা এপ্রিল মাসেই একক ভাবে অর্থাৎ ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ না করেই 'পাতা তোলা'র জন্য মজুরীর হার বাড়াবার দাবী করে বসে। মালিকপক্ষ বোধ হয় এমনিই একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। তাই কোনরকম আলোচনার বদলে সরাসরি লক আউট ঘোষণা করে।

লক আউটের প্রতিবাদে জেলা নেতৃত্বের তরফ থেকে যে রকম সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। সরকারী শ্রমদপ্তরের কাছে চিঠি লেখা এবং কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনার অনুরোধ

জানানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা হয় নি। নিছক অনভিজ্ঞতাই যে এজন্য দায়ী তা বলা চলে না। ঠিক সেই সময়টিতে দেশে যেরকম রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থা ছিল তাতে শ্রমদপ্তর এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। জেলা নেতৃত্বের সকলেও দার্জিলিং এ উপস্থিত ছিলেন না। দুই একজন বাদে অন্যেরা নানা কারণে বা উপলক্ষ্যে কলকাতা বা অন্যত্র সফর করছিলেন। আমার পক্ষেও জেলা পার্টি সম্মেলনের কিছুদিন পরেই স্বাস্থ্যের কারণে কয়েকমাস কলকাতা থাকতে হয়েছে। জেল থেকে যখন ছাড়া পাই তখন এমন দুই একটি ব্যাধিকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে আসি যা পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়াতে কাজের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছে। চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে চলাফেরা যেমন শ্বাস যন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে তেমনিই উচ্চতার তারতম্যে তাপের হেরফেরের মধ্যে এসে পড়তে হয়েছে। চড়াই পথে কয়েক হাজার ফীট পথ উঠতে ঘামে জামা ভিজে গিয়েছে আবার সেই ঘাম গায়েই শুকিয়েছে। চিকিৎসকেরা উপদেশ দিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে পরিহার করতে। কিন্তু একে ত' হিমালয়ের পরিবেশের উপর আমার মনে প্রচণ্ড টান রয়েছে। তার উপরে কাজ। তাগিদ হিসাবে কাজ করেছে একটা প্রবল জিদ। অনেক গুলি বছর কেটেছে কারা প্রাচীরের অন্তরালে। ইতিহাসত' থেমে থাকে নি, আমাদের দেশের ও জাতির জীবনে অনেকগুলি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। বাইরে এসে ভেবেছি পিছিয়ে থাকলে চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিজ্ঞতার শূণ্য স্থান গুলি পূর্ণ করে ছুটে চলতে হবে ইতিহাসের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে। কবিগুরুর ভাষায় 'ধাবমান কালের দ্রুতরথে' এগিয়ে চলতে হবে 'নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়'! মনের দিক দিয়ে অনেক কিছু পেয়েছি সেই সাধনায়, তবে শরীর তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। বিদ্রোহ করে বসেছে এক এক সময়। মনের দিক দিয়েও মাঝে মাঝে একটা রিক্ততাবোধে অবসন্ন হয়ে

পড়েছি। এখানে কাজ করতে এসে সাধারণ শ্রমিক বা পার্টির সাধারণ কর্মীদের কাছে আন্তরিক শ্রদ্ধা পেয়েছি, কিন্তু নেতৃত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের আচরণে ব্যথিত হয়েছি। কখনও ভেবেছি হয়ত আমারই কোন ত্রুটির দরুণ তাঁদের সমালোচনা বা বাঁকা নজরের কারণ হয়ে পড়েছি। কিছুটা আমার দিক থেকে দোষ ছিল না তা নয়। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের উৎসাহে কখনও কখনও বুঝি কাজের ধারা খানিকটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়েছে। তবু সব মিলিয়ে যখন দেখি তখন বুঝি যে আমার জনপ্রিয়তা নেতৃত্বের মনে ঈর্ষাব সঞ্চার করেছে, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা তাদের দিক থেকে ত' কম নয়, বরং বেশি। কারুর তোয়াজ করে চলিনা সেটাই যেন অপরাধ। মনে পড়ে যায় ছাত্র জীবনের দিগুলিতে কালুদার (প্রয়াত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি) কাছে শোনা সেই কয়েকটি কথা "রাজনীতিতে আলোর দিকের পাশাপাশি কালো দিকটিও আছে। সে সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে পদে পদে অনেক ঠকতে হবে"। আমাদের আগের যুগের রাজনীতিতে কিছু কালো দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। সুদীর্ঘ বন্দী জীবনে সহকর্মী সহযোদ্ধা সহবন্দীদের মধ্যে দুটো দিকেরই দেখা পেয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে। যখন কমিউনিস্ট রাজনীতিতে প্রবেশ করি তখন ত' অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে নাবালক নই, তবু মনে ব্যথা লাগে বই কি? আগে ভেবেছি কালো দিকগুলি বুঝি পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিরই বিশেষত্ব, গণ আন্দোলনে তথা গণমুখী পার্টিতে এসবের অস্তিত্ব থাকলেও সেটা হবে তুলনা মূলক ভাবে নগণ্য। কিন্তু এখানেও যখন পেটি বুর্জোয়া রাজনীতির চরিত্রের কুশ্রী চেহারাটা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে তখন মনটা অবসাদে ভরে ওঠে। অবসাদের মুহূর্ত্তগুলিতে এমন কাউকে পাশে পেতে ইচ্ছা হয় যার কাছে অকপটে হৃদয়ের দুয়ার খুলে ধরতে পারি। চলার পথে এমন একজনকে পাশে পেতে চাই যে হবে ব্যথার ব্যথী, আনন্দের অংশীদার, বন্দীদশায় যার কথা কল্পনা করেছি সেই সহযাত্রিনী এবার মানস লোক থেকে কোন মানবীর

মধ্যে আত্ম প্রকাশ করুক এই কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠি।

এমনি টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে কেটে যায় প্রায় একটি বছর। ইতিমধ্যে ঘটে যায় অনেক যুগান্তকারী ঘটনা। দেশের ইতিহাসে ত' বটেই, পার্টির জীবনেও। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারত জন্ম নেয়। সেপ্টে-ম্বর মাসে কলকাতায় পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন। দেশ বিভাগের মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে। তখনও কমিউনিস্ট পার্টি ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্টেই একটি পার্টি রূপে কাজ চালিয়ে যাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে পার্টি কংগ্রেসে। সেপ্টেম্বর মাসে পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে সাময়িক ভাবে নির্বাচিত হল দুই বাংলার জন্য একটি মিলিত প্রাদেশিক কমিটি এবং যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার জন্য দুটি আঞ্চলিক কমিটি। দার্জ্জিলিং থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে স্থান পেলেন রতন লাল ব্রাহ্মণ আর পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটিতে যথাক্রমে সুশীল চাটার্জী, গণেশ লাল সুব্বা এবং আমি। প্রাদেশিক সম্মেলন থেকে পার্টি কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হলাম সুশীল চাটার্জী, গণেশ লাল সুব্বা এবং আমি। রতন লাল প্রাদেশিক কমিটির সভ্য হিসাবে পদাধিকার বলে প্রতিনিধি রূপে পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেবে। এই নির্বাচন নিয়েও নেতৃত্বের এক অংশের আচরণ মনকে ব্যথিত করে। ভাঙ্গা মন আর ভাঙ্গা স্বাস্থ্য নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে কাজ করা সম্ভব হবে না বলে প্রাদেশিক নেতাদের জানাই। তারা কলকাতায় চলে আসতে বলেন, যদি জেলা কমিটি অনুমতি দেয়, জেলা কমিটির অনুমতি নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। কিন্তু বেশীদিন সেখানে থাকা হয় না। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের তাৎপর্য নিয়ে পার্টি'র মধ্যে বিশদ ব্যাখ্যা এবং আলোচনার আগেই পশ্চিম বাংলায় ডাঃ বিধান রায়ের মন্ত্রীসভা কমিউনিস্ট পার্টি'কে বে আইনী ঘোষণা করে। কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায় নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ব্যাপক ভাবে ধরপাকড় শুরু হয়।

কলকাতায় তখন আমি বিশেষ পরিচিত নই বলে কোনমতে পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে যেতে পারি। কয়েকদিন আত্মগোপন করে বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে কাটাবার পর প্রাদেশিক কমিটির গোপন কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পেলাম যে আমাকে দার্জিলিং জেলার দায়িত্ব নিয়ে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

দার্জিলিং ফিরে সর্ব প্রথম চোখে পড়লো শহরে বা শহরের আশেপাশে কৃষক বস্তীতে আত্মগোপন করে থেকে বে আইনী পার্টি সংগঠণ পরিচালনা সম্ভব নয়। দার্জিলি, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি তিনটি শহরেই যারা কমিউনিস্টদের মধ্যে একটু মাতব্বর গোছের ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন তারা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুশীল চ্যাটার্জী, ভদ্রবাহাদুর হামাল গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন। হামাল চা-বাগানে ঐ আত্মগোপন অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ায়। শহরের উপরে আত্মগোপনকারী নেতার সদর দপ্তর বা গোপন যোগাযোগের সংগঠন যে ভাবে চলছে তাকে দুর্বল বলাই যথেষ্ট নয়। পার্বত্য অঞ্চলের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ অনভিজ্ঞ বলেই টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে। সাংগঠনিক দিকের কথা বাদ দিলে রাজনৈতিক দিকের অবস্থাও আমার চোখে আশাপ্রদ মনে হল না। শহরের উপরে পার্টির সাংগঠনিক প্রভাব বরাবরই দুর্ব্বল। মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত কর্মীর সংখ্যাও নগণ্য। পার্টি বে আইনী ঘোষিত হওয়া এবং বহু সংখ্যক নেতাদের গ্রেপ্তার তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। সমতল ভূমির স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশেষভাবে গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্য এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাদের মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যে উপায় নেওয়া হয়েছে সেটাও নেহাৎ ছেলেমানুষি। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির দাদারা যেমন ভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতির অতিরঞ্জিত ধারণা সৃষ্টির সাহায্যে তরুণদের উৎসাহিত করতেন ঠিক সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে মনগড়া অতিরঞ্জিত হিসেবের

ভূত প্রাদেশিক কমিটি তথা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মাথায় ছয় সাতমাস পরে চেপে বসেছিল তার ছায়া এখানে আগেই পড়েছে। যেসব চা-বাগানে পার্টি'র প্রভাব আছে সেখানে কর্মীদের খবর পাঠানো হয়েছে যে কোন এক শুভলগ্নে পার্বত্য অঞ্চলের একশো পাঁচটি বাগানের শ্রমিকেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে। পরে যখন আত্মগোপন অবস্থায় বাগানে বাগানে ঘুরেছি তখন দেখেছি যে শ্রমিকেরা তাদের সহজ বুদ্ধির জোরে উপরোক্ত প্রচারের হঠকারী সম্ভাবনাগুলিকে এড়িয়ে চলেছে। সেই কোন অনাগত দিনের অভ্যুত্থান সাপেক্ষে ছোটখাটো যে সব হঠকারী নির্দেশ সদর দপ্তর থেকে শ্রমিকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাতেও তারা বিশেষ সাড়া দেয়নি। দার্জিলিং শহরে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বার করার উদ্দেশ্যে বাগানে বাগানে খবর দেওয়া হয়েছিল শ্রমিকেরা যেন এসে জমায়েত হয়। কয়েকটি বাগানের অগ্রনী কর্মীদের দুইচার জন ছাড়া কেউই আসেনি। যারা এসেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য দেখে মিছিলের পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়। অথচ এই অভিজ্ঞতা থেকে সহজ যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় তাকে স্বীকৃতি জানাতে নেতৃত্বের প্রবল আপত্তি। হামাল বাগানে বাগানে ঘোরে। পরিস্থিতির সম্বন্ধে সে যে বিবরণ দেয় তাকে কিছুতেই সঠিক বলে মানা হবে না। দেখি এক ধরনের একগুয়ে জিদ বিচার বুদ্ধিকে গ্রাস করছে। মিছিলের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার পরে নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রস্তাব আসে চা-বাগানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিতে হবে। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিতে হলে "ছল-পাত্তির" জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তবু শুধু ঐ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অপরাধে আমি সংস্কারবাদী আখ্যা পেলাম। তখনও প্রাদেশিক নেতৃত্ব পার্টি'র সমস্ত স্তরের সংগঠন থেকে তথাকথিত "সংস্কারবাদী"দের বহিষ্কারের ডাক দেন নি বলেই অব্যাহতি পেলাম। তাছাড়া প্রাদেশিক নেতৃত্ব তখন পর্যন্ত এই জেলার ব্যাপারে আমার উপরই নির্ভর করছেন এবং

গোপন যোগাযোগের সূত্রগুলি দিয়েছেন আমারই হাতে। তবু বোঝা গেল রাজনৈতিক সংঘাত অনিবার্য। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠার সূচনা হল।

এহেন পরিস্থিতিতে দার্জিলিং শহরের প্রান্তে আত্মগোপন করে না থেকে চা-বাগানে যেয়ে একেবারে শ্রমিকদের ঘরে বাস করাই অনেক ফলপ্রসূ হবে। এতদিন প্রধানত যে এলাকায় কাটিয়েছি সেখানকার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সেইদিনগুলি মূল্যও ত'উপেক্ষার বিষয় নয়।

আমার প্রথম গোপন আস্তানা হল "ভন্‌জেঙ্গ" পাহাড়ের গায়ে একটি দরিদ্র পরিবারের কুটিরে। "ঘুম" এর বৌদ্ধ মঠটি যে টিলার উপরে অবস্থিত তার একটু নীচে, পায়ে চলার পথ বেয়ে ৪।৫ মিনিটের রাস্তা। পাহাড়ের ঢালুর কিছু অংশ সমতল করে কেটে কুটির ও সংলগ্ন আঙ্গিনা তৈরী হয়েছে। ওপাশে একটু নেমেই একজন স্বর্ণকারের কুটির। "ঘুম" থেকে পূর্তবিভাগের যে পথটি সুখিয়াপোখরি হয়ে নেপাল সীমানা পর্য্যন্ত গিয়েছে তার একটু উপরে। সেখান থেকে 'চোরবাটো' বা 'পাকদণ্ডি' ধরেও আসা যায়। এরা পেশায় 'কামী', অর্থাৎ কর্মকার। এককালে অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালই ছিল মনে হয়। কুটিরটি টিনের চাল, তক্তার বেড়া। দুটি কামরা, একটি অপেক্ষাকৃত বড়। বড়টির উত্তরদিকে কাঠের পার্টিশান দিয়ে দুটো ছোট ছোট খুপরি তৈরী করা হয়েছে, তারই একটিতে হয় আমার স্থান। একপাশে জানালা। জানালার ৭.৮ হাত পরে পাহাড়ের দেওয়াল। এখানে বেশ ঢালু। "ভনজেঙ্গ" শিখরে পাইন বন নজরে পড়ে, সামনের দিকে দৃষ্টির দিগন্ত অবারিত। দুপাশে পর্বত-শ্রেণীর দুই প্রায় সমান্তরাল বাহু সমতলভূমির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকে তাকালে মাঝে মাঝে হিলকার্ট রোডের সর্পিল আকার চোখে পড়ে। চেনা চোখে দিকচিহ্নগুলি ধরা দেয়। কার্শিয়ং শহরের উপকণ্ঠে "সেন্ট মেরী", "ডাউহিল", "গিদ্ধাপাহাড়", ডানদিকে

"ঈগলস্ ক্র্যাগ", "পাঙ্খাবাড়ী রোড"। ডানদিকে 'ধজ্জে' বাগান হয়ে মিরিক পর্য্যন্ত প্রসারিত পাহাড়ের বাহু। মাঝখানের উপত্যকার গভীর বন, বনের বুক চিরে "বালাসন" নদীর রূপোলী রেখা। সামনের দিকে তরাইয়ের নিবিড় অরণ্যের নীলিমা অনেকটা সাগরের মতোই দেখায়। "মহানন্দা" সমতলে নেমে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা রেখায়। কখনও কখনও "বাল্লাসন" উপত্যকা থেকে ঘন কুয়াশা এসে সবকিছু ঢেকে ফেলে।

পরিবারে বুড়ো বাবা, বুড়ী মা ছাড়া আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে, পুত্রবধূ, ছেলের ৭।৮ বছরের মেয়ে এবং বছর দুইয়ের একটি শিশু। কুটিরের কয়েকধাপ নীচে "সিঁড়িক্ষেতে" ফুলকপির চাষ করা হয়েছে। ছেলেটির নাম 'কে. পি.', হয়ত পুরো নাম কৃষ্ণপ্রসাদ হবে। নেপালীদের মধ্যে এই এক রেওয়াজ দেখেছি নামের ইংরাজীতে দুটি আদ্যঅক্ষর ধরে সংক্ষিপ্ত নামকরণ। যেমন, শেরবাহাদুর হল "এস. বি."। রেওয়াজটি প্রধানতঃ শহুরে; একটু আধটু শিক্ষিতদের মধ্যে বেশী প্রচলিত। প্রভাবটা অন্যের উপর পড়তে শুরু করেছে। "কে. পি." র জীবিকানির্বাহের উপায় মোষের খুরের জন্য লোহার নাল, এবং এই ধরণের লোহার টুকিটাকি জিনিষ তৈরী ও বিক্রী, দিন আনা দিন খাওয়া। আমার নিজের খরচ ছাড়াও গোটা পরিবারের খরচের কিছু অংশ বহনের দায়িত্ব নিতে হবে পার্টি'কে। মেয়েটির ডাকনাম 'কাঞ্ছি', অর্থাৎ ছোট মেয়ে। আসল নাম কি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না বড় একটা। আমার পরিচর্যার দায়িত্ব পড়ে কাঞ্ছিরই উপর। "কে. পি." করবে "কুরিয়ার", অর্থাৎ সংবাদ আদান প্রদান, তথা পত্রবাহকের কাজ। পরিবারের কর্তা বুড়োটি অশীতিপর বৃদ্ধ। চুলগুলো সবই কালো রয়ে গিয়েছে। দেহের গড়নে তেমন ভাঙ্গন আসে নি। তবে জীবিকার কাজে অক্ষম, দিলখোলা মানুষ, রাজনৈতিক চেতনা বলতে কিছুই নেই। কমিউনিষ্ট পার্টি' গরীবের পার্টি, গরীবদের জন্য লড়াই করে, এটুকু জেনেই একজন

আত্মগোপনকারী নেতাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে। 'কে পি পার্টি'র সভ্য না হলেও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে, পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। লালঝাণ্ডার সমর্থক হলেই সে কমিউনিষ্ট, নিজেকেও তাই মনে করে, আনুষ্ঠানিক-ভাবে পার্টি'র সভ্য কিনা তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। পার্টি'র বাইরের মানুষেরাও লালঝাণ্ডার সমর্থক মাত্রকেই কমিউনিষ্ট পার্টি'র লোকরূপে গণ্য করে। গৃহকর্ত্রী বুড়ী অন্য ধরণের, বেশ খিটখিটে স্বভাব। ছেলের বৌয়ের সঙ্গে সবসময় খিটিমিটি লেগেই আছে। গোটা ব্যাপারটা হয় একতরফা. বেচারী সারাদিন "ভনজেঙ্গ" চূড়ার বনে 'দাওরা' খুঁজতে, অর্থাৎ রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের টুকরো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে জোটে শ্বাশুড়ীর কটুভাষন। সাত আট বছর বয়সী নাতনীটির প্রতিও দরদ নেই। মেয়েটি মায়ের সঙ্গে ঘোরে, বুড়ীর স্নেহ শিশু নাতিটির জন্য জমা রয়েছে। মায়ের কাছে থেকে শিশুকে আলাদাই করে নিয়েছে, আমি এখানে থাকাকালীন নিজের বাবদ ছাড়াও তাদের খরচের একটা অংশ বহন করবো না জানলে আমার অবস্থানকে মোটেই সুনজরে দেখতনা। কাঞ্ছি আমাকে খাদ্য পরিবেশন ছাড়াও বিছানা ঝেড়ে দেয়। দরকার হলে দু-একটা জামা কাচে। অনেক সময় কাছে বসে গল্প করে, দুই-একদিন যেতে না যেতে লক্ষ্য করি সেদিকে বুড়ীর সন্দিগ্ধ শ্যেন দৃষ্টি, নিজেও যথেষ্ট সতর্ক হই। ভগ্নীসমা সরলা পাহাড়ী তরুণী, লেখাপড়া জানে না। আমাকে ঘরেরই একজন ভেবে স্বচ্ছন্দে মেশে। তবু সাবধান হয়ে চলা চাই। আত্মগোপনের জীবনে সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দী, রাত্রে বার হয়ে পার্টি'র কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক করি। ফিরতে রাত হয়, কাঞ্ছি জেগে বসে থাকে, দরজায় শব্দ শুনলে জানালা দিয়ে দেখে নিয়ে তবে খোলে। দিনের বেলা কর্মহীন অবকাশে শুধু পাইনবনচূড়া দেখে সময় কাটেনা। মেয়েটির সঙ্গে গল্প করি, আন্দোলন সম্বন্ধে বোঝাই, এহেন পরিস্থিতিতে

আত্মগোপনকারী কর্মীদের কারুর কারুর পদস্খলন হয়েছে শুনেছি। এখানে যদি সে সম্পর্কে কারুর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে, তবে পার্বত্য অঞ্চলে জনমানসে পার্টি'র ভাবমূর্তি মলিন হয়ে যাবে।

"ঘুম-সুখিয়াপোখরি" সড়কের নীচে একটি পাহাড়ে একটা কৃষক বস্তী আছে, পার্টি'র প্রভাব রয়েছে তাদের উপরে। "ভনজেঙ্গ" এবং "রংবুলে" কৃষকসভা ও সেইসঙ্গে "গাড়ীওয়ান ইউনিয়ন" (গাড়োয়ান ইউনিয়ন) গড়ে উঠেছিল ওয়াংদি লামার একনিষ্ঠ প্রয়াসে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট অংশে সিঁড়িক্ষেত পদ্ধতিতে এরা চাষ করে। ফসলের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, মূলা, কিছু পরিমানে আলু। সমতলে এগুলি শীতের মরসুমী ফসল। এখানে গ্রীষ্মে চাষ করা হয়। শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। তুষারপাতও হয় মাঝে মাঝে। সেই সময়টা এদের অনেকে মোষের গাড়ীতে ভারী ভারী মাল পরিবহনের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। রাতে আস্তানা ছেড়ে বার হয়ে এইসব বস্তীতে বৈঠক করি। "ভনজেঙ্গ" বস্তীতে প্রধান কর্মীর নাম ট্রাক মায়লা। রাজনৈতিক চেতনার স্তর সবারই খুব নীচু। তবে ট্রাক ময়লা জঙ্গী ক্যাডার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অন্যদের সে স্বাভাবিক নেতা। পার্টির প্রতি এদের আনুগত্য অবিচল। ট্রাক মায়লার ঘরে বৈঠক করতে গিয়ে কমরেডের প্রতি তার দরদী মনের পরিচয় পাই। কারুর ঘরে লোকজন এলে এরা সাধারণতঃ "ফীকাচিয়া", অর্থাৎ দুধ-বিহীন চা-পাতার ডাটিসিদ্ধ গরম জল পরিবেশন করে। ট্রাক মায়লার ঘরণী পিতলের গ্লাসে সবাইকে 'চিয়া' পরিবেশন করে গেল। আমার জন্য নির্দিষ্ট গ্লাসটি মায়লা নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে তবে আমাকে দেয়। না দেখেই চুমুক দিয়ে কারনটা বুঝতে পারি। আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা 'চিয়া নয়, এক গ্লাস গরম মোষের দুধ।

কে পি দের কুটিরে দুই একদিন আলু পাঠিয়েছিল তরকারী

রান্নার জন্য। অথচ আলু তখন এদের কথায় 'সুনদর', অর্থাৎ স্বর্ণমূল্য বা বহুমূল্য। রংবুলের বস্তী বেশ কয়েক মাইল দূরে পড়ে। যেদিন সেখানে যাই, ট্রাক মায়লা সঙ্গে যায়। শহরের বাইরের পথঘাট সন্ধ্যা হতে না হতে জনবিরল। ঘুম ষ্টেশনের আশেপাশে কিছুটা লোক চলাচল থাকলেও জোড়বাংলো থানা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর মানুষের দেখা মেলে না। অন্ধকারে নিঃশব্দে পথ চলি। কখনও তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে চাই। কখনও দূরে কার্শিয়ং শহরের দীপমালা চোখে পড়ে। আবার কখনও বর্ষার জলভরা ঘন কুয়াশা ভেদ করে এগোতে হয়। নৈশ অভিযানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করি। পাহাড়ের মানুষদের মধ্যেও ভূতের ভয় যথেষ্ট। হঠাৎ যদি অপরদিক থেকে আগত পথ চলতি লোকের সঙ্গে দেখা হয় দুপক্ষই থেমে গিয়ে কিছুটা দূরত্ব থাকতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। নামধাম জানা আসল উদ্দেশ্য নয়। কোন বস্তীর মানুষ কোথায় চলেছে তাই জানতে চায়। উত্তরদাতা মানুষ এবং একটা নির্দিষ্ট পরিচিত বস্তীর বাসিন্দা জেনে আশ্বস্ত হয়ে যে যার গন্তব্যস্থল অভি মুখে রওনা হয়।

শহরেরর বাইরে আত্মগোপনের জীবনে অনিবার্যভাবে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রকৃতির তাগিদে সাড়া দিতে আস্তানার বাইরে বেশ খানিকটা দূরে যেতে হবে। নেপালীদের রেওয়াজই বলি, সংস্কারই বলি, জলত্যাগের জন্যও ঘরের থেকে বেশ তফাতে যেতে হয়। ফলে কোনও অপরিচিত নবাগতের উপস্থিতি জানাজানি হতে দেরী হয় না। যে কুটিরে আছি, তার প্রাঙ্গনে খানিকটা দূরে ব্যবস্থা আছে। জায়গাটা ঢাকাও বটে, মাথার উপরে এবং তিনদিকে লতাগুল্মের আচ্ছাদন। কিন্তু যাতায়াতের পথটিতে কোনোও আবরণ নেই। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে চললেও এদের প্রাঙ্গনের ঠিক পরেই যে প্রতিবেশীটি আছে, তার নজরে একদিন না একদিন পড়তেই হবে। সুতরাং

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেউ কেউ কখনও সখনও বৌদ্ধ গুম্ফা (মঠ) টির সামনের সরু পথ ধরে যে কুটিরে আছি, তার পাশ দিয়ে ও-দিকে যায়। আর একটি বড়ো অসুবিধা স্নানের। নেপালীদের মধ্যে নিয়মিত স্নানের বালাই নেই। অনেকে গোটা শীত স্নান না করে কাটিয়ে দেয়। সকালে মুখ ধোয়ার সময় একটু সাবান লাগিয়ে 'প্রক্ষালন' করেই কাজ সমাধা হয়। গরমের দিনে সপ্তাহে একদিন স্নানের রেওয়াজ বিরল। এদের অভ্যাসটা জন্মগত। তাই বিশেষ অসুবিধা বোধ করে না। ঘন ফগের মধ্য দিয়ে চলার সময় মুখমণ্ডলের ত্বক খানিকটা আর্দ্রতালাভ করে। পর পর কয়েকদিন অস্নাত থাকার ফলে আমার ভিতরটা শুকিয়ে যায়। শুকনো কাশি জেঁকে বসে। এই শুকনো কাশি আত্মগোপনের জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই নিত্যসঙ্গী হয়েছিল। খক্‌খক্‌ কাশির শব্দ অনেকের শ্রুতিগোচর হত। যে আস্তানায় আছি, সেখানে বাইরের লোক গল্পগুজব বা অন্য উপলক্ষ্যে এলে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হত সেই দিকে। যেখানে প্রতিবেশী আছে সেখানে আরো বেশী। আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রীকে কৈফিয়ৎ দিতে হত। কেউ বলত, নেপাল থেকে দূরসম্পর্কের আত্মীয় এসেছে কেউ বলত, তরাই থেকে 'মামাকো ছোরা', অর্থাৎ মামার ছেলে এসেছে। এমনি কত কি! রং বুল বস্তীতে বৈঠক সেরে একদিন বেশ ভিজতে হলো প্রবল বর্ষনে। আস্তানায় ফিরে ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে মিঠা তেল (সরিষার তেল) গরম করে পায়ের তলায়, বুকে মালিশ করি। নাকে জল ঝরা সর্দি বা হাঁচির প্রকোপ থেকে রক্ষা পেলেও জ্বর হয়েছে বুঝতে পারি পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে। একজন চিকিৎসক কমরেডের কাছ থেকে সংগ্রহ করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওষুধ সবসময় সঙ্গে রাখি। যাতে অন্ততঃ ঠেকা কাজ চলে। সকালে চারটি খেয়েছি। ভাত খাবো না বলতে আর এক বিপত্তি। গ্রামের মানুষ বিশেষতঃ খেটে খাওয়া মানুষেরা জ্বরের

উপর ভাত না খেয়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না। ভাতের ব্যাপারে নেপালীরা ভেতো বাঙালীকে ছাড়িয়ে যায়। কাজেই ত' বটেই, বুড়ো-বুড়ী এসে সাধ্যসাধনা শুরু করে দেয়। তাদের ভাবটা যেন আমি অনশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেছি। বুড়ো বলে, "পরান রাখুনু হোস", অর্থাৎ প্রাণ রক্ষা করুন। কাকে বোঝাবো। শেষে বিরক্ত হয়ে ধমক দিই।

সুশীলদা রয়েছেন দার্জিলিং শহরের উত্তরতম প্রান্তে, বার্চহিলের সংলগ্ন একটি নির্জন বাড়ীতে। মাঝে মাঝে বে-আইনী জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভা উপলক্ষ্যে সেখানে যেতে হয়। রাত্রের অন্ধকারে ছয়-সাত মাইল পথ অতিক্রণ করে সভাশেষে আবার অতটাই হাঁটতে হয়। পরিশ্রমেব জন্য নয়, মনঃমাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মতান্তব থেকে মনান্তরের দরুন। শহরে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বার করা হবে বলে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা ভুল প্রমান হওয়া সত্বেও সঠিক শিক্ষা নেওয়া হয়নি। দোষ চাপানো হলো ভদ্রবাহাদুর হামালের উপরে। সে নাকি ভালভাবে শ্রমিকদের বোঝাতে পাবেনি। বিপ্লবের রোম্যান্টিক স্বপ্ন থেকে আমিও একেবারে মুক্ত ছিলাম না। কিন্তু ১৯৩০-৩২ সালের পেটি বুর্জোয়া বিপ্লব আন্দোলনের সময়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল, তা আমাকে মাটির কাছাকাছি থাকতে সাহায্য করেছে। স্বপ্নচারণের পাখায় ভর করে উড়ে যাইনি।

গোপন সংগঠনের কাজের পদ্ধতি নিয়েও মতভেদ হয়। সুশীলদার মধ্যে কর্মীদের মনে চমকসৃষ্টির উপর ঝোঁকটা বেশী। গোপন সংগঠন, ফেরারীদের আশ্রয়স্থান, এবং "কুরিয়ার", ইত্যাদি ব্যবস্থা যেভাবে কয়া হয়েছে তা খুবই ভঙ্গুর। পার্বত্য অঞ্চলের গোয়েন্দা বিভাগের এইদিকে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই বছর খানেক টিঁকে থাকতে পেরেছেন। ভনজেঙ্গ, রংবুল অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে পার্টি 'সেল' গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল জেলা কমিটিতে। কার্যত দেখা গেল'

সেটা অবাস্তব, কৃষকসভার কর্মীদের মধ্যে পার্টিসভ্য, এবং সমর্থক, বা গণসংগঠনের সভ্যের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য চেতনাও নেই। রাজনৈতিক জ্ঞানের স্তরবিচারে যাদের পার্টিসভ্যপদ দেওয়া হয়েছে, এবং যাদের দেওয়া হয় নি, তাদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। উপরন্তু, এদের মধ্যে উপজাতিসুলভ অনেক ধারনা প্রচলিত। পার্টি সভ্যদের জন্য সভা ডাকা হয়েছে। কোনও একজন আসতে পারে নি, সে তার ভাই, বা ছেলে বা পরিবারের কোনও সদস্যকে প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছে। এমনকি, হয়ত লালঝাণ্ডার সমর্থক বলে পরিচিত কোনও প্রতিবেশীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এহেন শৈথিল্যের দরুণ নৈশ বৈঠকগুলিতে পুলিশের গুপ্তচরের উপস্থিতি খুব সহজ। কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপারটি টের পাওয়া গেল।

যে কুটিরে আছি তার আঙ্গিনা দিয়ে মাঝে মাঝে অপরিচিত মানুষকে চলতে দেখা যায়। খুব বেশী না হলেও এই ধরনের গতিবিধি 'কাঞ্ছি'র নজরেও পড়েছে। এখান থেকে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারি। যাওয়ার কথা ভাবছিলাম আরো একটি কারণে। বুড়ো বুড়ী বোধহয় আশা করে তাদের নিয়মিত ভরনপোষনের খরচটাও পার্টি দেবে। অল্প পরিমানে দেওয়া হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট নয়। মাঝে মাঝেই 'কাঞ্ছি' এসে বলে, "আজ তিমি লাই ভোকো বসনু পরছ"— অর্থাৎ, আজ তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে"। রেশন আনার টাকা নেই। আমার কাছে থাকলে দিয়ে দিই, এমনও ঘটেছে যখন দুই— একদিন ভাত ও শাক দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে। শাক বলাটা সঠিক হবে না। পাহাড়ের গায়ে এক ধরণের ছোট ছোট ঝোপের মত হয়, দেখতে অনেকটা বিছুটি পাতার মত। অবশ্য বিছুটি নয়। নেপালীরা বলে "শিষনো"। ওদের মধ্যে প্রবচন আছে, আর কিছু না জোটে, "শিষনো টিপেরা খানছু"—অর্থাৎ, বরাতে আর কিছু না জুটুক, শিষনো পাতা খেয়েই থাকবো, সব চেয়ে বড়ো কথা অনুভব করি, এভাবে থেকে লাভ কি? বরং যেসব চা-বাগানে আমাদের

মজবুত সংগঠন আছে, সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের ঘরে থাকা ভাল। সেই উদ্দেশ্যে 'দাওয়া সুরুওয়াল'বা নেপালী কুর্তা ও পা চেপা পায়জামা সংগ্রহ করেছি। একজন পার্টি সমর্থক দরজী বানিয়ে দিয়েছে। সুশীলদাও প্রস্তাবটা নানাদিক ভেবে সমর্থন করেন। যেখানে যাবো সেখানকার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের আগে খবর পাঠিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকদিন সময় যাবে। ইতিমধ্যে একদিন ঘটনাচক্রে 'কেপি', তথা 'কাঞ্ছি'দের আশ্রয় ছেড়ে বিনা প্রস্তুতিতে দিনদুপুরে বেরিয়ে পড়তে হল। প্রতিবেশী সোনারের (স্বর্ণকারের) ছেলেটি নাকি কোনওদিন এপথ মাড়ায় নি। 'কামী' বা কর্মকারদের প্রতি তারা উন্নাসিক মনোভাব পোষন করে। 'কামী'রা নেপালীভাষী সমাজে প্রায় অস্পৃশ্য, বামুন, ছেত্রী দূরে থাকুক, রাই লিম্বু, তামাং দের ঘরের ভিতরে প্রবেশের অধিকার নেই। সেই স্বর্ণকারনন্দন হঠাৎ একটি মরচেধরা তরোয়াল শান দেওয়ার অজুহাতে 'কেপি'র খোঁজে এসে হাজির। 'কেপি' সে সময় অনুপস্থিত, নতুবা হয়ত কথা বলার ছলে কুটিরের ভিতর ঢুকে পড়ত। স্বর্ণকারনন্দন চলে যাওয়ার পর ঠিক করে ফেলি, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। কেপি এসে পড়ায় তাকে পাঠানো হল ট্রাক মায়লার কাছে, ফুলপ্যান্ট সার্টের উপর একটা ফেল্টহ্যাট চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। কাঞ্ছির বাবা সঙ্গে যাবে, পথে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, 'বাগডোগরা থেকে মামার ছেলে এসেছিল। আবার বাগডোগরায় ফিরে যাবে, ট্রাকমায়লার কুটিরের একটু নীচে একজন তামাং গাড়োয়ানের কুটিরে সাময়িক আস্তানা হল। রাত্রে ওখান থেকে অন্যত্র যেতে হবে। যে পর্য্যন্ত চা-বাগান থেকে খবর নিয়ে লোক না আসে, যাযাবরের জীবন যাপন করতে, অর্থাৎ প্রত্যেক দিন আস্তানা বদলাতে হবে। গত কয়েক বৎসরে এত পরিচিত হয়েছি যে ছদ্মবেশেও দিনের বেলায় রাস্তায় বার হওয়া সম্ভব নয়। সুশীলদার একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দরুন ছদ্মবেশে তাঁর চেহারা পালটে যেত। আমার সে সুবিধা ছিল না। শহরের যে অঞ্চলে

আমাদের সমর্থকদের বাস সেখানে পাশাপাশি ঘরবাড়ী ঘন সন্নিবিষ্ট, কোনও বাড়ীতে অতিথির উপস্থিতি কিছুক্ষনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে যায়। অতএব দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে, এমনকি বারান্দায় আসা চলে না। অতিথিটি কে চিনতে দেরী হবে না, মানুষটি যদি সারাদিনে একবারও ঘরের বাইরে না আসে তাহলে সকলের কৌতুহলের উদ্রেক করে। কেউ কেউ সন্দেহ করাটাও বিচিত্র নয়, উপরন্তু এক নতুন উপসর্গ আমাকে ভর করেছে, একটানা বেশ কিছুদিন স্নান না করার ফলে শুকনো কাশি পেয়ে বসেছে। পাহাড়ের আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা জলে স্নান কখনোই সহ্য করতে পারি নি। বে-আইনী জমানার আগের দিনগুলিতে 'কমিউনে' দু-তিন দিন পরেই গরম জলে স্নান করে নিতাম। পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে রোজ স্নান করার রেওয়াজ নেই। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একদিন, বা দুসপ্তাহ বাদে একদিন। শীতের কয়েকমাস স্নানের বালাই নেই, সকালে গরমজলে হাতমুখ ধোওয়ার সময় মুখে একটু সাবান বুলিয়ে নেয়। পলাতক জীবনে যে সব বাসায় আশ্রয় মেলে সেখানে গরম জল দূরের কথা, ঠাণ্ডা জলেও স্নানের ব্যবস্থা নেই। শুকনো কাশির দমক যখন ওঠে, তখন তা আমার উপস্থিতি আশেপাশের মানুষদের জানিয়ে দেয়। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীকে নানারকম কৈফিয়ৎ তৈরী করতে হয়। অতএব প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর নতুন আশ্রয়ে যেতে হয়। দার্জিলিং শহরে কলকাতার বিত্তবান ব্যক্তিদের বেশ কিছুসংখ্যক বাড়ী আছে, সেগুলি বছরের বেশীর ভাগ সময়েই খালি পড়ে থাকে, তদারকি করে একজন 'কেয়ারটেকার' এবং পাহারা দেয় চৌকিদার। খানিকটা রতনলাল ব্রাহ্মনের ব্যক্তিগত প্রভাবে, এবং খানিকটা 'গরীবের পার্টির' প্রতি দরদ থাকায় এইসব চৌকিদারদের মধ্যে কয়েকজন ঐরকম খালি বাড়ীর একটি ঘরে সাময়িক আস্তানার ব্যবস্থা করে দেয়। তাতেও ঝুঁকি আছে, এমনি সব কারণে যত তাড়াতাড়ি চা-বাগানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যায়, সেজন্য দিন গুনতে থাকি।

ইতিমধ্যে খবর আসে 'জোড়বাংলো' কৃষক বস্তী থেকে ভদ্রবাহাদুর হামাল গ্রেপ্তার হয়েছে, গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে তখনই ভালরকম খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় আমরা কেউই এই ব্যাপারটিকে ততটা গুরুত্ব দিই নি। দিলে হয়তো বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হত।

অবশেষে খবর এলো শিবটার বাগানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শিবটার বাগান থেকে চা-বাগান পরিক্রমার যে অধ্যায় শুরু হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে ফুলবাড়ী চা-বাগানে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারে। এই সময়টুকুর মধ্যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠেছে অজস্র সম্পদে। প্রতি পদক্ষেপে যেমন রহস্য রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছি, পার্বত্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের ছোঁয়ায় মনে কাব্যিক অনুভূতি জেগেছে। চড়াই উৎরাই ভেঙে দুর্গম পথ চলার পরিশ্রমে এক এক সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনেক ঘটনায় অ্যাডভেঞ্চারের আমেজটুকু পুরোমাত্রায় উপভোগ করেছি। সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে এক পরম পাওয়ার আনন্দ, সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা মানবতার মহিমা মনকে অভিভূত করেছে, এতগুলি বছরের ব্যবধানেও তার স্পর্শ অন্তরের মনিকোঠায় তেমনি সজীব হয়ে আছে। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তাই যদি সেদিনের আবেগ মাঝে মাঝে লেখনীর মুখে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে ঠেকিয়ে রাখবো কোন্ অধিকারে?

দমন নীতির প্রথম আঘাতে চা-শ্রমিকদের আন্দোলন প্রথমটা থমকে গিয়েছিল। কেননা এ ধরণের অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম। শিশু আন্দোলন পরিচিত নেতাদের সামনে না দেখে সাময়িকভাবে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের অগ্র বাহিনী অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়, কাজও শুরু করে। কিন্তু এবার কাজ শুরু করতে হয় সম্পূর্ণ বে-আইনী অবস্থার মধ্যে। একে তো চা-বাগানগুলিতে আইন সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার মালিক ও সরকার পক্ষ কার্যত কোনদিনই স্বীকার করেনি। ইউনিয়ন

কর্মীদের নানা অছিলায় বাগান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। শ্রমিকেরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে মালিকপক্ষ লক-আউট ঘোষনা করেছে। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিনা বিচারে আটক আইন এবং শহরে ১৪৪ ধারা। এবারকার পরিস্থিতিতে চা-শ্রমিকদের প্রানশক্তির পরিচয় পাই অন্যভাবে, অর্থাৎ গনসমাবেশ ও বিক্ষোভে নয়, পাই দমননীতির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নীরব সংগঠনের কাজে। আর পাই শত বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও চা-শ্রমিকরা নেতার নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ায়—গোপনে বাগান থেকে বাগানে ঘোরার বন্দোবস্তে। এতদিন শুধু দেখে এসেছি সাগরের বুকের উপরে অশান্ত উচ্ছ্বাস, আর এবার সেই বুকের ভিতর প্রবেশ করছি। দেখেছি যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরির পাশাপাশি রয়েছে সহযাত্রীর জন্য স্নেহের শান্ত স্নিগ্ধ প্রস্রবন। দেখেছি অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রমিকের কুটিরে আমার জন্য সঞ্চিত রয়েছে মা-বোনের অফুরন্ত স্নেহ, ভাইয়ের এবং সহকর্মীর আন্তরিক দরদ। তারা সেই দরদকে সাজিয়ে গুছিয়ে মধুস্রাবী কথায় প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু অতি তুচ্ছ কাজে, নেহাৎ ছোটোখাটো ঘটনায় তার অনিবচনীয় অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছি।

প্রতীক্ষার দিনগুলিতে অবশ্য এই মহান দিকটি হিসেবের মধ্যে আসে নি, বরং অন্য প্রশ্ন সামনে এসেছে। জেলা নেতৃত্বের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আর এক অভিজ্ঞতা হলো এই যাত্রায়। শিবটার চা-বাগানে পার্টির প্রভাব খুব বেশী নয়, এখানে শ্রমিক সংখ্যাও খুব কম। দার্জিলিং থেকে বেশ দূরে, কার্শিয়ং ছাড়িয়ে শিলিগুড়ির পথে মহানদী ষ্টেশন। পাগলাঝোরা এখানে উপত্যকায় নেমে নাম নিয়েছে মহানদী, তরাইতে পৌঁছে নাম হয়েছে মহানন্দা। মহানদী ষ্টেশন থেকে উৎরাই পথে শিবখোলা নদী পার হয়ে তবে শিবটার। কার্শিয়ং শহরে শচীন সিন্‌হা পার্টি সভ্য। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর প্রথমবার জেলায় যেসব নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি

ছিলেন তাদের অন্যতম। মাস তিনেক পরে অবশ্য সবাই ছাড়া পান। পরে তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তবে শচীন সিন্‌হা প্রভৃতি কয়েকজন রেহাই পান। তিনি ছিলেন একটি জীবনবীমা কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি। যে বাসাটিতে থাকতেন সেটি ঐ জীবনবীমা কোম্পানীরই সম্পত্তি। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার আগে কার্শিয়ং শহরে এলে ঐ বাড়িটিই হত আমাদের আশ্রয়স্থল। শচীনবাবু হলেন স্বনামধন্য কমিউনিষ্ট নেতা মনি সিংয়ের ছোটভাই। বে-আইনী অবস্থায় পার্টির কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে। মানুষটি চিহ্নিত, বাড়ীটিও চিহ্নিত। তবু উপায়ান্তর না থাকায় দার্জিলিং থেকে শিবটার যাওয়ার পথে প্রথম রাত্রিটি এখানেই আশ্রয় নিতে হয়। ঝুঁকি আছে জেনেও শচীনবাবুর দিক থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি হয় নি। কিন্তু তাঁর গৃহিনী সম্বন্ধে ঠিক সে কথা বলা চলে না।

পরদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এলে শিবটারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সঙ্গে রয়েছে সিঙ্গেল চা-বাগানের পার্টিসভ্য তথা জঙ্গী নেতা টি· বি· ছেত্রী। ছেত্রী মাষ্টার নামে পরিচিত। আত্মগোপনের জীবনে আমি 'হিমাদ্রি' নামটি বেছে নিয়েছিলাম, গোপন চিঠিপত্রে এই নামটিই ব্যবহৃত হত। চা-বাগানের জীবনের পক্ষে সেটি খুব মানানসই হবে না বলে নতুন একটি নাম গ্রহণ করি 'বিক্রম প্রধান'। বিক্রম নামটি নেপালীভাষীদের মধ্যে খুব প্রচলিত। প্রধান পদবী ব্যবহার করে নেওয়ারেরা। নেপালীভাষী সহকর্মীদের অনেকে বলে, "দাওরাস্থরু আল"। এবং নেপালী টুপিতে সজ্জিত হলে আমাকে নেওয়ার বলে মনে হয়। মহানদী ষ্টেশন ছাড়িয়ে হিলকার্ট রোড ধরে শিলিগুড়ির দিকে রওনা হলে একটু বাঁয়ে নেমে গিয়েছে শিবটারের উৎরাই পথ। হিলকার্টরোডের উপরে একটি ছোট চায়ের দোকান। একজন নেপালী রমনী তার মালিক। দুই একজন খেটে-খাওয়া মানুষ চা-পানে রত। মাষ্টার বলে, 'এখানে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

নেপালী বেশে ও নামে আপনাকে অন্যেরা কিভাবে গ্রহণ করে, তা ও যাচাই করে নেওয়া যাবে"। দেখা গেল, প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উৎরে গেলাম। আমার উপস্থিতি ও চালচলন কারুর চোখেই কোনভাবে অস্বাভাবিক মনে হল না।

কিছু দূর নামার পরই পাহাড়ী পথের ধরণ শুরু হল। আরও খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর পথ এগিয়ে চলে ঘন বনের মধ্য দিয়ে। আকাশে মেঘমুক্ত চাঁদ জ্যোৎস্নার দাক্ষিণ্য ছড়ায়। সঙ্গী পথের উপর এক জায়গায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিতাবাঘের পায়ের দাগ, খানিক আগেই এই রাস্তা ধরে চলে গেছে।

পাহাড়ীরা মহানন্দাকেই বলে মহানদী। ছেলেবেলা থেকে সাধ ছিল যে একদিন মহনন্দার উজান বেয়ে তার উৎসের সন্ধানে যাবো। উৎস না হলেও এই জায়গাটায় হিমালয়ের বিদ্রোহী সন্তান পাগলাঝোরা উপত্যকায় নেমে গিরিনদীতে পরিণত হয়েছে। পথের দিশা খুঁজে পাওয়ার ফলে বুঝি এখানে পৌঁছে তার ক্ষ্যাপামি কিছুটা কম হয়েছে। নদী এখানে স্বল্প পরিসর, তবু বর্ষায় দুরন্ত হয়ে ওঠে। গত বর্ষায় উপরের জীর্ণ পুল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নদী পার হয়ে পথ যে সব বাগানে গেছে। তার মালিকেরা পুল মেরামতের প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ ম্যানেজার মহাশয়েরা শহরে যান অন্য পথে, জীপে বা ঘোড়ায়। সুতরাং গরীব কুলিদের পক্ষে নদী পার হতে কষ্টের সীমা থাকে না। পাহাড় বেয়ে অনেকটা নীচে নেমে জল পার হয়ে তবে আবার ওপারের খাড়া দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে হয়। এসব জায়গায় পথের দুর্গমতা শুধু কথার কথা নয়। একস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তা উপলব্ধি করে।

যখন গ্রামে পৌঁছলাম তখন রাত গভীর হয়ে গেছে। যশমান রাইয়ের প্রকৃত নমে শিরধোজ রাই। ঘরে যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তারা ঘুমে ঢুলে মাটির উপর কাত হয়ে পড়েছে। গ্রাম না

বলাই ভালো। পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পরস্পরের থেকে বেশ দূরে দূরে খান দশ-বারো কুটির, কোনটা উপরে, কোনটা নীচে। কুটিরগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া, কোনটার দেয়াল মাটির, কোনটাতে শুধু বাঁশের বাতা ঘেরা। ডাকাডাকিতে ঘরের মালিক ধড়মড় করে জেগে ওঠে, বসার জন্যে ছোট ছোট কাঠের পিঁড়ি এগিয়ে দেয়। ঘরে অতিথি এলে চা দেওয়া এদের নিয়ম, তা সময় যাই হোক না কেন। ঘরের মাঝখানে উনুন, তার উপর ছোট কড়াইতে জল চাপানো থাকে। নীচে দু-একখানা কাঠকয়লার আগুন যতক্ষন জ্বলে জলকে গরম রাখে। অতিথি এলে ফের আগুন জ্বেলে ঐ জলে 'ফীকা চা' তৈরী হয়। চা-পাতার বদলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এদের চা-পাতার ডাঁটি সিদ্ধ করে চায়ের তৃষ্ণা মেটাতে হয়। চ-পানের পর ঠিক হলো, আগামী সন্ধ্যায় বৈঠক বসবে। তারপর ঐ উনুনের চারপাশে মাটির মেজের উপর চট বিছিয়ে সবাই শুয়ে পড়ি, এই জায়গাটার উচ্চতা খুব বেশী নয়। আর এসেছিও কয়েকদিনের কুয়াশাচ্ছন্ন কার্শিয়ং ছেড়ে। তাই শীত লাগেনা, বরং গরম বোধ হয়। ভোর না হতেই সবাই উঠে পড়ে। দুপুরে ছুটির সময় চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে জলযোগের জন্য ঘরে ফেরা খুব কষ্টকর। তাই মেয়েরা কাপড়ের পুঁটলিতে ভাত বেঁধে নেয়। শুকনো ভাত, সঙ্গে আনুসঙ্গিক কিছু নেই। এবেলাই তো দেখছি, আনুসঙ্গিক বলতে শুধু শাকপাতার ঝোল। তবু অতিথি কমরেডের জন্য কোথা থেকে কিছুটা দুধ জোগাড় করতে ভোলেনি। সবাই কাজে চলে গেলে দরজা দিয়ে বন্ধ ঘরে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বস্তীতে বস্তীতে বাগানের চৌকিদার ঘোরে। নতুন লোক দেখলে সে তখনই যথাস্থানে খবর পৌছে দেবে। ঘরের বেড়া বাঁশের বাতা চিরে বানানো, তার উপরে মাটি লেপা। কোথাও মাটি খসে একটু ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। জানালা থাকে না এদের ঘরে। সেই ফাঁকটুকু দিয়েই বাইরের দিকে চেয়ে থাকি। সামনে পাহাড়ের চূড়ায় বর্ষার কালো

মেঘপুঞ্জের সমাবেশ হচ্ছে। রৌদ্রছায়ার খেলা চলে। যেদিকে মেঘ জমেছে সেখানে ছায়া, আর পাহাড়ের যে অংশে মেঘ নেই, সেখানে প্রখর রৌদ্র। বনের মধ্যে ঐ অনেক উপরে জলপং বস্তির ঘরগুলি দেখা যায়।

হঠাৎ খবর এল এই ঘর তল্লাসী করতে পুলিশ আসছে। এখানে নাকি তারা পলাতক কমিউনিষ্টের সন্ধান পেয়েছে। খবর পেয়ে গৃহস্বাম কাজ ফেলে বনজঙ্গলের পথ ধরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। কমরেডের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্য লাগে। গভীর রাতের অন্ধকারে বাগানে ঢুকেছি। এখানেও এ পর্য্যন্ত কোনও সভা বা বৈঠক করিনি। তবে পুলিশ খবর পাবে কি করে? কিন্তু শ্রমিক কমরেডদের একান্ত অনুরোধে তখনকার মতো সেইঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হল। গ্রামের শেষ প্রান্তে বুড়ো লিম্বুর ঘর। যেখানে ছিলাম তা থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। সেইখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হলো। আশ্রয়ে পৌছনোর কয়েক মুহুর্তের মধ্যে পুলিশ এসে যশমান রাইয়ের ঘর ঘিরে ফেলে।

নিশ্চয়ই খবরটা ভিতর থেকে ফাঁস হয়েছে। কে করতে পারে? সব কিছু বিচার করে একজনের কথা মনে পড়ে। আমাকে কার্শিয়ং এ পৌছে দিয়েছিল ভীমদল তামাং। শিবটারে যাবো সে কথাও জানে। ভীমদল একজন ভাল জঙ্গী কর্মী, বুদ্ধিমান, চটপটে, সাহসী। আন্দোলনের গোড়ার দিকে অনেক কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করেছে। তবু তার অতীতের একটা অন্ধকারময় দিক আছে। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে পার্টিসভ্য করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশও তো সেই দুর্বলতার কথা জানে। তার সুযোগ নিয়ে ভীমদলকে চরের কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা বিচিত্র নয়। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না হলে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তও করা যাচ্ছে না।

বুড়ো লিম্বু সেইমাত্র মঙ্গল থেকে ফিরল। বয়স আশীর উপর হয়ে গেছে। পাহাড়ীদের মধ্যে দেখেছি ৬০।৭০ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও চুলপাকা বা বার্ধক্যের অন্যান্য লক্ষন তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। বুড়ো কপালে গালে চামড়া কুঞ্চিত, চুলও বেশ সাদা। তাই মনে হয় সে আজকার লোক নয়। সে এখন আর কাজে যায় না। যায় তার দুটি মা-হারা মেয়ে ও একটি কিশোর ছেলে। বুড়ো তাদের প্রথামত জঙ্গলে পুর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে গিয়েছিল। শ্রাদ্ধের উৎসর্গীকৃত খিচুড়ি সঙ্গে নিযে ফিবছে। খিচুড়ি অর্থে ডাল, চাল ও মুরগীর মাংস একসঙ্গে সিদ্ধ করা। ঘি মশলা কোথায় পাবে যে দেবে?

গ্রামে হঠাৎ পুলিশেব আবির্ভাবে সবাই হকচকিয়ে গেছে। বুড়ো মানুষের পক্ষে তা আবও স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন পুলিশের অন্বেষণের বিষয়বস্তুটি তার ঘরে উপস্থিত। তবু অতিথির নিরাপত্তা এবং তাদের যত্নের জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। বালিকা মেয়ে দুটি সবে কাজ থেকে ফিরেছে। তাদের একজনকে বারান্দায় পাহারা দাঁড় কবিয়ে বুড়ো অতিথিকে শ্রাদ্ধের খিচুড়ি খেতে দেয়, আর আপনমনে অনর্গল বকে চলে। বকে চলে নিজের স্মৃতিকথা—তার শ্রমিক জীবন কিরকম দুর্দশার মধ্য দিয়ে কেটেছে সেই সব কথা বলে। আজ তবু শ্রমিকেরা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। একতার হাতিয়ারকে আশ্রয় করে। কিন্তু সেদিন সামান্য অভিযোগ জানাতে গেলে সাহেবের সবুট লাথি বা চাবুকের আঘাত খেয়ে ফিরতে হত ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে পুলিশ অন্যপথ ধরে চলে যায়। শ্রমিকেরা কায়দা কৌশল করে তাদের বুঝিয়ে দেয় যে একজন অচেনা লোক পাশের বাগানে ঢুকেছে বলে শোনা গেছে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে বুড়োর ছেলে ফিরে আসে। মেয়েরা রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়। একজন যায় তামার কলসী বয়ে জল আনতে। অন্যটি ঘরের ভিতর

মাচায় স্তুপকৃত করে রাখা জ্বালানি কাঠ থেকে কিছু বেছে নিয়ে কুকরী দিয়ে চিরতে শুরু করে। ঘরের ভিতরটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মাঝখানে মাচান, মাচানের নীচে উনুন। দুপাশের জায়গাটুকুতে একজন লোক কোনমতে শুতে পারে। কেরোসিন টিনের টুকরো জোড়া দিয়ে ঘরের চাল তৈরী—দুপুরের রোদে খুব গরম হয়ে উঠেছে। এই জায়গাটার উচ্চতা ২।৩ হাজার ফুটের বেশী হবে না। তাই গরম প্রায় সমতলের মতই মনে হয়। আবার বর্ষার ধারা নামলে টিনের চাল ফুটো হয়ে ঘরের মেঝেতে প্লাবন খেলে। বুড়ো লিম্বু দুঃখ করে বলে যে শ্রমিকদের দেখার কেউ নেই। এই সংগঠনও তেমন জোরদার নয়। গত পুজার সময় শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে সস্তা দরে সাড়ে তিন সের চালের বদলে চার সের চাল এবং পুজার বক্‌শিস্ দাবি করেছিল বলে কর্তৃপক্ষ তিনমাস ধরে পাঁচখানি বাগানে লক্-আউট করে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় শ্রমিকদের নীচের বস্তিতে জড়ো হওয়ার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার আর অতি সঙ্কীর্ণ উচুঁ নীচু পায়ে চলার পথ। তবু টর্চ জ্বালা চলবে না। সঙ্গীরা বলে, কি জানি, ও পারের পাহাড়ে যদি পুলিশের চর কোথাও লুকিয়ে বসে থাকে। তাহলে তারা টর্চের বা মশালের আলো দেখলেই টের পাবে যে এখানে অসাধারণ কিছু হচ্ছে। বুড়ো লিম্বু উনুন থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ তুলে নেয়। রাতে গ্রামের মধ্যে চলাফেরা করার সময় এই ভাবেই তারা আঁধারে পথ ঠিক করে। পথের উপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ক্ষীণ আভায় যতটুকু দেখা যায়, তার উপর ভরসা করে এক পা এক পা করে নীচে নামি।

যে ঘরে বৈঠক বসেছে সেখানে পৌঁছে দেখি যে শ্রমিকেরা নিরাপত্তার জন্য যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করেছে। গ্রামের প্রবেশ ও নির্গমন পথগুলিতে পাঠিয়েছে সতর্ক প্রহরী। সন্দেহ জনক লোকের গতিবিধি দেখলে সংকেতধ্বনি করবে। এখানে আন্দোলন ও সংগঠন

খুব দুর্বল বলে আলোচনা প্রধানত: মজুরের দৈনন্দিন দাবী দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও আমার অনুভূতি জুড়ে বাজতে থাকে একটা বৃহৎ সম্ভাবনার সুর। যে পরিবেশে বৈঠক হচ্ছে তার একটা অসাধারণত্ব আছে। বাইরে সতর্ক পাহারা, ভিতরের লোকদের মধ্যে ২।১ জন মাঝে মাঝে বাইরে থেকে খোঁজে নিয়ে আসছে যে কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কিনা। শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সহজ বুদ্ধির সাহায্যে সবকিছু করেছে। তাদের কিছু বলতে হয়নি, বলিওনি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

ঘরের মধ্যে কেরোসিনের কুপি অজস্র ধূম উদ্গীরণ করছে। মাটির দেওয়ালে ছায়ার খেলা। শ্রোতাদের মনেও নতুনত্ব আর উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে। ষোলো বছরের ছেলে জঙ্গবাহাদুর আমার কাছ ঘেঁষে বসে একমনে কথা শোনে। আজ ওর দিনগুলি কেটে চলেছে দশ আনা পয়সার বিনিময়ে এক দেড়মন মোট মাথায় করে চড়াই উৎরাই বেয়ে। কিন্তু হয়তো ওর সামনে পড়ে আছে নতুন সম্ভাবনায় ভরা এক অজানা জীবন। আজকার এই সন্ধ্যায় হয়তো তারই সূচনা হলো।

'কম্‌রেড্' এর নিরাপত্তার জন্য নেপালী চা-শ্রমিকদের এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত সাবধানতার পরিচয় আরও বহুবার পেয়েছি। তারা মনে করে যে 'কম্‌রেড' তাদের বাঁচার দাবির আন্দোলনে পথ দেখাবে, তাই সে তাদের কাছে নিকট আত্মীয়ের চেয়েও প্রিয়। তাই তাকে রক্ষা করার জন্য বিপদ ও অত্যাচারের পরোয়া না করে বারবার এগিয়ে এসেছে। তারা বেশী কথা বলতে জানে না, মনের ভাবকে সবসময় ভাষায় প্রকাশ করে না। কিন্তু দুঃখ আর বিপদের কষ্টিপাথরে তাদের মনের কথা বার বার যাচাই হয়েছে। ছোট-বড় কাজে তাদের 'না বলা বাণী' মুখর হয়ে উঠেছে। সে বাণীর সুরে মন্দ্রিত হয়েছে আমার হৃদয়বীনার সমস্ত তারগুলি। তাই আজ ঠিক সেদিনের মতোই জীবন্ত ও অম্লান ভাবে মনের পটে ফুটে ওঠে 'সিঙ্গেল' বাগানের ঘটনাগুলি।

কিছুদিন আগে এখানে একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘট হয়েছিল ধর্মঘটের দিন কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ ডেকে আনে। কিন্তু একদিকে শ্রমিকদের ঐক্য, অন্যদিকে নেপালী শ্রমিকদের দাবীর প্রতি নেপালী পুলিশের দরদ, দুইয়ের মিলনের ফলে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে একটা বিশেষ কায়দা দেখেছি। বাগানে পুলিশ এলে এরা তাদের ঘিরে ধরে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আবেদন জানাতে থাকে। বিশেষ করে বুড়ী মেয়েরা এগিয়ে যায়। বলে "তোমরাও গরীব নেপালী, আমরাও তাই'। তোমরা আমাদের সন্তান। পেটের জন্য যে লড়াইতে আমরা নেমেছি, তাকে দমাবার জন্য তোমরা কেন এগিয়ে এসেছ ?" নরবুং বাগানে ১৯৪৬ সালের ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকরা প্রথম এই কায়দা কাজে লাগায়। তারপর যতবার যেখানেই এরকম ঘটনা ঘটেছে, দেখা গেছে যে নেপালী সিপাহীরা শ্রমিকদের গায়ে হাত তুলতে রাজী হয়নি। তাদের অনিচ্ছা এবং চাপা গুঞ্জনের সামনে উচ্চ কর্মচারীদেরও সাহস হয়নি যে জোর জবরদস্তি করবে। তাই প্রতিবাদ ধর্মঘটের দিন বাগান ও পুলিশের কর্তৃপক্ষকে পিছু হটতে হয়, কিন্তু পিছু হটে চুপ করে বসে থাকবে কেন তারা ? কয়েকদিন পরে অন্য কৌশলে শ্রমিকদের উপর হামলা শুরু হল। বাগানের নেতা এবং অগ্রনী কর্মীদের সতের জনের নামে রুজু হয় শান্তিভঙ্গের মামলা। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের পক্ষে ভীষণ হয়রানি। মামলার খরচ জোগাবে কোথা থেকে ? ইউনিয়ন নামে বে-আইনী না হলেও কাজে বে-আইনী। আর মামলার খরচই তো একমাত্র সমস্যা নয়। যেদিন কোর্টে তারিখ থাকবে সেদিন কাজ কামাই করে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। বহু হয়রানির পর যদি সাজা হয় তবে জেল থেকে ফিরে এসে দেখবে যে তাকে ও তার পরিবারকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা তো হয়েছেই, উপরন্তু হয়তো বাগান থেকে "হটাবাহার" করে দেওয়া হয়েছে।

মামলা ছাড়াও আরও নানাভাবে মালিকপক্ষের আক্রমণ শুরু

হয়েছে। কোনও আত্মগোপনকারী নেতা লুকিয়ে বাগানে আছে সন্দেহে গুপ্তচরের আনাগোনা বেড়ে গেছে, নিজেদের ঘরের উপর চা-শ্রমিকের অধিকার কতটুকু! মালিকের চর নানা অজুহাতে যখন তখন সেখানে প্রবেশ করতে পারে। একদিকে মালিক ও সরকার-পক্ষের পাল্টা আক্রমণ চলেছে, অন্যদিকে শ্রমিকেরা দেখে যে তাদের আশেপাশের বাগানগুলি অসংগঠিত এবং পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সেই জন্য কয়েকদিন আগে যখন সিঙ্গেলে আসতে চেয়েছি—শ্রমিকেরা মানা করেছে, পীড়াপীড়ি করাতেও রাজী হয়নি। দূরে থেকে তাদের পরিস্থিতি বুঝতে পারিনি। মনে করেছি যে ওরা বুঝি বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে। সিঙ্গেলেরই একজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিক টি, বি (লছমন ছেত্রী) প্রাক্তন সৈনিক হওয়ার দরুন একটু আধটু ইংরেজীও জানে। দু-তিন দিনেই তার দায়িত্বজ্ঞানের উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। যশমান রাইয়ের বাগানে তাড়া খাওয়ার পর সমস্যা হল, এখন যাই কোথায়? সেখানে থাকা চলে না। অথচ সিঙ্গেল ছাড়া কাছাকাছি কোনও আশ্রয় নেই। কিন্তু আমার কিছু বলার দরকার হল না। সঙ্গী লছমন্ ছেত্রী নিজে থেকেই আহবান জানাল, চলুন আমাদের বাগানেই যাই। যত ঝুঁকি থাকুকনা কেন, কয়েকদিন অন্ততঃ আপনাকে নিরাপদে রাখতে পারব। গভীর রাতে কার্শিয়ং শহর পার হয়ে নীচের দিকে বাগানের পথ ধরা গেল। কিন্তু 'অযাত্রা পথের যাত্রী' যে, তার পক্ষে পরিচিত পথ ধরে যাওয়া তো সম্ভব নয়। বাগানে ঢোকার মুখে রয়েছে গুপ্তচরের পাহারা, তাই বেছে নিতে হল চা-ঝোপের মধ্য দিয়ে পায়ের দাগে আঁকা সঙ্কীর্ণ পথ, অন্ধকারে যার সর্পিল রেখা চোখে পড়ে না, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু অগুন্‌তি তারা ঝল্‌মল্ করে। চারিদিকে আঁধারের ঘন যবনিকা, অথচ নিরাপত্তার জন্য লছমন ছেত্রী টর্চ জ্বালাতে নিষেধ করে। কিন্তু টর্চ না জ্বেলে এপথে চলা অপরিচিতের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, জানি এই পথে দিনের বেলায়

চায়ের পাতা তুলতে পাহাড়ী মেয়েরা ওঠানামা করে পাতা বোঝাই টুকরি মাথায় ঝুলিয়ে, বনহরিণীদের মতোই ক্ষিপ্র এবং লঘু তাদের গতি। তবু টর্চ না জ্বেলে চলতে গিয়ে দেখি এক পা এগোতে গেলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সামনের পদক্ষেপ পথের উপরেও পড়তে পারে, অথবা পড়তে পারে শূন্যে। তারপর বহুনীচে ঐ উপত্যকায় গিয়ে হয়ত পতনের গতি রুদ্ধ হবে।

লছমন ছেত্রী বুঝিয়ে বলে, কেন টর্চ জ্বালা চলবে না। শ্রমিকেরা সারাদিনের মেহনতের পর ক্লান্ত থাকে। সুতরাং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। অতএব এই নিশুতি রাতে টর্চের আলোক-রেখা গুপ্তচরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে! নিশার আগন্তুক যে কি ধরনের লোক তা অনুমান করা কঠিন হবে না।

পাঙ্খাবাড়ী রোডের আলোকমালার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন উপায় নেই। শিশির ভেজা চা-ঝোপের নীচে থেকে কয়েকটা জোঁক কখন এসে মোজা ভেদ করে পায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে। ঝোপের আড়ালে বসে টর্চের আলো মাটির দিকে ফেলে জোঁকগুলিকে টেনে ফেলে দিই। লছমন্ ছেত্রী আমার অবস্থা বুঝে এগিয়ে এসে বলে, "আমার হাত ধরে এগিয়ে চলুন"। শক্ত করে চেপে ধরি শ্রমে কঠিন কর্কশ হাত। যাদের শক্তিশালী মজবুত বাহু সমস্ত বাধা চূর্ণ করে নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করবে, যেন তাদেরই সবার প্রতিনিধি হয়ে লছমন্ ছেত্রী হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, তাকে অবলম্বন করে এক এক পা করে সন্তর্পণ পদক্ষেপে নীচের দিকে অগ্রসর হই। অনেকটা নামার পর ছোট একটা বনের মত, সেখানে পৌঁছে ছেত্রী টর্চ জ্বালার অনুমতি দেয়। বাগানে ঢুকব 'পিছনের দুয়ার' দিয়ে। বনের মধ্য দিয়ে যেন পাহাড়কে দু-ভাগে ভাগ করে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে এক দুরন্ত গিরি নন্দিনী। আরো কয়েক মাইল নীচে নেমে সে গিরিনদীতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে তার জলধারা আছড়ে পড়ছে খাড়া কয়েক

হাজার ফুট নীচে। ঝরনার উপর দিয়ে পুল হিসাবে আড়াআড়িভাবে তিনখানা বাঁশ পর্বতগাত্রকে যুক্ত করেছে। দিনের আলোতেই অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে এহেন পুল পার হওয়া দুরূহ ব্যাপার, তার উপরে এই গাঢ় অন্ধকার। ভারসাম্যের একটু ব্যতিক্রম হলেই ঐ জলপ্রপাতে আছড়াতে আছড়াতে রওনা হতে হবে বালাসনের দিকে। ছেত্রী টর্চ নিয়ে আগে পার হয়ে যায়, তারপর পুলের উপর আলো ফেলে। টর্চের আলোয় পরিবেশ বড়ো বিচিত্র আর অদ্ভুত মনে হয়। প্রাচীন দেবদারু আর অনেকগুলি নাম না জানা বনস্পতির ছায়াঘন তলদেশের বুক চিরে ঝরনা ছুটে চলেছে। পাথরের উপর জলরাশি আছড়ে পড়ায় চূর্ণ শীকর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক ফোঁটা এসে গায়ে লাগে, পুলের নীচে ধাবমান জলধারার উপরে টর্চের আলো প্রতিফলিত হয়ে যেন শত টুকরোয় ভেঙে ছড়িয়ে যায় কিন্তু দাঁড়িয়ে সেই বৈচিত্র্য দেখার সময় কই? অতি সাবধানে ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলে পার হয়ে যাই।

পুলের ওপারে পৌঁছে পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরতেই দেখি আমাদের ভলান্টিয়ারেরা অপেক্ষা করছে। সবাই কিশোর অথবা তরুণ শ্রমিক। নেতাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেহনত ক্লান্ত রাতের ঘুম ছেড়ে চলে এসেছে। কয়েক বছর আগে যখন এখানে এসেছি এরা ছিল বালক, তবু সেদিনের স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করে এসেছে এরা, অতি অসঙ্কোচে কাছে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে। কিশোর সুলভ সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে ওদের মুখে—উত্তেজনা আর আগ্রহে অধীর হয়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। ওদের কচি মুখগুলি অনাগত স্বপ্নে উজ্জ্বল। মনে পড়ে কবিগুরুর কথা, "সবখানে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর ফিরি খুঁজিয়া"।—আমার জন্য কতঘর প্রতীক্ষা করে আছে পথের বাঁকে বাঁকে, এই ছেলেদের জন্য বুকের মধ্যে স্নেহের সাগর তোলপাড় করে ওঠে। ইচ্ছা করে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আর ভাবি যে সেই আদর্শ কত মহান্ যার যাদুমন্ত্রে পরিচিত

অপরিচিত অসংখ্য মেহনতী মানুষের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন এমন অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে গেছে।

আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল পৃথ্বীমান (সার্কী) রাইয়ের ঘরে। তাঁর কথা বলতে গেলে ওয়াংদি লামাকে মনে পড়ে যায়। তেমনি প্রশান্ত আত্মসচেতন ব্যক্তিত্ব, তেমনি সংকল্পে দৃঢ়, অথচ সহকর্মীর জন্য শিরীষ কোমল অন্তর। পৃথ্বীমান এই বাগানের নেতা, অতি সামান্য লেখাপড়া জানা শ্রমিক, কিন্তু তাঁর শান্ত মুখশ্রীতে, ছোটখাটো কথাবার্তায় এবং চলাফেরায় ফুটে ওঠে একটা সহজ আর অনাড়ম্বর মর্যাদা। মাঝে মাঝে জীবনের যাত্রা পথে এমন দু-একজন লোকের দেখা পাওয়া যায় যাকে প্রথম দর্শন এবং আলাপেই মনে হয় অতি পরিচিত বলে। মানুষের মহিমার দীপশিখা যেন তার ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

নেপালীদের প্রথামত পৃথ্বীমান আগন্তুককে বসার জন্য পিঁড়ি এগিয়ে দিলেন। তবে এখানে কাঠের পিঁড়ির বদলে ভুট্টাগাছের খোসা দিয়ে পিঁড়ি তৈরী হয়। বাংলায় তাকে 'আসন' জাতীয় জিনিস বলাই ঠিক হবে। তারপর এল চিরাচরিত ফীকা চা। পৃথ্বীমানের স্ত্রী পূর্ণগর্ভা, ঘরের এককোণে তক্তা দিয়ে বানানো মাচার উপর শুয়ে। তাই গৃহস্বামী নিজেই চা বানিয়ে আগন্তুকদের সবাইকে এক এক গ্লাস করে এগিয়ে দেন। তারপর লছমন ছেত্রীর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনেন যশমান রাইয়ের বাগানের ঘটনার কথা, এখানে কমরেড্‌কে কিভাবে নিরাপদে রাখা যায় সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, বাগানের শ্রমিক বস্তীতে 'আত্মগোপনকারী' কর্মীর পক্ষে থাকার অসুবিধা অনেক, বিশেষতঃ যদি তিনি বাঙালী হন। মালিকের অনুচরেরা, বিশেষ করে চৌকিদার যে কোনও অছিলায় ঘরে ঢুকতে পারে। তার উপর আবার বর্ষা সমাগত, ঘরের চালের ছাউনিতে নতুন খড় চাপাতে হবে কিনা দেখার অজুহাতে প্রবেশ করলে আপত্তির কোনও উপায় থাকবে না। আপত্তি করতে গেলে

চৌকিদারের সন্দেহ বেড়ে যায়।

তাছাড়া আর একটি বড়ো অসুবিধা হল প্রকৃতির দাবি মেটা-নোর। শ্রমিকদের পায়খানাগুলি হল ব্যসস্থান থেকে বেশ দূরে। 'পায়খানা' বলে মজুরদের জন্য কোন ব্যবস্থা করাটাকে মালিক-পক্ষ আদৌ দরকার মনে করে না। তাই হয় তো ঝরনার ধারে বা কোনও ঝোপের পাশে একটি জায়গা ঠিক করা থাকে। এতদিন জেনে এসেছি যে পায়খানার জন্য স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকেরা হুক-ওয়ার্ম প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু রোগ ছাড়াও যে কতরকম অসুবিধা থাকতে পারে তা এবার প্রত্যক্ষ করছি। বিশেষ করে বর্ষার দিনে কষ্টের অন্ত থাকে না। দুরন্ত বর্ষণের মাঝে হয়ত 'বোরো' (চটের থলে) অথবা "গুম" (বাঁকারির ফ্রেমে বড় বড় পাতা সাজিয়ে ঢাকনার মতো বানানো, মাথার দুপাশে ঝুলিয়ে দিতে হয়) কাদায় পিছল সঙ্কীর্ণ চোরবাটোতে আছাড় খেতে খেতে প্রকৃতির তাগিদ মেটাতে যেতে হয়। খুব কম শ্রমিক ঘরেই দেখেছি যে এক প্রস্থের বেশী জামাকাপড় আছে। পুরুষেরা এক প্রস্থ দাওরা-সুরুআল পরে মাসের পর মাস কাটায়। মেয়েরাও তাই এক প্রস্থ শাড়ী, চোলি ও ওড়না সম্বল করে তাদের দিনের পর দিন কাটাতে হয়। জামাকাপড় বদলের রেওয়াজ নেই এদের মধ্যে। থাকবে কি করে? একে ঠাণ্ডার দেশ, বছরের বেশীর ভাগ সময় কুয়াশায় ঢেকে থাকে। জামাকাশড় ধুয়ে দিলে কয়েকদিনের আগে শুকোয়না। তার উপর জামাকাপড়ের অভাব। আগে আগে তবু পুজোর সময় মালিকপক্ষ সস্তাদরে কাপড় সরবরাহ করত। এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই শ্রমিক নরনারীকে এক কাপড়ে বহুদিন কাটাতে হয়। একটু আধটু ভেজা কাপড় গায়েই শুকোয়। সেদিক দিয়েও বর্ষার দিনে প্রকৃতির তাগিদ মেটাতে যাওয়া আর এক বিড়ম্বনা।

যা হোক একজনের ঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল। এই ঘরটির

এককোণ ঘিরে ঝোপের মতো করা। তার ভিতরে কোনমতে হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া যায় মাত্র। স্বল্পপরিসরে বেশী নড়াচড়া করার উপায় নেই, কিন্তু নিরাপত্তার দিক থেকে বেশ ভালো। তার ভিতর একটা পুরনো চটের ক্যাম্প খাট মতো বসানো। এও পৃথ্বীমানেরই বন্দোবস্ত। বর্ষায় সঁ্যাতসেঁতে শুধু মেঝের উপর কমরেডকে শোয়াতে তার মন মানেনি। ক্যাম্প খাটের উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। কয়েকদিন ধরে বর্ষা নেমেছে, তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডালাগে। মেঝে থেকে সঁ্যাতসেঁতে শৈত্য ওঠে। জোর বৃষ্টি হলে চাল ফুটো করে বিছানায় জল পড়বে। বাইরে থেকে খড় দিয়ে ফুটো বন্ধ করতে গেলে অন্য লোকের সন্দেহ হতে পারে ভেবে শ্রমিক বন্ধুরা ভিতর থেকেই একটা ব্যবস্থা করেন।

ভোর বেলায় সবাই ভাত খেয়ে কাজে রওনা হবে। কাজে যাওয়ার আগে পৃথ্বীমান এসে খোঁজ করে যান। এত ভোরে আমার পক্ষে ভাত খাওয়া সম্ভব হবে না বুঝে কিছুটা শুকনো চিঁড়ে সংগ্রহ করে এনেছেন। আবার বেলা এগারোটার সময় এক ফাঁকে কাজ থেকে চলে আসেন ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। আমাদের মতো অতিথিদের খাওয়াবার জন্যে ইউনিয়ন সভ্যদের থেকে এক-এক মুঠি চাল ও সপ্তাহে দু আনা পয়সা তোলা হয়। চা শ্রমিকের পক্ষে এই টুকুই যে কতখানি ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় তা যারা শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত তারা জানে। এই সামান্য কাজের মধ্যে দিয়েই আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতি শ্রমিকদের গভীর আনুগত্য প্রকাশ পায়। শুধুই কি আনুগত্য? কমরেডের জন্য পৃথ্বীমানের যে গভীর দরদের পরিচয় পাই তা আমার মনে এক অপূর্ব প্রেরণা এনে দেয়। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমার জীবনের বছরগুলি কেটেছে জেলের স্নেহ মমতাহীন রূঢ় রিক্ত পরিবেশে। যখন বেরিয়ে এসেছি তখন মা নেই। বহু দিনের ব্যবধানের ফলে নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকেও সরে এসেছি অনেক দূরে। তারপর শ্রমিক

আন্দোলনের কাজে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াই এক বাগান থেকে আর এক বাগানে। একটি এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। বে-আইনী জমানার আগেও দিনগুলি কেটেছে এইভাবে। তাই ঘরের স্নেহ-কল্যাণময় সুধারসে সিঞ্চিত পরিবেশের কথা ভুলে গিয়েছি অনেক দিন। কিন্তু আজ এই বিঘ্ন-বিপদে ভরা যাত্রাপথে শ্রমিকের কুটিরে কুটিরে পাই মা বোনের স্নেহ, ভাইয়ের দরদ, বন্ধুর সহজ প্রীতি। যাত্রাপথে অমূল্য সম্বল যোগায় তারা।

খোপের মধ্যে সেই চটের খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে থাকি। সামনের মাটির দেওয়ালে আধ হাত লম্বা, এবং তার অর্ধেকের চাইতেও কম চওড়া জানলা। জানলা বললে ভুল বলা হবে, রন্ধ্রপথ নাম দেওয়াই সঙ্গত। নেপালীরা জানলাকে বলে খিড়কি। ভালোকরে খুলে রাখার উপায় নেই। কারণ খুললেই সামনে পড়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার বড় রাস্তা। মজুরের ঘরে কাজের সময় কেউ জানলা খুলে বসে থাকলে শুধু সেইটুকুই যথেষ্ট কৌতুহলের সঞ্চার করবে। তার উপর যদি সেই লোকের চেহারা চোখে পড়ে, তাহলে সন্দেহ হবে আরো ঘনীভূত। যতই কেননা নেপালী মজুরদের মত দীন মলিন পরিচ্ছদ পরে থাকি, তবু চেহারাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছাপ লুকানো তো সহজ নয়। তাই দিনের বেলায় ঘরে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। নিরাপত্তা বজায় রেখে খিড়কির কপাট একটু খুলে রাখি, যাতে বাইরে থেকে ভিতরের কিছু চোখে না পড়ে, অথচ মেঝেতে কিছুটা আলো এসে পড়ে। স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর "বোরা" (চটের থলে) বিছিয়ে বসে পড়া লেখার কাজ করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা বাইরে চতুর্দিক ছেয়ে ফেলে, দিনের বেলাতেও আঁধারের ছায়া নেমে আসে। পড়া-লেখা বন্ধ করে কম্বল বিছিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ি। সময়ের গতি বড় মন্থর মনে হয়। আন্দোলন এবং সংগঠনের নানা সমস্যার কথা চিন্তা করে কিছুক্ষণ সময় কাটে বটে—কিন্তু তারপর সময়ের বোঝা বড় ভারী হয়ে পড়ে। এগারটার

পর পৃথ্বীমান এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মোটা লাল চালের ভাতের সঙ্গে কোনদিন একটু ডাল, কোনদিন শুটকী মাছ নেপালীদের ভাষায় যার নাম "সিতরা"। খাওয়ার পর যদি বাইরে পরিষ্কার থাকে, তবে আবার কিছুটা পড়াশুনা করা চলে। নইলে নিদ্রার আশ্রয় নিতে হয়। বিকেলে সবাই কাজ থেকে ফিরে এলে বস্তিতে কিছুটা প্রানচাঞ্চল্য জাগে। মেয়েরা জল এনে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়। পুরুষেরা রান্নার জন্য কাঠ চিরে অন্য ছোটখাটো গৃহকর্মে নিযুক্ত হয়। সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে নামার আগে শ্রমিক পরিবারের খাওয়া শেষ হয়।

গৃহস্বামিনীও স্বল্পভাষিণী। অতিথিকে আগে খেতে দিয়ে খেতে বসবেন। নেপালীদের মধ্যে একটা সহজ আতিথেয়তার নিদর্শন বহুবার পেয়েছি। অতিথির সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে গৃহস্বামিনী হাতজোড় করে নমস্কার করেন। এই এদের প্রথা, একগ্লাস জল দিলেও নমস্কার করতে হয়। অন্য কোথাও হলে হয়ত একে একটা নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সরল নিরক্ষর শ্রমিক রমণীর নমস্কারের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে যে আন্তরিকতা তাকে উপেক্ষা করব কেন?

সন্ধ্যার পর আমাদের বৈঠক বসে। একে একে অগ্রণী কর্মীরা এসে জড়ো হন। ছেলেদের দু-একদলও আসে। বাগানের নেতারা ছেলেদের উপর ভার দিয়েছেন যে বৈঠকের সময় বাইরে চারপাশে ঘুরে নজর রাখতে হবে, যাতে সরকারপক্ষের কোন চর হঠাৎ এসে না পড়ে। বৈঠকের আলাপ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বাইরে থেকে তাদের প্রাণচঞ্চল তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কানে আসে। সিনেমায় শোনা হিন্দী গানকে একটু অদল বদল করে নিজেদের আন্দোলনের ভাষায় রূপ দিয়েছে, "বঢ়দাই যাও, বঢ়দাই যাও" অর্থাৎ "বড়তে চলো, বড়তে চলো," ইত্যাদি।

বাগানের প্রায় প্রত্যেক বস্তির ঘরে ঘরে বাতি নিভে যাওয়ার

পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চলে। নেপালী ভাষায় মার্কসীয় সাহিত্য বা রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করতে একেবারেই পারিনি বললে খুব ভুল হবে না। যা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। সত্যজাগ্রত এই যে মানুষগুলি আঁধারের গহ্বরে বসে বিশ্ব গণ আন্দোলনের জ্যোতিলোকের দিকে মুখ তুলে চাইছে—ওদের জ্ঞানের তৃষ্ণা অপরিসীম। পশ্চাৎপদ সাধারণ শ্রমিকদের পথ দেখানোর যে দায়িত্ব ওদের উপরে সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। নতুন জীবনের নেশায় আজ ওরা সেই মহান সৃষ্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চা-বাগানের অন্ধকার ভেদ করে একদিন হবে যে নতুন জীবনের "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়" তার স্বপ্নের ঘোর দেখি ওদের চোখে। কত কিছু জানতে চায়, অনির্বাণ কৌতূহল নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। সোভিয়েত দেশের জীবন, চীনের গণমুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি, ভারতের সমতল ভূমিতে মেহনতী মানুষের লড়াইয়ের কাহিনী শুনে আশা মেটে না। পৃথ্বীমান প্রশ্ন করে কম, কথাও বেশী বলে না। লছমন ছেত্রী ঠিক তার উল্টো। তার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই কিন্তু বড় চঞ্চল। প্রশ্নের জবাব ভালো করে শোনার আগেই অন্য কথা শুধোয়। মায়লা একমনে শোনে, শুনতে শুনতে মনোমত কথা পেলে নিজের অভিজ্ঞতার কোন ঘটনা দিয়ে কথাটাকে ব্যাখ্যা করে। পৃথ্বীমান কম কথা বললেও মাঝে মাঝে যা বলে বা প্রশ্ন করে তাতে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা আর প্রখর বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন কোন সন্ধ্যায় বৈঠকের বাবস্থা হয়। আশে পাশের বাগানের শ্রমিকদের বস্তিতে। চোরবাটো ধরে অন্ধকারে যাতায়াত অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। এইসব বৈঠকে প্রধানত চা-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা নিয়েই আলোচনা হয়। এমনিভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়।

সুশীলদা খবর পাঠিয়েছেন, জেলা কমিটির সভা হবে। জায়গা

ঠিক হয়েছে ছোটা রিং টং বাগানে খালিং এর বাসায়। আবার ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হই সেই উদ্দেশ্যে। খালিং এর কুটিরটি নিরিবিলি। আশেপাশে কোনও কুটির নেই। অবশ্য পাশ দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা আছে। খালিং এর ঘরের একটি সুবিধা দুটি কামরা আছে। একটি অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিতে পারে। ঘরে থাকার মধ্যে দুজন, ও আর ওর গৃহিণী। গৃহিণী স্বল্পভাষিণী, কিন্তু তার যে প্রখর বিবেচনাবোধ ও ভগ্নীর মতো দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি সে কথা চিরকাল স্মরণে থাকবে।

পৌছানোর পর শোনা গেল সভার তারিখ পিছিয়ে গিয়েছে। তিন-চারদিন পরে হবে। ছেত্রী সিঙ্গেলে ফিরে গেল। আমিও স্থির করি এখানে কয়দিন বেকার বসে না থেকে মুণ্ডা বাগানে ঘুরে আসি। সেই অনুযায়ী খবর পাঠানো হল মুণ্ডা বাগানের নেতা তুলারাম ছেত্রীর কাছে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে লোক এসে গেল।

মুণ্ডা যাওয়ার পথটি বেশ কঠিন। খালিং এর ঘরের পাশ দিয়ে যে পায়ে চলার পথটি নীচে উপত্যকায় নেমেছে সেটি খুব খাড়া। উপত্যকায় নেমে "গনওয়ার খোলা" (ঝরনা)-র উপরে ছোট পুল পার হয়ে আবার খাড়া চড়াই। পূর্তবিভাগের সড়কে পৌছানোর আগে হাঁপিয়ে উঠি। সড়কটায় পৌছালে খানিকটা অপেক্ষাকৃত সমতল। তারপর একটা মালভূমির মত জায়গা। মালভূমিটির পরে সড়ক ডান দিকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে মুণ্ডাকোঠিতে পৌছেছে। তাতে সময় নিলেও পথশ্রম একটু কম। কিন্তু আমার সঙ্গী বলে, ওপথে যাওয়া চলবে না। একটু দূর গেলেই পথটি ম্যানেজার সাহেবের কুঠির সামনে দিয়ে গিয়েছে। সাহেবের কুঠি বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল। সামনে চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে। অতএব বাঁদিকের চোরবাটো ধরে নীচে নামতে হয়। রাস্তাটি একজায়গায় শ্রমিকদের বস্তির মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এটা হল মুণ্ডা বাগানের উপরের অংশ "মাথিলো গাঁও।" এখানকার শ্রমিকেরা গোর্খা লীগের অনুগত।

আমাদের ইউনিয়নের শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কটা আদায় কাঁচকলায় না হলেও খুব প্রীতিরও নয়। খুব সম্ভব গ্রাম্য ঝগড়া এক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্যের বিরোধের রূপ নিয়েছে। নামতে নামতে একজায়গায় এসে আবার পূর্তবিভাগের সড়ক, আমার সঙ্গী এখানেও চোরবাটো ধরে চলা শুরু করে। সড়ক ধরে গেলে অনেক ঘুরতে হবে। তার পিছনে চলতে গিয়ে দেখি পথটি শুধু যে সঙ্কীর্ণ, তাই নয়, খুবই খাড়া। এ ধরনের খাড়া পথে একটানা ছুটে নামতে হয়, নতুবা দু-একবার মাটিতে গড়াগড়ি অনিবার্য। রাস্তার প্রান্তে পৌঁছে টাল সামলাতে সঙ্গী শ্রমিকটিকে আঁকড়ে ধরে তারপর দুজনেই প্রাণখোলা হাসিতে মজা উপভোগ করি।

বাগানে পৌঁছে রাতের আস্তানায় বসে বিশ্রাম নিই। কিছুক্ষণ পরে আসে বাগানের অন্যতম নেতা পূরণ রাই। সে কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলে, "কম্‌রেড্, আজ বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারি নি। আজ রাতটা আমাকে ছুটি দিতে হবে। পূরণ ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ার পর আসে অপর নেতা তুলারাম ছেত্রী। লোকটি ধীরস্থির, সদাহাস্যময়। পূরণের ছুটি নেওয়ার কথা শুনে হেসে বলে, "আজ শনিবার। আজ প্রায় সবাই রাতে "রক্‌সি" খেয়ে মেতে থাকবে। আসল কথা হল তাই।" সপ্তাহের শেষ দিনটিতে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে এই জিনিষের চল আছে। তবে যে সব শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, তারা অভ্যাসটা কাটিয়ে উঠেছে। আমরা উপর থেকে কোনও নির্দেশ দিই নি। নিজেদের সহজ বুদ্ধিতেই তারা এটি করেছে। পূরণ অভ্যাস ছাড়তে পারে নি শুনে তুলারামকে বলি, "এই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে না পারলে ত বিপদের আশঙ্কা থাকে।" তুলারাম বলে, "আমি তাকে বুঝিয়েছি। সেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে অভ্যাস ছেড়ে দিতে।"

পরদিন সন্ধ্যায় বৈঠক বসে। শিবটার থেকে শুরু করে এযাবৎ ছোট বড় কয়েকটি বৈঠক করেছি। এর মধ্য দিয়ে নতুন উপলব্ধি

হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা ছিল একতরফা। আমরা বলে গিয়েছি, তারা শুনেছে। বাগানের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আর একটু ঘনিষ্ঠ ছিল। ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সমিতি এবং পার্টির জেলা কমিটির সভায় তারা যোগ দিত। তখন জিজ্ঞাসা করলে দু-চারটা কথা হত। এখন সারা দিনের সাহচর্যে তাদের মনের দুয়ার আমার সামনে খুলে যাচ্ছে। বৈঠকে সাধারণ শ্রমিকরাও দু-একটা কথা নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করে, মন্তব্যও করে। তাদের মনের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়। এরই পাশাপাশি দুটি জিনিস লক্ষ্য করি। সাধারণ শ্রমিক কি পার্টিসভ্য, কি ইউনিয়ন সভ্য, তাদের চেতনার জাগরণ একেবারে প্রাথমিক স্তরে। উষার উন্মেষে যেমন অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, অথচ আলো ফোটে নি, অনেকটা সেইরকম। এদের জানার এবং দৃষ্টির পরিধি অত্যন্ত ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। চা-বাগানের বাইরে রয়েছে যে পৃথিবী, তার সম্বন্ধে এদের কোনও ধারণাই নেই। এদের বেশীরভাগের কাছে বাইরের দুনিয়ার সীমানা দার্জিলিং শহরের এবং কার্শিয়ং শহরের বাজার। হাটের দিন সেখানে যায়, আর কখনো সখনো মিছিল করে জনসভায় যোগ দিতে যায়। নতুন জীবন, নতুন দুনিয়া, বিপ্লব, সমতল-ভূমির মেহনতী মানুষের সংগ্রাম, ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসব কথা আমরা বলি, তার খুব সামান্যই বোধগম্য হয়। ভাসাভাসাভাবে একটা আবেদন তাদের অন্তরে পৌঁছায়, তবে সেটা আবছায়া। বুদ্ধির চাইতে হৃদয়ের বীণাতে ক্ষীণ ঝঙ্কার তোলে। এদের মধ্যে সত্যনারায়ণের "কথা"। নেপালী কবি ভানুভক্ত রচিত রামায়ণ শোনার রেওয়াজ আছে। আমাদের বক্তব্য অনেকটা "কথা" শোনার মত গ্রহণ করে। অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে দুই একজনকে পাওয়া যায়, যাদের জানার আগ্রহ অপরিসীম। বিশেষতঃ যারা ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে, অথবা পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা ঘুরে এসেছে, তাদের চেতনা অনেকটা উন্নত। তাদের মধ্যেই অনেক

কিছু খুঁটিয়ে জানার আগ্রহ প্রবল। শহরে নেতারা এদের দেখেই শ্রমিকদের চেতনার মানকে বাড়িয়ে দেখে থাকেন। হামালের সঙ্গে সুশীলদার মতভেদ কেন হত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সেটা এখন বেশ বুঝতে পারি। সাধারণ শ্রমিকদের মনে লালঝাণ্ডার প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছে। সংগ্রামের সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছে। তবে সেই প্রক্রিয়াকে অতিরঞ্জিত করে দেখলে ভুল হবে। যখনই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোন হঠকারী নির্দেশ এসেছে, এরা সহজ বুদ্ধিতে সে নির্দেশ এড়িয়ে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে এদেব মধ্যে দুই একজন যুদ্ধ ফেরৎ প্রাক্তন সৈনিকের দেখা মেলে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের গোর্খা বাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন না কোন রণাঙ্গন ঘুরে এসেছে। এদের দৃষ্টি অনেক প্রসারিত, চেতনার মান উন্নত। এমনি ধরনের কর্মীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারাই হবে সত্যিকারের অগ্রবাহিনী।

পরের দিন সন্ধ্যায় খালিং-এর ঘরে ফিরে আসি। রওনা হবার আগে ভাত খেয়ে চলা শুরু করেছি, তবু যখন গভীর রাতে সেখানে পৌঁছাই, তখন ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। মুখে কিছু বলার প্রয়োজন হল না। আমার অবস্থা একনজরে বুঝে নিয়ে খালিং-এর গৃহিণী তাড়াতাড়ি গরম গরম রুটি বানিয়ে দিল চায়ের সঙ্গে। এই মেয়েটি স্বল্পভাষিণী, শ্রীময়ী। যতবারই তাদের ঘরে অতিথি হয়েছি, নীরব সেবায় স্নেহময়ী ভগিনীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

পরেরদিন সন্ধ্যায় এখানেই জেলা কমিটির সভা বসে। জেলা কমিটির সভায় বিষয়টি তুলেও সুশীলদাকে গুরুত্ব বোঝানো গেল না। কমিটির সভ্য শ্রমিক কৃষকরাত' এই সব বিষয়ে বিশেষ কিছু মুখ খোলে না, যেটুকু আলোচনা হয় তা আমাদের দুজনের মধ্যে সীমিত। বেশী জোর বা পীড়াপীড়ি করতে পারি না। তাহলে শ্রমিক কৃষকেরা ভুল বুঝবে যে আমাদের দুজনের মধ্যে বুঝি ব্যক্তিগত ঝগড়া, ফলে

প্রসঙ্গটি আপাততঃ ধামা চাপা পড়ে।

সেই সময়টিতে গোটা কমিউনিস্ট পার্টিতে সঙ্কীর্ণতাবাদ, ও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীসচেতনতা ও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির নামে একটা অত্যন্ত অন্ধ উগ্র অসহিষ্ণুতার অসুস্থ আবহাওয়া যেন হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি-ভঙ্গির নামে পার্টির ভিতরে উপদলীয় মনোভাবটা রাজত্ব করেছে। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ফতোয়া দিয়েছে পার্টিসংগঠনের সমস্ত স্তরে নেতৃত্বকে proletarianise করতে হবে। এর ফল দাঁড়াচ্ছে জঙ্গী শ্রমিক ক্যাডারকে নামকাওয়াস্তে পার্টি কমিটির সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়। কমিটিতে একজনের বেশী বুদ্ধিজীবী কম্‌রেডের থাকা চলবে না। সেই কম্‌রেডটি উর্দ্ধতন নেতৃত্বের আস্থাভাজন হওয়া চাই। বে-আইনী অবস্থায় নির্বাচিত কমিটিগুলি হয় ধরপাকড়ের ফলে ভেঙ্গে গিয়েছে, নতুবা উর্দ্ধতন নেতৃত্ব বাতিল করে দিয়েছে। কমিটিগুলি মনোনীত, সম্পাদক পদে সদ্য বহাল জঙ্গী শ্রমিক ক্যাডার অনভিজ্ঞ। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি proletarianisation এর নামে প্রতি কমিটিতে উর্দ্ধতন নেতৃত্বের আস্থাভাজন বুদ্ধিজীবী কম্‌রেডের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা। শুধু ভ্রান্ত রাজনীতির দরুনই নয়, ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হতে হয়েছে বহু পরীক্ষিত, একনিষ্ঠ, প্রবীণ কম্‌রেডকে। গোটা পার্টি যেন একটা বিকারের ঘোরে আচ্ছন্ন। সুশীলদাকে প্রশংসা করতে হয় যে তিনি সঙ্কীর্ণতাবাদী ও subjective রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও দার্জিলিং জেলাতে ঐ ধরনের proletari-anisation চালু করেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রতি পদে যে ধরনের মতভেদ হচ্ছিল, তাতে তিনি অন্যান্য জেলার কায়দা অনুসরণ করে প্রতিশোধ নিতে পারতেন! জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হলেও জেলার সম্পাদকমণ্ডলী গঠনে তিনি উৎসাহ দেখান নি। দেখালে পার্টির নির্দেশ অনুসারে সম্পাদকমণ্ডলীতে আমার স্থান হত না।

অনেকদিন পর ভেবে দেখেছি সুশীলদার উপর খানিকটা অবিচার

করেছি। তাঁর যেসব দোষত্রুটির সমালোচনা করেছি সেগুলিকে প্রাদেশিক নেতাদের অনেকের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান দেখেছি। সুশীলদা তবু চুয়ান্ন বছর বয়সে দুর্গম চড়াই উৎরাই ভেঙে চা বাগানে বাগানে ঘুরেছেন। কোন কোন সময় আমিও সঙ্গে থেকেছি। পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, এখানকার জনসাধারণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গোপন সংগঠনের সামনের বাস্তব সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নেতাদের কোনও ধারণাই নেই। কলকাতার উপরে কয়েকটি গোপন আড্ডায় মাঝে মাঝে থাকার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেখানে বে-আইনী সংগঠন পরিচালনার যা ধরনধারণ দেখেছি, পাহাড়ের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অচল। সবদিক দিয়েই ; উপরন্তু এখানে বে-আইনী জমানায় আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটি ছিল খুব জটিল। পরিচিত নেতাদের সঙ্গে চা-বাগানের পার্টিসভ্য ও সমর্থকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা দরকার। এখানে পার্টিসভ্য, ইউনিয়ন সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে সীমারেখা খুব ক্ষীণ, নাই বললেই চলে, সেকথা গোড়ার দিকের অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। বাগানে বাগানে পার্টির যে সব অগ্রণী সভ্য এবং জঙ্গী কর্মী আছে, তাদের রাজনৈতিক চেতনার মানের সঙ্গে সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের মানের বড় একটা তফাৎ নেই। সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের পার্টির নীতি বোঝাতে হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির নেতাদের নিয়ে কাজ চলে না। যেতে হয় সুশীলদাকে এবং আমাকে, যাওয়ার পরে আর একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। "ভন্‌জেঙ্গ' এবং "রংবুল"-এ কৃষকদের মধ্যে "পার্টি সেল" গঠন প্রসঙ্গে সেকথা খানিকটা বলা হয়েছে। চা বাগানে সেটি আগে বড় আকারে দেখা দেয়। পার্টি সভ্যদের প্রাদেশিক নেতারা এইসব সমস্যা বুঝতে অপারগ। একবার ত' প্রাদেশিক কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক 'নিতাই' (বে-আইনী যুগে পার্টি নাম) দার্জিলিং জেলার অভিজ্ঞতা সরেজমিনে দেখার জন্য এসেছিলেন। তাঁর জন্য যে চা-বাগানটি ঠিক করা হয় সেটি হিলকার্ট

রোডের সবচেয়ে কাছে। কর্মীদের বলে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় যেন "চোরবাটো" এড়িয়ে পূর্তবিভাগের সড়ক ধরে যাওয়া হয়। সমতল ভূমির মানুষের পক্ষে ঐ অপেক্ষাকৃত সহজ পথটুকুই অত্যন্ত কঠিন। চড়াই উৎরাই ভাঙ্গার পরিশ্রমে অবসন্ন নেতার দুরবস্থা দেখে তখনকার মত পাহাড়ী কমরেডদের সহানুভূতি হলেও পরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা এই নিয়ে হাসাহাসি করেছে।

আর একবার ত' "রঞ্জন" নামে পরিচিত আর একজন প্রাদেশিক নেতার গাফিলতিতে মস্ত বড় বিপর্যয় ঘটতে চলেছিল। "বিরাটদা"র মতো প্রবীণ, বহুদিনের অভিজ্ঞ নেতাও ত' এখানে এসে পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন। তাঁকে গোপনে চা-বাগানে এনে মুণ্ডাকোটির জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলাম। রাতের অন্ধকারে পাহাড়ীপথ পরিক্রমার যে একটা রোম্যান্টিক আমেজ আছে, তা বোধহয় অল্পবিস্তর সব বয়সের মানুষদের মনকে নাড়া দেয়। বিশেষতঃ যারা সমতলভূমির অধিবাসী। তার উপরে জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। এদের মধ্যে দু-একজন প্রাক্তন সৈনিকও ছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে "বিরাটদা" এত উৎসাহিত হয়ে পড়েন যে এই অঞ্চলকে প্রায় "মুক্ত-এলাকা" বলে অভিহিত করেন। অথচ আমি ভালভাবেই জানি পরিস্থিতি মোটেই সেরূপ নয়। শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাব রয়েছে প্রাথমিক স্তরে। কখনও কখনও প্রতিরোধের মনোভাব দেখা দিলেও তা অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত। পুলিশী হামলা বড় আকারে শুরু হলে সংগঠন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। সেকথা 'বিরাটদা'কে বুঝিয়ে বলতে তিনি যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল, তার অর্থ, আমি সংগ্রাম বিমুখ না হলেও অনেকবেশী হিসেবী।

জেলা কমিটির সভার পর আমরা, অর্থাৎ সুশীলদা ও আমি খালিং-এর ঘরেই পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে যাই। এটা গোপন সংগঠনের নিয়মবিরুদ্ধ, ধরা পড়লে দুজনে একসঙ্গে পড়বো, অথচ

নিরুপায়। আগে থেকে কোন বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হয় নি। দুজন একসঙ্গে থাকলে কথাবার্তা কিছু হবেই, মাঝে মাঝে বাংলাতেও কথা হয় অভ্যাসবশতঃ। খালিং-এর গৃহিণী খুব বুদ্ধিমতী। কায়দা করে হুঁশিয়ারি দেয়। বলে, বাইরের রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে মনে করবে ঘরের 'দেওতা' (দেবতা) কথা বলছে। আলোচনা প্রসঙ্গে সুশীলদা বলেন, বড় ভুল করেছি, যখন প্রকাশ্যে আসা যেত, তখন যদি এই রকম বাগানে এসে দু-তিনদিন কাটিয়ে যেতাম, তাহলে সংগঠন অনেক মজবুত হত। 'গতস্য শোচনা নাস্তি', এখন যেটুকু সময় পাই, সেটুকুতে যা পারি করে যাবো।

সন্ধ্যায় সিঙ্গেল থেকে সঙ্গী এলে রওনা হই। মুষলধারে বৃষ্টি নামে। প.নের 'দাওরা সুরুআল' ভিজে সপ্‌সপে। ভাবি, বাগানে শুকোনোর অসুবিধা। একটা রাত ও দিন সিনহার বাসায় কাটিয়ে ওটা শুকিয়ে নিয়ে পরদিন রওনা হবো। সিন্‌হা সাদরে অভ্যর্থনা করলেও গৃহকর্ত্রী যে অপ্রসন্ন, তা বোঝার বাকী রইল না। উপায় নেই। সিন্‌হা ভদ্রলোক ছ'ফুট লম্বা। তাঁর ছেলের জামা কাপড় পরে আজ রাতটা এবং কাল দিনটা কাটাতে হবে। সকালে নেপালী ঠিকে ঝি কাজ করতে আসে। সামলে চলতে হবে। গৃহকর্ত্রী যে কতখানি অপ্রসন্ন, তা বোঝা গেল সন্ধ্যায় যাত্রার সময়। ভিজে দাওরা সুরুআল হাত তুলে দিয়ে বল্লেন, "ঝি সন্দেহ করবে, তাই শুকোনো হয় নি"। কথা ছিল রাতেই শুকোবার ব্যবস্থা করার। এখানে যাতে আর না আসি, তার নোটিশ। আত্মগোপনের জীবনে যখন মধ্যবিত্ত সমর্থকদের ঘরে কাটাতে হয়েছে, তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই জিনিষটি দেখেছি। গৃহস্বামী আশ্রয় দিতে রাজি হলেও গৃহস্বামিনী রাজী নন। তাঁর বিরক্তি নানাভাবে তুচ্ছ ব্যাপারে প্রকাশ করতেও ছাড়েন না। বিপরীত চিত্র দেখি শ্রমিকের ঘরে। সিঙ্গেল বাগানে যখন পৃথ্বীমান্ (সাকী) রাইয়ের ঘরে পৌঁছাই, তখন ওদের অভ্যাসমতো রাত অনেক। তবু গৃহকর্ত্রী উঠে বলে, "কম্‌রেড,

'দাওরা সুরুআল' ছেড়ে দিন। উনুনের আঁচে শুকিয়ে দেবো। ওখানে ভাগ্যক্রমে আমার ব্যাগে একসেট সার্ট ও ট্রাউজার ছিলো। ভিজে পরিচ্ছদ ছেড়ে স্বস্তি পাই। সাকী রাইয়ের গৃহিণী উনুনের উপরে বাঁশে টাঙিয়ে দেয়। হঠাৎ একদিন পৃথ্বীমানের ঘর থেকে অন্যত্র যেতে হল। গত দু-দিন বর্ষায় শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের কাছে যথেষ্ট দরবার করা সত্ত্বেও তাদের ঘর মেরামত, বা চাল ছাওয়ার ব্যবস্থা হয় নি। এবার কি কারণে হুকুম হয়েছে যে ঠিক এই বস্তির ঘরগুলিই আগামী দু-একদিনের মধ্যেই ছেয়ে দেওয়া হবে। বেশ কিছুদিন ধরে এখানে আছি, বৈঠক এবং অন্যত্র যাতায়াত হয়েছে কম নয়। কাজেই খুবই স্বাভাবিক যে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে মালিকপক্ষ কিছুটা আঁচ করেছে। চা বাগানে আত্মগোপন করে থাকার সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেও বস্তির অন্যান্য বাসিন্দারা কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন আগন্তুকের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। হয়ত ইউনিয়নের নেতাদের বা ছেলেদের চলাফেরায় গতানুগতিক দৈনন্দিন রুটিনের ব্যতিক্রম তাদের নজরে পড়ে, অথবা অন্য কি লক্ষণ থেকে টের পায় জানি না। ইচ্ছা করে ক্ষতি তারা কেউ কোনদিন করেনি, বা শত্রুপক্ষের কাছে খবর পৌছে দেয়নি। কিন্তু লোকের মুখে গল্পে এক কান থেকে অন্য কান হতে কথাটা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বাগানের নেতারা আবার কিভাবে যেন বস্তির মানুষদের এই কানে কানে কথার বিস্তৃতি এবং বিষয়বস্তুটা টের পান। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত বিবেচনায় অন্য একজনের ঘরে আমার ব্যবস্থা করেছেন।

সপ্তাহ দুয়েক ছিলাম এখানে। গত এক বছর ধরেই তো এক হিসেবে যাযাবরের জীবন চলেছে। দু-দিন কোথাও থাকি, তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা জমে ওঠে। আবার কাজের তাগিদে সেখানে থেকে যেতে হয়। মেহনতী মানুষের ঘরে ঘরে আমার জন্যে ঠাঁই আছে বটে। যাদের সঙ্গে হৃদ্যতা গভীর হয় তাদের কাছ থেকে বিদায়

নেবার সময় মনে হয়, আবার কবে দেখা হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায় ? আমাদের ব্যক্তিগত জীবন অনিশ্চিত। যাত্রার এই অধ্যায় কবে কোথায় কিভাবে শেষ হবে কে জানে ? যাদের ভাঙা ঘরে ছেড়া চট বা ময়লা কাঁথার বিছানায় শুয়ে দুঃখের সাথী হয়ে, "আত্মার আত্মীয়তা" গড়ে উঠেছে—তাদের অনেকের সাথেই বুঝি স্মৃতির রাজ্যের বাইরে আর দেখা হবে না।

শুধু কি মানুষের সঙ্গেই আত্মীয়তা জমে ওঠে ? মানবমনের এমন সব স্পর্শকোমল দিক আছে, যার প্রকাশ যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিচিত্র। এই ঘরে সারাদিন কেটেছে জেলখানার সেলের চাইতেও সংকীর্ণ পরিসরে বন্দী হয়ে। সূর্যের আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে খুব কম। খাটিয়ার উপরে শুয়ে থাকতে থাকতে যখন মনের লাগাম ছেড়ে দিয়েছি, সে ছুটে গেছে কার্শিয়ং শহরের রৌদ্রোজ্জ্বল পথে। "ঈগলস্ ক্র্যাগ" ডানহাতে ফেলে গিদ্ধাপাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে কল্পনার রথে চড়ে। গিদ্ধা পাহাড়ের কাছে পৌঁছনোর আগে কার্ট রোড যেখানে মোড় ঘুরেছে, সেখান থেকে তরাইয়ের বনভূমির একটি অতি মনোরম ছবি চোখে পড়ে। অন্ধকারে থাকতে থাকতে আলোকপিপাসু মন কল্পনার চোখে সেদিকে চেয়ে রয়েছে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে। অবচেতন মন ভেবেছে, কবে আবার এই বিচিত্র বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবো ? মনের সচেতন দিক বলেছে, অন্তত : এই ঘর ছেড়ে অন্যঘরে স্থান পেলেও বাঁচি। সেখানে আর কিছু না হোক, বেড়ার ফুটো দিয়ে বাইরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়োবে। সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হলে ঘরের পিছনে ভুট্টাক্ষেতটি ছিল আমার মুক্তবায়ু সেবনের জায়গা। বেশীর ভাগ দিনই সেই সময়টা চারদিকে বর্ষার ধূসর ফগে ঢাকা থাকত। কিন্তু কোন কোন দিন পেতাম মেঘমুক্ত আকাশের অভিনন্দন। সেদিন সতৃষ্ণ নেত্রে চেয়ে থাকতাম বহু উপরে ডাউহিলের বনচূড়ার দিকে। সেখানে আকাশের নীল আর বননীলে মেশামেশি হয়ে গেছে। কোনদিন

নীচে পশ্চিমের দিক থেকে আসত আমার জন্যে সুন্দরের উপহার। বালাসনের গর্ভ থেকে ধীরে ধীরে সাদা ধপ্‌ধপে মেঘের পুঞ্জ উপরে ওঠে। পূবের দিকে ধীর, নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে আসে তারা; ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের শিখর, গাছপালা, শ্রমিকের কুটির সবকিছু এক শুভ্র যবনিকার পিছনে ঢাকা পড়ে যায়। নিমেষে জুড়িয়ে যায় সারাদিনের ক্লান্তি।

তাই এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় সেই ছবিগুলি মনের পটে ভেসে উঠে তার স্পর্শকাতরতা যেন আরও বাড়িয়ে তোলে।

যে ঘরে গেলাম সেখানে দুদিনের বেশী থাকা হল না। এক সন্ধ্যায় কাছের বাগানে শ্রমিকদের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছি। রাতে ফেরবার সময় সরকারপক্ষের গুপ্তচর চা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। আমরা টের পাইনি, কিন্তু সে আমাদের গতি-বিধি টের পেয়ে গেছে। সেটা বোঝা গেল পরেরদিন বিকালে।

যে ঘরে আছি সেখানে দরজা বন্ধ করলে দিনের বেলায় রাতের মতো অন্ধকার। অতএব পড়াশুনা করবার কোনও উপায় নেই। এককোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি, আর মনে মনে দৈনন্দিন কাজের হিসাবনিকাশ পরিকল্পনা করি। তবু সময় কাটানো বড় দুষ্কর হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন কালের গতি আবার থেমে গেছে, ঠিক যেমন মনে হত তৃতীয় দশকের আগের সুদীর্ঘ দণ্ডিত বন্দীজীবনে। বন্ধ সেলের নিঃসঙ্গতায়, বেলা পড়ে আসছে টের পাই। মেয়ে শ্রমিকেরা আগে ঘরে ফেরে, গৃহকর্মের আয়োজনে নিযুক্ত হয়। এই ঘরের গৃহকর্ত্রীও ফিরেছে। পুরুষ শ্রমিকেরা কাজ থেকে ফেরেনি তখনও। হঠাৎ দরজার বাইরে পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজে সতর্ক হয়ে উঠি। কে যেন গৃহ কর্ত্রীকে কিসব জিজ্ঞাসা করছে, তার স্বামী কখন ফিরবেন, ঘরের ভিতর অন্য কোনও লোক আছে কিনা, ইত্যাদি কথার ভাবে বুঝি সেই লোকটি বাগানের চৌকিদার।

কম্বল শয্যায় নিঃশব্দে পড়ে থাকি। ভাবি হয়ত জিজ্ঞাসাবাদ

করেই চৌকিদার চলে যাবে, কিন্তু সে তো চলে যাবে বলে আসেনি। ঘরে অন্যলোক নেই শুনেও ভিতরে ঢোকে। গৃহস্বামিনী বাধা দিতে সাহস করে না।

চৌকিদার ঘরে ঢুকে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে, এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে লোক শুয়ে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করে কে শুয়ে আছে, গৃহস্বামিনী জবাব দেয় যে তার একজন আত্মীয়। চৌকিদার বলে, তাকে উঠিয়ে দাও। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। অগত্যা কম্বলের নীচে থেকে মাথা বার করতে হয়। চৌকিদার বলে, 'আপনি একটু দরজার কাছে আসুন'। আপত্তি করে তার সন্দেহ না বাড়িয়ে অভিনয় করে যদি এ-যাত্রা রেহাই পাওয়া যায় ভেবে যতটা সম্ভব শ্রমিকের অভিনয়ের চেষ্টা করি। কিন্তু দরজার কাছে আসতেই পরিষ্কার বোঝা গেল যে অভিনয় করে পার পাবার কোনও অবকাশ নেই। পুলিশ ঘর ঘিরে ফেলেছে, পুলিশবাহিনীর নেতা বলে, 'আমরা একজন সন্দেহজনক লোকের সন্ধানে এসেছি, আপনি এখানে নতুন এসেছেন, সুতরাং আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেব। ছেড়ে যা দেবে তা তো বুঝতেই পারি। যদিও দু-পক্ষের অভিনয় চলেছে, পুলিশও আমাকে বুঝতে দিতে চায়না যে তারা আমাকে চিনতে পেরেছে এবং আমার অভিনয়ে মোটেই বিশ্বাস করেনি। পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে আঙ্গিনায় পা দিই, তারপর মৃদু পদক্ষেপে রাস্তায় চলা শুরু করি, বাইরে তখনো রৌদ্রের রেশ মিলিয়ে যায়নি, সূর্যের আলো পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না এখান থেকে, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে এখন তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ মিলিয়ে গিয়ে বুঝি হাল্‌কা সোনালী রং ফুটে উঠছে, মনে মনে ভাবি, এত তাড়াতাড়ি বাইরের জগতের কাছে বিদায় নিতে হল। অসমাপ্ত কর্মভার পিছনে পড়ে রইল। একটা নিষ্ফল আক্রোশে অন্তর গর্জন করে ওঠে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিনি বলে নিজেকে গঞ্জনা দিই। আর কল্পনা করি যে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা কি ঘটতে

পারে না যার ফলে বন্দীদশার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?

অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই, নেতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে শ্রমিকেরা দল নিয়ে ছুটে আসে। সকলের আগে এসে পৌঁছায় 'মায়লা'। শান্ত নিরীহ মানুষটি হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। পুলিশকে বলে, "আমার অতিথিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছ কোন্ অধিকারে" ? তার সেই রুদ্রমূর্তি দেখে পুলিশেরা থমকে দাঁড়ায়, ইতিমধ্যে অন্যান্য শ্রমিকেরা এসে পৌঁছায়। লছমন্‌ছেত্রী আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে নীচের দিকে ছুটে চলে। পি. ডব্লিউ. ডি.'র রাস্তা ছেড়ে পায়ে চলার পথ ধরে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হয়। সে পথে একজন মানুষকে বয়ে নিয়ে চলা অসম্ভব, আমিও নেমে নিজের পায়ে হাঁটতে শুরু করেছি। কিন্তু নিরাপদ স্থানে না পৌঁছনো পর্যন্ত ছেত্রী নিশ্চিন্ত নয়। কম্‌রেডকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে তারা, তাই আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে।

চোরবাটো ছেড়ে মানুষের চলার সঙ্কীর্ণতম পথ ছেড়ে এমন সব জায়গা দিয়ে নিয়ে চলেছে যেখানে হয়ত সাধারণতঃ বন্য পশুরা যাতায়াত করে। নিজেকে সঙ্গীর হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে পথ চলি। কোথায় যাবো, কিভাবে যাবো সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি না, পাহাড়ী পথে পাড়ি দিয়েছি অনেক। কিন্তু এখন দেখছি যে পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কোথাও গাছের শিকড় ধরে ধরে সন্তর্পণে নীচের দিকে নামি, কখনো পায়ের নীচে থেকে কিছুটা আল্‌গা পাথর আর মাটি খসে খাদের দিকে ছুটে চলে, অসাবধান হলে আমাকেও তাদের সঙ্গী হতে হবে। অবশেষে একটি জায়গায় এসে ছেত্রী বলে, সামনের ঐ 'ওড়ার' দু-একদিনের জন্য আপনার বাসস্থান হবে।

'ওড়ার', অর্থাৎ পাহাড়ের গুহা। তবে এটি ঠিক গুহা নয়, পিছনে পাহাড়ের দেয়াল থেকে একটি অতিকায় শিলাখণ্ড বাইরের দিকে

বেরিয়ে এসেছে। তার নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ের হাত থেকে আশ্রয় সৃষ্টি হয়েছে। নীচেটা চার-পাঁচ হাত চওড়া সমান জায়গা, তারপরে তিনদিকে মনে হয় অতলস্পর্শী খাদ। সেখানে বসে উপরের দিকে তাকালে মনে হয় বুঝি কোন দানবের পাষাণ ছত্র পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়েছে। তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে, ছেত্রী আমাকে সেখানে বসিয়ে বাগানে ফিরে গেছে অবস্থা বোঝার জন্য, অন্ধকারে একলা বসে কত চিন্তা মনে আসে। ফেরারী নেতাকে শ্রমিকেরা পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সেজন্য অবিলম্বে তাদের উপর নেমে আসবে দমননীতির নিষ্ঠুর রথচক্র। তাকে ঠেকানোর কি উপায় করা যাবে?

যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে তারা ভরা আকাশের এক টুকরো চোখে পড়ে। দূর থেকে কানে আসে কোন ঝর্‌নার উদ্দাম উচ্ছ্বাস।

আমাকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে বহুক্ষণ পর্যন্ত বাগানে একটা কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সেটা এখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কি হচ্ছে সেখানে—খবর পাওয়ার জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করি। কাছে কোনও শব্দ শুনলে মানুষের পদশব্দ ভেবে অপেক্ষা করি এই বুঝি বন্ধুদের কেউ এল। নীচে থেকে গাছ-পালা ঝোপের মধ্য দিয়ে একটা খস্‌খস্ শব্দ ক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। এতো মানুষ নয়, সেদিকে টর্চের আলো ফেল-তেই শব্দটা হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ডানপাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সেই শব্দ উপরে উঠতে থাকে, আবার সেদিকে আলো ফেলি এবং দু-এক খণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারি। কেননা এ কোনও বন্যপশুর শব্দ, আবার কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, তারপর হঠাৎ খুব কাছেই শব্দ শুনে টর্চের আলো ফেলে দেখি ঝোপের নীচে একটা ছোট্ট হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। ওর অধ্যবসায় দেখে অনুমান করি যে ওরই রাতের আশ্রয় আজ আমি বে-দখল করেছি। আলো দেখে বেচারা হতাশ

হয়ে অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যায়। মনে মনে ওর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। পরিস্থিতিটা সবদিক দিয়েই নাটকীয় হয়ে উঠেছে। তবে এ নাটক অভিনীত হচ্ছে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে, সংগ্রামী জনতার দৃপ্ত পদক্ষেপে হচ্ছে তার উদ্বোধন।

একে একে ছেত্রী, মায়লা, কিশোর ছেলে বীরবাহাদুর আরও অনেকে এসে হাজির হয়। প্রথম এসেছে বীরবাহাদুর, আমার জন্যে খাবার নিয়ে। ময়লা কাপড়ে বেঁধে আনা ভাত। প্রথমটা খেতে প্রবৃত্তি হয় না। তারপর মানসনেত্রের সামনে দু তিন বছর আগের একখানি ছবি ভেসে ওঠে। শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ির দিন। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি চটকল এলাকায় গিয়েছি। সঙ্গী বন্ধু নিয়ে গেলেন শ্রমিক বস্তির ভিতরে একটি চায়ের দোকানে। তিনদিক মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, উপরে খোলার চালা। কয়েকটি বেঞ্চি পাতা। দেওয়ালে অপটু হাতে আঁকা ছবি, 'খেজুর গাছ', 'চাঁদ-তারা', এবং তার পাশে 'কাস্তে-হাতুড়ি'। দোকানের মালিক রহমান হাস্যকৌতুকের মাঝে সবাইকে এক-এক কাপ চা এগিয়ে দিচ্ছে। হাতল ভাঙা, রংচটা, ময়লা কাপ। দেখে চা খেতে অপ্রবৃত্তি হচ্ছিল। ভাবছি বলব যে চা খাব না। কিছু বলার আগেই রহমান আমার দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে; "স্তালিনের নামে চা দিলাম।" মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে গেল। অপ্রবৃত্তি গেল কোথায় মিলিয়ে। কম্‌রেডের দেওয়া চা যেন পরিণত হল অমৃতে। তারপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত খুঁতখুঁতে ভাব কাটিয়ে চা-শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছি। তাই ময়লা কাপড়ে বাঁধা ভাত খেতে যে অপ্রবৃত্তি হচ্ছিল, তা শুধু নিমেষের জন্য। তখনই মনে পড়ল যে, দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও এরা কম্‌রেডকে খাওয়ানোর কথা ভুলে যায়নি। এ ভাত তো শুধু ভাত নয়, এর মধ্যে দিয়ে যে মূর্ত হয়ে উঠেছে ওদের হৃদয়ের অমৃত প্রস্রবণ।

দুর্যোগ নেমে এসেছে বৈকি আজ ওদের মাথার উপরে। ছেত্রী

খবর নিয়ে এসেছে বাগানে দুশো পুলিশ আমদানী করা হয়েছে দার্জিলিং এর পুলিশ লাইন থেকে। তাদের সবার মাথায় লোহার টুপি, অর্থাৎ শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে তারা। নেপালী পুলিশদের উপর পুরো বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে জেলা কর্তৃপক্ষ জলাপাহাড় থেকে মারাঠী সৈন্যও আমদানী করেছে। তারা কাল ভোরে শ্রমিক বস্তির উপর হামলা শুরু করবে।

রাতের অন্ধকারে গুপ্তচরের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বাগানের নেতাদের অনেকেই এসে উপস্থিত হন। পুলিশ এবং মিলিটারি যদি অত্যাচার শুরু করে, তাহলে উপায় নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণাসভা বসে সেই গুহারই মধ্যে, মাথার উপরের সেই পাষাণছত্রের নীচে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু ছাতার আশ্রয়ে বৃষ্টির হাত থেকে নিরাপদে আছি। মন তখন খুব উদ্বিগ্ন, চরম গুরুদায়িত্ব মাথার উপর। এতগুলি লোক নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তারাও নিজেদের মতামত বলবে, কিন্তু শৃঙ্খলার প্রতি এত আনুগত্য এদের, যে নেতার মুখের একটি কথায় দারুণ বিপদের সামনে অসঙ্কোচে এগিয়ে যাবে। জীবনে এতবড় দায়িত্বের সম্মুখীন হইনি কখনও। শ্রমিকদের মতামত সযত্নে সহিষ্ণুভাবে শুনি। অনেক পরামর্শ হয় তাদের সঙ্গে। তাদেরই প্রস্তাবে ঠিক হয় আশেপাশের অন্যান্য সংগঠিত বাগানে শ্রমিকদের খবর দেওয়া হবে। তারা প্রতিবাদ ধর্মঘট করে কাজ ছেড়ে এখানে আসুক। তারা এসে পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে কার্শিয়ং শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করুক। তাহলে সিঙ্গেলের শ্রমিকরাও প্রতিবাদ ধর্মঘট করতে সাহস পাবে।

চা-শ্রমিক আন্দোলনে তখন যে অবস্থা চলছে, তাতে অন্য বাগানে খবর দিলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসবে, এ আশা করার কোনও ভিত্তি ছিল না। কিন্তু তখনও পরিস্থিতি পুরো উপলব্ধি করতে পারিনি। তাছাড়া আকস্মিক ঘটনার চাপে

শান্তভাবে অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষমতাও অক্ষুণ্ণ ছিল না।

পরামর্শের পর বাগানের নেতারা একে একে চলে যান। কিশোর কর্মী বীরবাহাদুরকে রেখে যান আমার পাহারায়, যদি কোন কাজে লাগে বা এদিকে অতর্কিতভাবে কোনও বিপদ উপস্থিত হয়। রাতের জন্য একখানা কম্বল দিয়ে যেতেও তারা ভোলে না। তাদের জীবনের এই প্রথম দারুণ সঙ্কটের মধ্যেও আমার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি শ্রমিক সঙ্গীদের প্রখর দৃষ্টি অন্তরকে গভীরভাবে বিচলিত করে। ধুলোর উপর আধখানা কম্বল বিছিয়ে বাকি আধখানা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ি। বীরবাহাদুর বলে, 'আমি জেগে বসে থাকব'। সেই অদ্ভুত শয্যায় শুয়ে সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ঘুম যখন ভাঙে তখন চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে। বৃষ্টি নেমেছে শেষ রাতে। ঠাণ্ডার প্রকোপ সইতে না পেরে বীরবাহাদুরও কখন এসে আমার কম্বলের নীচে ঠাঁই করে নিয়েছে। ওর ঘুমে কাতর কচি মুখের দিকে চেয়ে বড় মায়া হয়। কবে, কতদিন পরে এদের জীবনে দুঃখ-নিশার অবসান হবে ?

ঘুম ভাঙতেই বাগানের অবস্থা জানার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এতক্ষণ সেখানে কি হচ্ছে কে জানে ? কিছুক্ষণ পরে গুহার একটু দূরে বাঁ হাতে ঘাসের ঘন ঝোপ নড়ে ওঠে। কে যেন সন্তর্পণে এদিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল আমাদেরই কর্মী। তার কাছে কিছুটা জানা গেল। পুলিশ সারারাত উপরে অপেক্ষা করেছে। তারপর ভোররাতে যখন বৃষ্টি নেমেছে, সেই সময় দলবদ্ধ-ভাবে এগিয়ে এসে বস্তিগুলি ঘিরে ফেলে। যে দুটি বস্তিতে আমাদের কর্মীরা বেশীরভাগ বাস করে, তার প্রত্যেকটি ঘর তল্লাশী করে। পুরুষ যাকেই সামনে পেয়েছে, প্রায় তাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। তবে আনন্দের কথা যে বাগানে নেতাদের বেশীর ভাগই পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

একটু পরে মায়লা এসে পৌঁছায়। তার কাছে পাওয়া যায় আরও বিস্তৃত বিবরণ। শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের মারপিট এবং পুলিশের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে।

যখনই কোন বাগানে গণ্ডগোল হয়, সেখানে দীর্ঘদিনের জন্য পুলিশ মোতায়েন হয়, এবং ইউনিয়ন কর্মীদের উপর নানারকম হয়রানি চলে। সুতরাং পুলিশ ও মিলিটারি সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে বাগানে একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘট করাতে হবে। নতুবা এই সরকারী হামলার পর থেকে বেশ কিছুদিন এখানে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন এবং সংগঠন চালানো কঠিন হবে। কিন্তু এদিকে বেলা চড়ে যায়, অথচ অন্য বাগানের শ্রমিকেরা এসে পৌঁছায় কই? যে যে পথে তারা আসবে সে সব পথের মোড়ে আমাদের লোক অপেক্ষা করছিল। ক্রমে ক্রমে তারাও হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ঠিক করেছি সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাগানের বস্তিতে ঢুকে শ্রমিকদের সাথে দেখা করব। কিন্তু সন্ধ্যা হতে বহু দেরী। মন তো এখানে নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তায় বসে থাকতে রাজী নয়। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সে শ্রমিকদের মাঝে ছুটে যাওয়ার জন্য ছট্ফট্ করে। বনের মধ্যে ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বিরাট নিস্তব্ধতা। এত নিস্তব্ধ, মনে হয় যেন পৃথিবীর বাইরে চলে এসেছি। মনে একরকম মোহ বিস্তার করে। ভাবি, এতক্ষণে হয়ত পুলিশ বাগান ছেড়ে চলে গেছে। যাই না কেন বাইরে?

গরুর জন্য ঘাস কাটার অছিলায় ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে বুড়ী ভাত আর জল নিয়ে এসেছে। খাওয়ার পর বুড়ী বলে, "শুনে এসেছি যে পুলিশ শিকারের অছিলায় এই দিকে খোঁজ করতে আসবে। হয়ত তোমার গোপন স্থান গুপ্তচরেরা টের পেয়ে গেছে। অতএব, এখনি এখান থেকে চলে যাও।"

অগত্যা রাতের আশ্রয় ছেড়ে রওনা হতে হল আর এক আশ্রয়ের দিকে। গন্তব্যস্থল হল বাগানের নীচে পাহাড়ের আর একটি গুহা। রাতে শ্রমিক বস্তিতে ঢুকব, কিন্তু দিনের বেলাটা কোন রকমে নিরাপদে কাটাতে হলে আর স্থান কোথায়? পথ চলা শুরু করি, সঙ্গে মায়লা আর বীরবাহাদুর। তবে তাকে পথ বলা ভুল হবে। কাল সন্ধ্যা থেকেই তো "অ-যাত্রা পথের যাত্রী" হয়েছি। আগের দিনের ঘটনার পর তল্লাট জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়েছি যে পুলিশ আমাদের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। তাই বড় রাস্তা কেন, মানুষের চলার রাস্তা ছেড়ে নীচের দিকে অগ্রসর হই। বহুদিন পরে দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে খোলা আকাশের নীচে এমনি-ভাবে ঘুরছি। যে কোনও মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা আছে। যে-সব শ্রমিকেরা ধরা পড়েছে তাদের জন্য মন উদ্বিগ্ন। বাগানের পরিস্থিতি জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। রাত থেকে ভালো করে ঘুম হয়নি, খাওয়া হয় নি। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে আছে। তবু পরিস্থিতির নতুনত্ব যেন পাহাড় ভাঙার উৎসাহ যোগায়। সঙ্গে দুজন বিশ্বস্ত সঙ্গী। বিপদের আগুনে এদের নিষ্ঠার যাচাই হয়ে গেছে। ওদের মাথার উপর চিন্তার পাহাড় নেমে এসেছে। ওদের পরিবারের ব্যবস্থা কি হবে? ওরা নিজেরা ধরা পড়ুক, বা পুলিশকে এড়িয়ে গোপনভাবে চলাফেরা করুক—যে কোনও ক্ষেত্রে মালিক ওদের কাজ থেকে বরখাস্ত করবে। হয়ত ওদের পরিবারের উপর বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটিশ আসবে। কয়েকদিন আগেই তো মায়লার শ্বাশুড়ীর মকাই ক্ষেত ম্যানেজারের অনুচরেরা তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে। কিন্তু এত বিপত্তির মধ্যেও আমার সুবিধা অসুবিধার জন্য ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বারবার মুগ্ধ হই। অন্তরে অনুভূতির গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত যে আলোড়ন জাগে, তাকে প্রকাশ করবার ভাষা কই?

আবার তেমনি গাছের শিকড় ধরে ঝুলে নীচের দিকে নামি।

কোথাও ছোট্ট খাদের মত ব্যবধান সামনে পড়ে। দু-পাশের পাহাড়ের ঘন ঘাসের ঝোপ দু-হাতে আঁকড়ে ধরে খাদ ডিঙিয়ে যেতে হয়। পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে খাড়া নীচের দিকে নামতে শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। মনে হয়, কপালে যাই থাকুক না কেন, পথের ধারে কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু শোবোই বা কোথায়? শোয়ার মত সমতল স্থান খুঁজে বার করতে হলেও বেশ কিছু পথ চলতে হবে। যেখান দিয়ে চলেছি তার ঠিক নীচে ডান হাতে নেয়োর ঝরনা ছোট্ট উপত্যকাটিতে নেমে নেয়োর নদীতে পরিণত হয়েছে। এগিয়ে চলেছে বালাসনের দিকে। ওপারের পাহাড়ের গায়ে নদীতীরে অজস্র সাদা সাদা ধুতুরা ফুল ফুটে আছে। মায়লা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, ফটো তোলার পক্ষে সুন্দর জায়গাটি।

আমাদের চলার গতি একজায়গায় এসে রুদ্ধ হয়ে গেল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে পা রাখতে গেলে আল্‌গা বালি ও পাথর খসে পড়ে। ডানদিকে হাতখানেক পরে শূন্যতা, তবে সীমাহীন নয়, কারণ তার নীচের দিকটা শেষ হয়েছে নেয়োর গর্ভে। মায়লা আর বীরবাহাদুর কুক্‌রী দিয়ে পাহাড়ের গায়ের আলগা বালু আর পাথরের স্তর কেটে কেটে পা ফেলার জায়গা করে। এক একটি পদক্ষেপ অগ্রসর হওয়ার পর কিছুক্ষণ পাহাড়ের গায়ের কোন গাছের শিকড় বা ছোট বৃক্ষকাণ্ড ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সঙ্গীরা খানিকটা পথ কাটার পর আবার অগ্রসর হই। এইভাবে কিছুদূর এগোনোর পর খানিকটা বসার মতো জায়গা পেয়ে তিনজনেই ক্লান্তি দূর করতে বসে পড়ি। মায়লা যুদ্ধফেরত লোক, হেসে বলে, "কম্‌রেড্ তোমার জন্য আজ স্যাপারের (sapper) কাজ করলাম।" বিশ্রামের পর আবার যাত্রা। সৌভাগ্যক্রমে কাছেই একটা গুহা পাওয়া গেল। এটি সত্যিই গুহা, ভিতরে জন তিনেক শোয়ার মত প্রশস্ত স্থান, কিন্তু উচ্চতা বড়ো কম, বসে থাকা চলে না, প্রবেশ পথে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। বৃষ্টি নামলে অথবা সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি দেখলে

ভিতরে ঢোকা যাবে ঠিক করে তিনজনে গুহামুখে কম্বল বিছিয়ে বসি। মায়লা বলে, "আজ রাত কোথায় কাটাব, কি খাব কে জানে।" বীরবাহাদুর বয়সে অল্প হলেও বেশ রসবোধ আছে। বলে, খাওয়ার ভাবনা কি! সরকারী ভাত তো তৈরী আছে আমাদের জন্যে।" সন্ধ্যা নাগাদ উপরের দিকে চলা শুরু করি। সারাদিনের ক্লান্তির ফলে চড়াই পথ অতিক্রম অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বসে জিরিয়ে নিতে হয়। সিঙ্গেল বাগানের সীমানায় লছমন ছেত্রীর সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুনি, বিকেলে পুলিশ আর এক দফা বস্তিতল্লাশী করে গেছে। ছেত্রী আমাকে বাগানে ঢুকতে নিষেধ করে। বলে, "এখানে এখন ধর্মঘটের চেষ্টা সফল হবে না। যদি অন্য বাগানের শ্রমিকদের সমর্থন পাওয়া যেত, তাহলে অন্যরকম হত। মিছিমিছি আপনি বিপদের ঝুঁকি নেবেন, ধরা পড়ে গেলে আমরা কাণ্ডারীহীন হয়ে পড়ব"। পীড়াপীড়ি করাতে বলে, "বীর-বাহাদুর আগে আরও দু-একজন সাথীকে ডেকে আনুক। পৃথ্বীমান আসুক। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন। তার আগে বেড়াজালের মধ্যে পা বাড়াবেন না।" তাই স্থির হয়। নিরাপত্তার জন্য রাস্তা ছেড়ে চা-ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসি। অন্ধকারে চলা। অতএব আবার ছেত্রীর হাত ধরে নীচের দিকে চলি।

আধ ঘণ্টা পরে প্রথমে পৃথ্বীমান এবং পরে আর দু-একজন এবং সবার শেষে বীরবাহাদুর এসে পৌঁছায়। সবাই পৃথক পৃথক ভাবে, অতিসন্তর্পণে এসেছে যুদ্ধক্ষেত্রের স্কাউটদের মত। পৃথ্বীমান আসার সময় কিছুটা ভাত কাপড়ে বেঁধে আনতে ভোলেনি। একজনের ভাত চারজনে ভাগ করে খাই। বীরবাহাদুর খবর আনে যে পুলিশ আবার বস্তি ঘিরতে আসছে। এক বস্তি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার মুখে পাহারা বসেছে। তারাও হয়ত অনুমান করেছে যে রাত্রে শিকার জালে পড়বে। চা-ঝোপের নীচে সবাই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। চাঁদ ওঠেনি

এখনও, সূচীভেদ্য অন্ধকার। চা-ঝোপের পাতার গুচ্ছ, আর ঝোপের নীচেকার ঘাস শিশিরে ভেজা। একে অন্যের মুখ দেখতে পাই না। অমনিভাবে শুয়ে পরামর্শ করি। বাগানে না ঢোকাই ঠিক হয়। পৃথ্বীমানদের সাবধানে থাকার নির্দেশ দিই, ধরা পড়লে চলবে না। তাহলে শ্রমিকেরা নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়বে। আমাদের রাত্রি যাপন ঠিক হয় দু-মাইল নীচে অন্য বাগানের একজনের ঘরে। কাল সন্ধ্যার আগে আর দেখা হবে না। দেখা হবেই, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিমধ্যে কে সরকারী অতিথি হবে কে জানে।

রাত্রি অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পরে মায়লা আর ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নীচের দিকে নামি। পাহাড়ে যতবার উপর থেকে অনেক নীচে নেমেছি, তখনই মনে হয়েছে বুঝি পাতালের দিকে চলেছি। আজ সে অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। অন্ধকারের সমুদ্র পাড়ি-দিয়ে কোথায় যে চলেছি তার যেন ঠিকানা নেই। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আধা জাগা আধ চেতন অবস্থায় কতদূর যে অতিক্রম করি তার ইয়ত্তা নেই। এই চলার কি শেষ হবে না।

যে ঘরে পৌঁছাই, সেখানে দু-একজন সঙ্গী আগে থাকতে উপস্থিত আছে। কাল রাতে যাদের অন্য বাগানে খবর দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল, জানা যায় যে তারা সাবধানে ঠিকমতো খবর পৌঁছাতে পারে নি। ঘরের মালিক ইউনিয়নের সভ্যও নয়, ছেত্রীর আত্মীয়, সে ঘটনার বিবরণ শুনতে চায়, মায়লা সমস্ত বৃত্তান্ত শোনানোর পর মন্তব্য করে, "নেতা হল আমাদের চোখের মত, না থাকলে আমরা অন্ধ। তাই আমাদের স্বার্থে সব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নেতাকে রক্ষা করতে হয়"।

সবাই মেজের উপর শরীর এলিয়ে দিই। রাতের আঁধার কাটার আগে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে, নিশুতি শেষ রাতে ঘুমের মায়া কাটিয়ে উঠতে হয়। এবার ছেত্রীদের কাছেও বিদায় নিতে হল, সবাই একসঙ্গে থাকাটা খুব ভুল হবে। আমি আর মায়লা এক পথের

পথিক হই, একটা ঝরনায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে 'ওড়ারের' সন্ধানে ঘুরি। হাত পা ছড়িয়ে শোয়ার মত 'ওড়ার' ভাগ্যক্রমে তাড়াতাড়ি জুটে যায়, কম্বল বিছিয়ে শোয়া মাত্র যেন কাল ঘুম এসে ঘিরে ধরে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি কে জানে। মায়লার ডাকে ঘুম ভেঙেদেখি সে কোথা থেকে কিছুটা চিঁড়ে আর বাঁশের খোলে করে ঝরনার জল সংগ্রহ করে এনেছে, তা দিয়ে দুর্জনের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। এবার মায়লার ঘুমোনোর পালা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অস্ফুট স্বরে কত কথা বলে, বোঝা যায়, ওর মনের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য কতটা উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, আর অস্বস্তি পুঞ্জীভূত হয়ে অছে। কিন্তু সেটুকুই সব নয়, ঘুমের মধ্যে অস্ফুট কণ্ঠে গান করে, "ইয়ে জঙ্গ হ্যায় মজদুরোঁ কি, মজলুমো কি, দহকানোঁ কি—মজুবুরো কি"। ওর অবচেতন মনের অভিব্যক্তিকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। বলি, "সর্বহারা বাহিনীর একনিষ্ঠ সৈনিক। তোমাকে নমস্কার"। নিজে সময় কাটানোর জন্য অতিপরিচিত অভ্যাসের আশ্রয় নিই—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আপন মনে আবৃত্তি করি। নির্জন বন, আর ততোধিক নির্জন গুহা, সুতরাং নির্ভয়ে আবৃত্তি* করি, কল্পনায় অতীতের বহু স্মৃতির টুকরোর উপর রংয়ের তুলি বুলিয়ে রচনা করি কত কাহিনী।

সূর্যালোক যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন যাত্রা করি উপরের দিকে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নামে। যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সেই নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করি। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পরও কেউ আসে না দেখে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি। খবর নিতে পাঠাব কাকে ? মায়লা যেতে চায়, কিন্তু তাকে যেতে দিতে পারি না।

---

*"ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোলে হাসের কলোচ্ছ্বাসে,
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা,
ভস্মে ঢাকা অঙ্গারের থেকে
তারা আকাশ বাণীকে ডেকে আনে প্রকাশের তপস্যায়"।

ও যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে এখানকার শ্রমিকদের সাথে আমার শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশেষে বুড়ী আসে। খবর বড় ভালো নয়। পৃথ্বীমান, বীরবাহাদুর প্রভৃতি যে দু-চারজন প্রথমে পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল, তারা ধরা পড়ে গেছে। ছেত্রীর খবর বলতে পারে না। এই তল্লাটের সমস্ত প্রবেশ এবং নির্গমন পথে, আশেপাশের বাগানে ঢোকার মুখে সশস্ত্র পাহারা বসে গেছে। আমার পক্ষে আর এই অঞ্চলে থাকা মানে নিশ্চিতভাবে গ্রেপ্তার বরণ করে নেওযা। হতাশাজনক খবরের মধ্যে একটু আশার আলোকরেখা আছে। মেয়ে শ্রমিকেরা এগিয়ে এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের পরিজনের খোঁজ খবর নেওয়া, পৃথ্বীমানের প্রসূতি স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, সমস্ত ভার তারাই মাথায় তুলে নিয়েছে।

বেশ বুঝতে পারছি যে কিছুদিনের মত এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে। মায়লা এবং ছেত্রীকেও সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু আপাততঃ সবচাইতে বড় প্রশ্ন কোথায় যাব? যাবই বা কি করে? চলার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আজ উপরে ওঠার সময় উঠেছি একটি শুকনো ঝরণার ধারাপথ বেয়ে। তাতেই গেছে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে। অন্ধকারে এক-পা চলার উপায় নেই। মায়লা রাগ করে বলে, "তুমি আগের সন্ধ্যায় নেওর বাগানে চলে গেলেই ভালো হত।" বে-পরোয়া হয়ে ঠিক করি কোথাও শোওয়ার মত একটু সমতল জায়গা খুঁজে নিয়ে রাতটা তো ঘুমিয়ে নিই। তারপর উঠে পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। শোওয়ার মত জায়গা মেলে একটি ঝরণার জলধারার পাশে। নিরূপায়। সেখানেই বর্ষাতি বিছিয়ে দুজনে এক কম্বল গায়ে শুয়ে পড়ি। আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখনও পাহাড়ে বর্ষা শুরু হয় নি। ভোর হতে লোক-চলাচল শুরু হওয়ার আগে আশ্রয়ের সন্ধানে দুজনে যাত্রা করি। কিছু দূরে মায়লার পরিচিত একজন শ্রমিকের ঘর আছে সেটারই উদ্দেশ্যে। যে বাগানটির মধ্যে দিয়ে চলেছি বর্তমানে সেখানে

আমাদের কোনও সংগঠন নেই, শ্রমিকটিও আমাদের কর্মী বা ইউনিয়নের সভ্য নয়। তবু চলেছি এই ভরসায় যে আর যাই হোক্, পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেখা গেল যে আশ্রয় বলতে সারা দিন বনে কাটাতে হবে। গৃহস্বামীর ঘরে সারাদিন নানারকমের লোক আসে। অগত্যা বনেই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়তে হল। গৃহস্বামিনী শুকনো চিঁড়ে আর ফীকা চা দিয়ে গেলেন। এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ছেত্রী আর কান্‌ছার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারাও এসেছে আশ্রয়ের খোঁজে। ছেত্রী বলে, "কম্‌রেড্, আপনি এবার কোন নিরাপদ স্থানে চলে যান। নতুবা এখানে থাকতে গেলে আপনার যা অবস্থা হয়েছে তাতে আপনিও ধরা পড়ে যাবেন, আর আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরাও ধরা পড়ে যাব।" কথাটা খুবই সত্যি মনে হল। তাই সিদ্ধান্ত করি যে ধজে বাগানের নেতাদের কাছে খবর পাঠাব, যদি তারা আশ্রয় দিতে পারে, এবং এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পরে খবরের জবাব এল যে তারা ব্যবস্থা করতে পারবে, দুটোরই। সারা দিন ঘুমিয়ে কিছুটা ক্লান্তি দূর করে নিই। "সন্ধ্যার পর ঘন অন্ধকার ভেদ করে "অযাত্রা পথে" চলা শুরু হয়। সঙ্গী আছে মায়লা। বিদায় নেওয়ার সময় ছেত্রী আর কান্‌ছার চোখ দুটি ছলছল করে। মায়লাকে ডেকে বলে, "কম্‌রেডকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে পেরেছ কিনা সে খবর যেন অবশ্য অবশ্য পাই।" ওদের এই দরদের উপযুক্ত উত্তর কি বলে দেব তার ভাষা খুঁজে পাই না। শুধু নীরবে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে অভিনন্দন জানাই।

পিছনে পড়ে রইল সিঙ্গেল বাগান। তার সঙ্গে পিছনে ফেলে গেলাম আমার জীবনের একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অভিজ্ঞতার অপূর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ অধ্যায়। মনে হয় যেন অনেক কিছু, বহু প্রিয়জন, বহু প্রিয়স্মৃতি পশ্চাতে পড়ে রইল। এইভাবে কত অধ্যায়, কত ঘটনাকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলে ইতিহাসের রথ। সেই রথচক্রের রেখা

ধরে এগিয়ে চলেছি। হয়ত সামনের অধ্যায়ে আমার গতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে দুর্বার বেগে। তার উদ্দেশ্যে বলি, "তোমার যাত্রা বাধা মানিবে না, কোথাও রবে না থামি।"

ততক্ষণে আকাশ জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয়ে গেছে। ফগের লেশমাত্র নেই কোনখানে।

আলো ছায়ায় বিচিত্র রেখাঙ্কিত বনপথ ধরে এগিয়ে চলি। সংকেত স্থানে পৌঁছে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দিনের আলোর মত উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে নামচু উপত্যকার শোভা মায়াজাল বিস্তার করে। নাগরী ভাঁড়ার চূড়ায় সাদা মেঘের পুঞ্জ দেখা যায় এখান থেকে। আমরা পাহাড়ের যে বাহুটির প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, সেটি হল পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। তার সমান্তরালভাবে আর একটি বাহু উপত্যকার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে গেছে। নেয়োর নদী সেই বাহুটির পাদমূল বেষ্টন করে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ প্রকাণ্ড বাঁক নিয়ে বালাসনের অভিমুখী হয়েছে। নদীর ফেনিল শুভ্র উচ্ছ্বাসে চাঁদের কিরণ শত টুকরোয় চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। উপত্যকার নিবিড় বনরাজিকে এখান থেকে সবুজের বন্যা বলে ভ্রম হয়। মনে পড়ে যায় এমনি আর এক জ্যোৎস্না মদির রাতের কথা। সেদিনও লছমন ছেত্রী সঙ্গে। কার্শিয়ং ছেড়ে উত্তরের দিকে একটু এগিয়ে কার্ট রোড ছেড়ে খরবস্তির পথ ধরি। জলসিঞ্চিত এলাচ ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলি ফাজী উপত্যকার দিকে। ফাজীতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাওয়ার হাউস আছে। এখান থেকেই কার্শিয়ং শহরে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা হয়। একটি ঝরণার গতিকে পরিবর্তিত করে সেখানে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে। হ্রদের উপরতলায় একটা ঢালু পুকুরের মতো জায়গায় ঝরণার জলরাশি এসে কেন্দ্রীভূত হয়। সেখান থেকে সেই জলরাশি দুর্দম বল্লাছেঁড়া আক্রোশে নীচের হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না-

রাতে বন্দিনী গিরিনন্দিনীর সেই দুর্দান্ত জলপ্রপাত, ভীষণ অথচ অপূর্ব সুন্দর দেখায়।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বিগত কয়েকদিনের কষ্ট আর ক্লান্তি জুড়িয়ে নিই। ইতিমধ্যে বন্ধুরা এসে পড়ে। নামচু উপত্যকায় বালাসনের উপর ঝোলানো পুল আছে। সেখান থেকে একটি রাস্তা গেছে মিরিকের এবং আর একটি নাগরীর পথে, পুলের মুখে পাহারা থাকতে পারে। শ্রমিক বন্ধুরা পুল এড়িয়ে জঙ্গলের পথ ধরে আমাদের নিয়ে চলে। বিপদের সম্ভাবনা ছেড়ে অনেকটা দূরে গিয়ে হেঁটে বালাসন পার হই। পাহাড়ী নদীতে এই সময়টা জল বেশী থাকে না, তবে স্রোত খুব প্রখর। ওপারে পৌঁছে চড়াই ভাঙতে হয়, আজ অবশ্য চড়াই পথের শেষে রয়েছে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়।

সে রাতে ধজে বাগানে ঢোকা হল না। আমার সঙ্গীরা বালাসন পার হওয়ার জন্য যে পথটি বেছে নিয়েছে সেটি এদিককার লোকেরা বড় একটা ব্যবহার করে না। যেখানে এসে পৌঁছাই সেটি ধজে কম্‌রেডদের নির্দিষ্ট স্থান নয়। অন্ধকারে পথের সন্ধান করতে আরো বিপাকে পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে এখানে পাহাড়ের গায়ে একটি স্বল্পপরিসর সমতল অংশ রয়েছে। জায়গাটির ঠিক উপরে একটি প্রকাণ্ড পাথর আচ্ছাদনের মত রচনা করেছে, আজও শিলাছত্রের নীচে ঘুমিয়ে পড়ি ভোরের প্রতীক্ষায়।

সকাল হতে মায়লা আমাকে অপেক্ষা করতে বলে রওনা হয় বাগানের দিকে, বেশ কিছুক্ষণ পরে রণবীর রাই এসে উপস্থিত হয়। ধজে বাগানের প্রধান নেতা, চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সমিতির সভ্য, পার্টির জেলা কমিটিরও সভ্য। তার সঙ্গে আগে থেকেই ভাল পরিচয় ছিল। লোকটি খুব কম কথা বলে, ভাল সংগঠক এবং নিষ্ঠাবান কর্মী বলে পরিচিত, কিন্তু এবার তার যে দিকটির পরিচয় পাই সেটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমাকে দিনের বেলাটা

এখানেই কাটাতে হবে। তাই রণবীর সঙ্গে করে এনেছে ভাত, তরকারী, বোতলে দুধ। খাওয়া শেষ হলে বাড়িয়ে দেয় এক প্যাকেট "নাম্বার টেন" সিগারেট। এই ছোট্ট জিনিসটিই আমাকে অভিভূত করে ফেলে। রণবীর নিজে ধূমপান করে না। সে জানে আমি করি, তাই সযত্নে সিগারেটের প্যাকেটটি সংগ্রহ করে এনেছে। কম্‌রেডের প্রতি দরদের এরূপ নীরব, অথচ মুখর অভিব্যক্তির পরিচয় বারবার পেয়েছি চা-বাগানে আত্মগোপনের দিনগুলিতে।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ধ্যায় আবার রণবীর আসে, রাতের মত থাকার ব্যবস্থা তারই ঘরে, মেঝেতে চওড়া বিছানা পাতা। কম্বলের উপর একখানা বিছানার চাদর। এটি আমার জন্যই বিশেষভাবে জোগাড় হয়েছে। এরাত' চাদর ব্যবহার করে না। কয়েকদিন পর এমনভাবে হাত পা ছড়িয়ে পরম নির্ভাবনায় শুতে পাবো সে কথা গতকাল এমনি সময়ে কল্পনাও করিনি। খাওয়ার পাট চুকে যেতেই ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ি।

সকালে ঘুম ভাঙতে রণবীর সঙ্গে করে নিয়ে যায় কুটির থেকে একটু দূরে গাছপালায় ঘেরা একটি ঝরনার কাছে, প্রকৃতির তাগিদ সেখানেই মিটিয়ে নিই। রণবীর বলে দিনের বেলাটা আজও এখানে কাটানো ভালো, সিঙ্গেলের পলাতকেরা এই বাগানে আশ্রয় নেবে অনুমান করাটা পুলিশের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। ধজে আমাদের সংগঠনের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি। ঝরনার কাছাকাছি গাছপালায় ঢাকা আর একটি জায়গা রয়েছে, উপবন বলা চলে, সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে শোওয়া চলে। রণবীর একটা কম্বল এনে পেতে দিয়ে যায়। গত কয়দিন খোলা আকাশের নীচে কাটালেও প্রকৃতির সৌন্দর্য মন ভরে উপভোগ করার মত অবস্থা ছিল না। আজ ত' দুশ্চিন্তা নেই। ব্যবস্থাটা ভালই লাগে, আরামের আমেজ আছে, গোটা বালাসন উপত্যকা চোখে পড়ে এখানে বসে, উত্তরে বালাসনের উপরে প্রধান পুল। ঐ পথ দিয়েই ত, প্রথমবার এখানে এসেছি। পূর্তবিভাগের বাঁধানো সড়ক ধরে এগিয়ে এসে পুলে উঠতে হয়। পার হয়ে আবার সেই সড়ক, ওপারে মুণ্ডা বাগানের ঘরবাড়ী দেখা যায়। ধজে বাগানের পথঘাট, শ্রমিক বস্তীর কুটির সবই চোখে পড়ে, সামরিক ভাষায়, "অবজারভেশান পোষ্টের" পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

বালাসনের গর্জন ত' সব জায়গাতেই কানে আসে। এখানে বসে তার অশান্ত জলধারার দিকে তাকিয়ে থাকি, এইরকম পরিবেশে সারাদিন বসে থাকতেও আমার ক্লান্তি বোধ হয় না। মনও কাজ করে চলে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে ইংরেজ মালিক দীর্ঘ এগার মাস ধরে বাগান লক্-আউট করে রেখেছিল, লক্ আউটের সঙ্গে সঙ্গে বাগানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। পুলিশের ভয়ের চাইতেও বড় শত্রু অনাহার এবং বুভুক্ষাও তো শ্রমিকদের মাথা নোয়াতে পারেনি, ছ-সাত মাস লক্-আউট চলার পর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নেতৃস্থানীয় এগারটি পরিবারকে উচ্ছেদ করে বাকী সবাইকে কাজে ফিরে নিতে রাজী হয়েছিল। আমরা দূর থেকে ভেবেছি যে শ্রমিকরা বোধহয় আর এখন লড়াই চালাতে পারবে না। তাই ভেবেছি যে ঐ এগারটি পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করব, কিন্তু যাদের লড়াই তারা হার মানে নি। এগারটি পরিবারকে বাদ দিতে রাজী হয় নি তারা।

যখন ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতে চা শ্রমিকদের উপর সরকারের দমননীতির খড়্গ নেমে এল তখন এখানকার তিনজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককে বিনা বিচারে কিছুদিন বন্দী থাকতে হয়েছে। একদিকে তারা নেতৃত্বহীন, অন্যদিকে ট্রাইব্যুনালের রায়ও গেছেতাদের বিরুদ্ধে। সেই অবস্থায় শ্রমিকেরা এগার মাস পরে সাময়িকভাবে হার মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তা যে কত সাময়িক সে কথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে যায়।

শ্রমিকদের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে ভেবে মালিকপক্ষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হামলা শুরু করে। এগারটি পরিবারকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেই তারা সন্তুষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর হটাবাহারের নোটিশ এল। মজুরেরা চাঁদা তুলে ও মুষ্টিভিক্ষা উঠিয়ে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের অটুট ঐক্যের সামনে হটাবাহারের নোটিশ জোর করে কার্যকরী করা সম্ভব নয় জেনে

মালিকপক্ষ আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়। সত্তর মাইল দূরের সদর মহকুমা আদালতে পাহাড় পথ ভেঙে দিনের পর দিন মামলার তদ্বির করবে শ্রমিকদের সে সামর্থ্য কোথায় ?

আদালতের রায়ও তাদের বিরুদ্ধে গেল। মালিকপক্ষ এবার আইনের সমর্থন লাভ করেছে, আর তাদের পায় কে ? উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া তিনটি শ্রমিক পরিবার পিতৃপিতামহের ভিটা ছেড়ে যেতে রাজী নয় দেখে ম্যানেজার সাহেব জেলার কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই সাহায্য দিতে শাসন যন্ত্রের একটুও দেরী হয় না। সেদিন দার্জিলিং শহর, সোনাদা বাজার, আর বালাসন নদীর দু পাশের লোকেরা সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সমাবেশ দেখে অবাক হয়ে যায়। নিরস্ত্র গরীব মানুষগুলির প্রতিবাদকে দলে পিষে দেবার জন্য এ যেন একটা ছোটখাট সামরিক অভিযানের আয়োজন।

কিন্তু বালাসনের দুই পারের সংগঠিত বাগানের মজুরেরা অভিযান দেখে ভয় পায় না। দুটি বাগানের শ্রমিকেরাই মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে কাজ বন্ধ করে সমবেত হয়। উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া ভাইদের ঘর তারা ভাঙতে দেবে না। এই ধরণের প্রতিবাদ চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে এই প্রথম। ফলে আশেপাশে অন্যান্য অসংগঠিত বাগানের লোকদের মধ্যেও বিপুল চাঞ্চল্য জাগে। এই সমবেত প্রতিবাদের সামনে পুলিশবাহিনী ঘর ভাঙতে সাহস পায় না। ফিরে যায়, পর পর দুদিন এইভাবে চলে। তারপর একদিন পুলিশ অতর্কিতে এসে তিনজনের ঘর ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যায়।

আবার বেশ কয়েক মাসের জন্য বাগানে পুলিশ মোতায়েন হল। কিন্তু বাগানের নেতাদের ধরতে পারে না। তাঁরা ঐ বেড়াজালের মধ্যেই বাস করেন, আর রাতের অন্ধকারে ঘরে ঘরে ঘুরে সঙ্গীদের মনোবল বজায় রাখতে সাহায্য করেন। আমিও এবার এক বেড়াজাল থেকে উদ্ধার পেয়ে এলাম সেই নেতাদেরই সাহায্যে।

বহু সংগ্রামের গৌরবদীপ্ত সেই বাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

আশ্রয় তো নয়, এ আমার তীর্থক্ষেত্র। আমার অনেক অনেক ভুল ধারণা আর ভ্রান্ত অনুমান দূর করার পীঠস্থান।

এই বাগানের তিনজন প্রধান কর্মী, রণবীর রাই, ইন্দ্রে রাই এবং সূর্যে রাই সম্বন্ধে জেলা নেতৃত্ব কতটা ভুল ধারণা করেছিলেন, এখানে এসে বেশ বুঝতে পারি। শুধু ভুল ধারণা নয়, দস্তুরমতো অবিচার করা হয়েছিল। এজন্য অবশ্য প্রধান দায়িত্ব হল সতীশের। সতীশকে প্রাদেশিক কমিটি এই জেলায় পাঠিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এমন একটা অহমিকা প্রকাশ পায়, যা শুধু বিরক্তিকর নয়, প্রশ্রয় পেলে আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারত। চা-শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। সে ত্রুটির কথা তিনি আদৌ আমল না দিয়ে কলকাতা শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ছক এখানেও চালু করতে চেয়েছিলেন। ধজে বাগানের হটাবাহার নোটিশপ্রাপ্ত শ্রমিক পরিবারগুলির ঘর শেষবার যে মালিকপক্ষের লোকজন পুলিশের সহায়তায় ভেঙে দিতে সমর্থ হয়, সেজন্য তিনি রণবীর, ইন্দ্রে ও সূর্যের উপর দোষারোপ করেন। বিশেষভাবে রণবীরের উপর। আসলে তারা নাকি প্রতিরোধ সংগঠিত করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় একটা জিনিষ দেখেছি যে শ্রমিকেরা পুলিশী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ জানিয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাগানে। পুলিশবাহিনী এলে তারা জমায়েত হয়েছে, কিন্তু কখনোই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যায়নি বা যাওয়ার চেষ্টা করেনি। ধজের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না গিয়ে সঠিক কাজই করেছে। সংগ্রামী চেতনা তাদের এখনও সেই স্তরে পৌঁছায়নি। এরূপ ক্ষেত্রে রণবীর যদি প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের পথ বেছে নিত, তাহলে ফল হত বিপরীত। সেজন্য তাদের সংগ্রামবিমুখ বা ভীতু অপবাদ দেওয়ার কোন যুক্তি

নেই। পুলিশী জুলুমের ভয়টাই যদি তাদের পেয়ে বসত, তাহলে সিঙ্গেলের ঘটনা জানার পর আমাকে আশ্রয় দেওয়ার ঝুঁকি নেবে কেন?

অন্ধকার হওয়ার একটু আগে রণবীর আসে আস্তানা ঠিক হওয়ার খবর নিয়ে। এবার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কারুর ঘরে নয়, একজন শ্রমিকের ঘরের আঙ্গিনার একপ্রান্তে একটি চালাঘরে। ওটিতে তারা সম্বৎসরের জন্য 'লাকড়ি' অর্থাৎ জ্বালানী কাঠ জমিয়ে রাখে। এককোণায় একটি গরুও থাকে। তিনটি দিক বেশ পুরু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটি দিক ততটা ঢাকা নয়। কেননা তার ঠিক পরেই জায়গাটা খাড়া হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। মাঝখানে ছোট্ট একটি উপত্যকার মতো। ওপারে পাহাড়ের অপর বাহু। যাতে সেখান থেকে কেউ মানুষের উপস্থিতি টের না পায় সেজন্য ত্রিপল দিয়ে বেড়ার খানিকটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাবে স্তূপীকৃত লাকড়িগুলি একটু সরিয়ে সাজিয়ে দুখানা তক্তা লম্বালম্বিভাবে পাতার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ওটির উপর বিছানো আমার কম্বল শয্যা। সিঙ্গেল থেকে আসার সময় কম্‌রেডরা কোন গতিকে এক ফাঁকে আমার কম্বল দুটি এনে সঙ্গে দিতে পেরেছিল। অতিরিক্ত জামাকাপড় কিছুই সঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি। কম্বল সম্বল করে ঘুরছি। যাদের আতিথ্য গ্রহণ করছি তারা হল 'খোওয়াস' বা 'খস'। পরিবারে আছে বুড়ী মা, ছেলে ও ছেলের বৌ। ছেলে ও ছেলের বৌ সকালে উঠে কাজে যায়। বুড়ী ঘরের কাজ করে। দুপুরের খাওয়াটা চালা ঘরে দিয়ে যায়। রাতে পাশের পথ দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ হলে ওদের কুটিরে গিয়ে ভাত খাই। আত্মগোপনের জীবনে শুরু হল আর এক ধরনের লড়াই। নিজের দেহ ও মনের সঙ্গে। বছরের এই সময়টা শ্রমিক পরিবারের দিন কাটে টানাটানির মধ্যে। 'ছুলপাত্তি'র সময় কিছুটা বেশী অর্থাগম হয়। কয়েকমাস পরে 'মকাই' পাকবে। তখন কিছুটা সুরাহা হবে। মকাইয়ের

একটা অংশ এরা বছরের বাকী মাসগুলির জন্য সঞ্চয় করে রাখে ও ব্যবহার করে খুব হিসেব মত। এই সময়টাতে সঞ্চিত মকাই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তবু 'খোওয়াসনী' বুড়ী এক একদিন সকালে 'চিয়া'-র সঙ্গে কিছুটা ভুট্টার খই, অথবা 'ভুটেকো মকাই', বা ভুট্টা পোড়া দিয়ে যায়। রোজ দেওয়ার মত সংস্থান নেই। বিকেলটা খিদেয় পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। উপায় নেই, বুড়ী আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মকাই পাকলে তোমার কিছুটা সুবিধা হবে।'

সারাটা দিন একেবারে একলা। আপনমনে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তাও করা চলবে না। পাশের রাস্তায় চলার সময় কেউ যদি চালাঘরের ভিতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পায়, তবে সেটা সন্দেহের কারণ হবে। সকালে শ্রমিকরা যে যার কাজে গেলে চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে একসময় রণবীর আসে। সঙ্গে করে ঝরণার কাছে নিয়ে যায়। ঝরণাটা আস্তানা থেকে খানিকটা দূরে। যাওয়া আসার সময় উল্টোদিকের পাহাড় থেকে কারুর না কারুর নজরে পড়ার সম্ভাবনা। তবে দাওরা সুরুআল পরনে থাকায় দূর থেকে দেখে কেউ সন্দেহ করবে না। এই যা ভরসা। ঝরণার কাছে প্রকৃতির তাগিদ সেরে মুখ-হাত ধুয়ে চলে আসি। রোজ স্নান করা হয় না। আস্তানায় পৌঁছে দিয়েই রণবীর আর দাঁড়ায় না। কিছু বলতে গেলে জবাব দেয়, "ফুরসত ছাই না," অর্থাৎ সময় সেই। সে যে এত কম কথা বলে আগে তা জানা ছিল না। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ইন্দ্রে রাইয়ের ঘরে বৈঠক বসে। সপ্তাহে একদিন। বেশী লোক আসে না। আসতে দেওয়া হয় না। রবিবারে কৃষ্ণবাহাদুর কার্শিয়ং এ হাট করতে যায়।

ফেরার সময় শচীন সিন্‌হার কাছে থেকে এক সপ্তাহের জমা খবরের কাগজ নিয়ে আসে। আনতে হয় খুব সাবধানে, সব্‌জীর ঝুড়ির নীচে সাজিয়ে। চা-বাগান শ্রমিকের কাছে খবরের কাগজ

দেখলে যে-কেউ নির্ঘাত বুঝে নেবে কার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাতদিনের কাগজ একদিনে পড়ে ফেলি। রয়ে সয়ে পড়ার ধৈর্য কই। সেটা নিরাপদ নয়। পড়া হয়ে গেলে রণবীরের হাতে তুলে দিই। সে ওগুলি ছিঁড়ে পোঁটলা বেঁধে সবার অলক্ষ্যে বালাসনের জলে ফেলে দিয়ে আসে। সপ্তাহের বাকী ছয় দিন সময়ের খেয়া পাড়ি দেওয়া বড় কঠিন হয়ে ওঠে। ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাবো তার উপায় নেই। সেদিকটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার হিসেব নিকেশ করি। কখনও ভাবি ধজে বাগানের তিন নেতার চারিত্রিক পার্থক্যের কথা। রণবীর কথা বেশী বলে না। কিন্তু সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর। বৈঠকের সময় কোনও প্রশ্ন করে না, অথচ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে সব কথা। ইন্দ্রে রাই ধীর, স্থির, শান্তি। সেও যে খুব বেশী কথা বলে, তা নয়, তবে একেবারে মুখ গোমড়া করেও থাকে না। জানার আগ্রহ অপরিসীম, বৈঠকের সময়ই হোক, বা কখনও একলা দেখা হলে দেশবিদেশের অনেক কথা খুঁটিয়ে জানতে চায়। একটু আধটু হিন্দী পড়তে পারে। পার্টি বে-আইনী হওয়ার আগে, কেন্দ্রীয় কমিটির হিন্দী সাপ্তাহিক, 'জনযুগ' নিয়মিত পড়ত। নেপালী ভাষায় রাজনৈতিক সাহিত্য এখনও গড়ে উঠে নি। 'জনযুগ' এখন বন্ধ। সুতরাং তার কৌতুহল অপরিতৃপ্ত থেকে যায়। সূর্যে এদের ঠিক উল্টো। সে হাসিখুশী, পরিহাসপ্রিয়, আমুদে। নিজেদের দাবিদাওয়া ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই, লালঝাণ্ডার প্রতি গভীর আনুগত্য আছে।

এমনিভাবে দিনযাপন করি। কালের গতি থেমে থাকে না। সময় কেটে যায়। তারপর একদিন আবার দুই সপ্তাহের নিস্তরঙ্গ জীবনে চাঞ্চল্য জাগে। এক দুপুরে আমাদের অন্যতম বুগরিয়ার পাঙ্গমালি ভুজেল এসে হাজির হয়। সঙ্গে এনেছে আনন্দ পাঠকের চিঠি। আনন্দ পার্টিতে এসেছে বছর খানেক। তবু নিজগুণে

দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণের অধিকার অর্জন করেছে। ছেলেটি শান্ত, শিক্ষিত। কোনরকম চাপল্য বা বাগাড়ম্বর নেই। আনন্দের আছে দুঃসংবাদ। সূর্যে পাঙ্গমালিকে সরাসরি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে সব খবর শুনে। সুশীলদা ধরা পড়েছেন। তিনি দার্জিলিং শহরে কোথায় আছেন সে খবর একমাত্র ভীমদল জানত। পরের দিন তারই সঙ্গে অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল, ভোর না হতেই পুলিশ সেই বাড়ীটি ঘিরে ফেলে। ভীমদলেব ধারণা তার সম্বন্ধে কম্‌রেডরা এখনও কোনও সন্দেহ করেনি। অথবা করার আগেই সে বাকি কাজটুকু করে ফেলবে। আমি যে সিঙ্গেল থেকে ধজে বাগানে আছি, সে কথা তার জানা আছে। সে এখন ধজের উদ্দেশ্যেই রওনা দিয়েছে। মুখে বলেছে সুশীলদার গ্রেপ্তারের খবর হিমাদ্রিকে জানাতে যাবে। ভীমদল যে কম্‌রেডদের সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে সে কথা তাকে বুঝতে না দিয়ে আনন্দ পাঙ্গমালিকে নির্দেশ দিয়েছে যে করেই হোক ভীমদল এখানে আসার আগে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতে। রণবীরকে দিয়ে কিছু চিঠি লেখার কাগজ আনিয়ে রেখে-ছিলাম। তাড়াতাড়ি ইংরাজী ও নেপালীতে বিভিন্ন স্থানের ভারপ্রাপ্ত কম্‌রেডদের কাছে কিছু নির্দেশ লিখে পাঠাই।

পরে জানতে পারি পাঙ্গমালি চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই ভীমদল এসে হাজির হয় সূর্যের ঘরে। জিজ্ঞাসা করে, "হিমাদ্রি কোথায়? খুব জরুরী খবর আছে।" সূর্যে আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিল। তাই চট্‌পট্‌ জবাব দেয়, "হিমাদ্রি কাল রাতে মুণ্ডা বাগানে চলে গিয়েছে। অগত্যা ভীমদল ফিরে যায়। তার আসার জেরটা যায় না। একদিন পরে দুপুরে রণবীর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে," কমরেড! আপনাকে এখনই এখান থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে হবে। জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দেয়, "পথে চলতে চলতে শুনবেন। এখন হাতে সময় খুব কম।" চক্ষের নিমিষে কম্বল দুটি ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে রাখে। তারপর তক্তাদুটি তুলে নিয়ে

বুড়ীর ঘরের ভিতরে রেখে আসে। লাকড়িগুলিকে আবার এবড়ো খেবড়ো করে দেয়।

পরে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারি। বাগানের চৌকিদার খোওয়াসনী বুড়ীর ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "তোদের ঘরে বাইরের মানুষ কে এসেছে"। বুড়ীর ছেলে জানায় কেউ আসেনি। চৌকিদার যে তার কথা বিশ্বাস করেনি বুঝতে দেরী হয় না, তাই সে তখনই এসে রণবীরকে খবর দেয়। রণবীরের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই, সে বলে, সিঙ্গেলের ঘটনার পর বাগানে পুলিশ আসতে হলে দলে ভারী হয়ে আসবে। কিন্তু পাকা খবর পাওয়ার আগে তারা ঝুটঝামেলা পোয়াতে চায় না। তাই সম্ভবতঃ পুলিশ কর্তৃপক্ষ বাগানের ম্যানেজারকে টেলিফোন করে সন্ধান নিতে বলেছে, ম্যানেজার চৌকিদারকে নির্দেশ দিয়েছে সন্দেহজনক কিছু দেখলে রিপোর্ট করতে। চৌকিদারের রিপোর্টের পর ম্যানেজার যদি নিজে আসে তদন্ত করতে, দেখবে চালাঘরে আমার উপস্থিতির কোনও চিহ্নই নেই। তখন দোষটা পড়বে চৌকিদারের উপরে, সম্ভবতঃ সে ব্যক্তিগত আক্রোশে বুড়ীর ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে।

ঠিক হয় দিনের বেলাটা সূর্যের গোয়াল ঘরের পিছনের পাহাড়ে গাছপালায় ঢাকা একটা জায়গায় কাটাবেন, সূর্যের তিনটি গরু আছে। বাগানের ডেয়ারীতে দুধ বিক্রী করে, মাঝে মাঝে নাগরী বাজারেও যায়। জায়গাটা নির্বাচন ভালই হয়েছে। নীচে থেকে আমাকে কেউ সহজে দেখতে পাবে না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমি অনেককিছু দেখতে পাবো, লোক চলাচল নজরে পড়ে। বসে বসে দেখি সূর্যে কিভাবে গোয়ালের বাইরে গরুর দুধ দুইছে। দুধ দুইতে দুইতে পাহাড়ী গরুর ঘন কালো চোখের দিকে চেয়ে তার সঙ্গে একটানা কথা বলা চলেছে। গরুটি কথাগুলি বোঝে না বটে, তবে দাঁড়াবার শান্ত ভঙ্গীটি দেখে মনে হয় পশু ও মানুষের মধ্যে যে নীরব বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে তা মুখের কথার চেয়ে অনেক বেশী প্রাণবন্ত।

রাতে সূর্যের ঘরে দু-চারজন কম্‌রেড এসে জোটে। দিনের বেলায় বুড়ীর ঘর থেকে চলে এসেছি সেটা তাদের চোখে পড়েছে, এতদিন এখানে আমার উপস্থিতি অনেকের কাছে অজানা ছিল। জানাজানির পর কৌতূহল জেগেছে। নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছেও আছে, কথার ফাঁকে সূর্যে তাদের জানিয়ে রাখে, "কম্‌রেড একটু পরেই মুণ্ডা বাগানে চলে যাবে"। সতর্কতা হিসাবে এই ঘোষণা, থাকবো ধজে বাগানেই। এবারকার আস্তানাও ঠিক হয়েছে একজনের "লাকড়ি ঘরে"। দুটো গরুও আছে এককোণে, তেমনিভাবে লাকড়িগুলি সরিয়ে সাজিয়ে তক্তা পেতে বিছানার ব্যবস্থা। এই ঘরটির বড় সুবিধা, বাগানের একপ্রান্তে অবস্থিত। লোক চলাচলের পথ নেই ধারে কাছে, কাছেই একটা ছোটখাটো বন। ঝরনাটা বনের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত, প্রয়োজন মত বনের মধ্যে গিয়ে সময় কাটানো যাবে।

প্রতি সন্ধ্যায় কম্‌রেডদের দুই-একজন দেখা করতে আসে। মেয়েরাও আসে। কেউ হয়ত দুটো কলা, কেউ দুটো ডিম হাতে নিয়ে আসে এক একদিন। সামান্য উপচার অথচ ওদের অন্তরের গভীর দরদের নিদর্শন হিসাবে কত দামী। এমনিতে খেতের কলা, বা পোষা মুরগীর ডিম বেচে ওরা অতিরিক্ত কিছু টাকা উপার্জন করে। একদিনের জন্য সেটুকু ক্ষতি স্বীকার ওদের পক্ষে কত বড় ত্যাগ বুঝে আমার মন ভরে ওঠে। বুড়ীর ঘরে থাকার সময় সিগারেট খাওয়ার উপায় ছিল না। যে চালাঘরে মানুষ থাকার কথা নয়, সেখান থেকে সিগারেটের গন্ধ, ধোঁয়া স্বভাবতঃই পথচারীর সন্দেহ উদ্রেক করবে। এই ঘরটি সেদিক থেকে নিরাপদ। চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ধূমপানের জন্য "কটুয়া" খাওয়ার প্রচলন আছে। "কটুয়া" অর্থ কৌটোর তামাক। বড় কড়া, পাতলা কাগজে মুড়ে সিগারেটের মত পাকিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে হয়। শ্রমিকেরা কিছুতেই আমাকে "কটুয়া" খেতে দেবে না। তারা বলে, "ও

জিনিষে মাথার বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। আপনার বুদ্ধি নষ্ট হলে আমরা কোথায় যাবো" ?

নতুন একটা উপসর্গ জুটেছে। অনেকদিন ভাল করে স্নান হয়নি। একই "দাওরা সুরু আল" একনাগাড়ে পরণে রয়েছে। সারা গায়ে চুলকানি। হাতদুটি সবসময় সক্রিয়। সেটা অনেকে লক্ষ্য করেছে। "দাওরা সুরুআল" সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করতে হবে। মুস্কিল হল অতিরিক্ত জামাকাপড় নেই। সঙ্গে যা ছিল সিঙ্গেলে পড়ে রয়েছে। ওখানকার কম্‌রেডরা কোনমতে কম্বল দুটি এনে দিয়েছিল। "ভনজেঙ্গ"-এ (কাঞ্ছি) কুটিরে একটা ক্যাম্বিসের হাতব্যাগে কিছু জামাকাপড় ছিল। সেগুলির হদিস করার জন্যে ট্রাক মায়লাকে খবর পাঠাই। খবর আসে "কে.পি." তার মধ্যে দু-একটি নিজের জন্য রেখে অন্যগুলি কি করেছে কেউ জানে না। সে যে এতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন আগে বুঝতে পারিনি। বরাত ভাল, ট্রাক মায়লা আন্দাজে আমার মাপের মতন সার্ট-প্যান্ট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেগুলি পেয়ে বর্তে যাই। রণবীর দাওরা-সুরুআল নিয়ে চলে যায়। ফিরে এসে হেসে বলে, "সাবান দিয়ে কাচলে হবে না। গরম জলে সিদ্ধ করতে হবে। তোমার জামা-কাপড়ে "হিড়নে ময়লা" (চলমান ময়লা) হয়েছে। সোজা কথায় "জুমরো", পাহাড়ী উকুন। জুমরোর কামড় ছারপোকার কামড়ের চেয়েও কষ্টদায়ক। পাহাড়ীরা জুমরোকে খুব ভয় করে। "দাওরা সুরুআল" পরিষ্কৃত হয়ে আনার পর ঠিক করি, যেখানেই থাকি, মাঝে মাঝে কাচবার বন্দোবস্ত করতেই হবে। মনে রাখার মতন অভিজ্ঞতা বৈ কি!

ধজে বাগানের কাছে এবার বিদায় নেওয়ার পালা। অনেক কাজ সামনে। সুশীলদা ধরা পড়ার পর গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে মাথার উপরে। গোপন সংগঠনের ছিন্নসূত্রগুলিকে আবার জোড়া লাগিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। একেবারে ঢেলে সাজার প্রয়োজন

রয়েছে। এবার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য চা-বাগান থেকেই কয়েকজন পরীক্ষিত তরুণ কর্মীকে বেছে নিতে হবে। বে-আইনী পার্টির সদর দপ্তর হবে চা-বাগানে, শ্রমিকদের মাঝখানে। ধজের শ্রমিকদের উপর এতখানি চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। তাদের উপর অল্পদিনের ব্যবধানে কয়েকবার নানাভাবে চাপ এসেছে। মুণ্ডা বাগানের নেতা তুলারাম ছেত্রীকে খবর পাঠাই। সেখানকার সংগঠন বেশ মজবুত। তুলনামূলকভাবে ওদের উপর এখন পর্যন্ত কোন চাপ পড়ে নি। ধজের উপর পুলিশ ও জেলাপ্রশাসনের যতটা বিষনজর, মুণ্ডার উপর ঠিক ততটা নয়। মুণ্ডা থেকে অন্যান্য বাগানে গোপনে যাতায়াত করাও তুলনামূলকভাবে সহজ। জিতবাহাদুর (মায়লা) রাইকে আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছে। সে বড় সরল। রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না। ধজেতে থাকাকালে তাকে নবাগত দেখে যে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে তাকেই সিঙ্গেলের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। তুলারাম ছেত্রীকে বলে পাঠানো হয়েছে ; মায়লাকে যেন বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া না হয়। মুণ্ডাতে থাকার ব্যবস্থা প্রায় নিরাপদ। বাইরে থেকে পুলিশী হামলা না হলে বেশ কিছুদিন কাটানো যাবে। থাকার ঘরটি তুলারাম ছেত্রীর ডেরা থেকে বেশী দূরে নয়। এই বস্তীর সব শ্রমিকই লালঝাণ্ডার অনুগত। আমার বাসস্থানের ঠিক পিছনে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের দেয়াল। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়িক্ষেত করে মকাইয়ের চাষ হয়েছে। ক্ষেতের শেষ ধাপ দুটি বেশ প্রশস্ত। মকাইগাছের মধ্যেই প্রকৃতির তাগিদ মেটাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে কম্‌রেডরা। স্নান করলে ঘরের পিছনে চলতে পারে। তোলা জলেই করতে হবে। রোজ ত' হবে না। কম্‌রেডদের হয়রানি কম হবে। এদের সীমিত সম্বল নিয়ে আমার জন্য যা করে তাতেই আনন্দ হয়, আবার মাঝে মাঝে সঙ্কোচ অনুভব করি। তুলারামেরও দু-তিনটি গরু আছে। দুধ ঘি বিক্রী করে। তার বৌ এক একদিন ভাতের সঙ্গে "ঘিউ", বা একটু দুধ

দিয়ে যায়। এরা মাখনকে বলে "ঘিউ"। ঐ এক-আধদিন আমাকে যা দেয়, তাতে ওদের পক্ষে আর্থিক ক্ষতি কম নয়।

গোপন সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো সম্বন্ধে তুলারাম ও পুরণের সঙ্গে আলোচনা হয়। ক্যুরিয়ারের কাজ করার জন্য এবার আর শহরের লোক নয়, চা-বাগান থেকে কয়েকজন একনিষ্ঠ তরুণ কর্মীকে বেছে তৈরী করে নিতে হবে। অবশ্য শহর এবং সদর দপ্তর, অন্যদিকে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন শহুরে কর্মী চাই। চা-বাগানের শ্রমিকেরা শহরের পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরে উঠবে না। অস্বস্তি বোধ করবে। তাছাড়া এরা বড় সরল। রেখে ঢেকে কথা বলতে খুব কম জনই পারে। শহর থেকে এমন একজনকে বাছাই করতে হবে যাকে ওখানকার অন্য কেউ পার্টির লোক বলে জানে না। তাকে বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ হতে হবে। একজনের কথা মনে পড়ে। তার নাম ফ্র্যাঙ্কি ব্যারেট। ইংরেজ পিতা ও নেপালী মায়ের সন্তান। খৃষ্টান। চা-বাগানে এরকম দুই একজনের দেখা মেলে। কোন মেয়ে ইংরেজ ম্যানেজারের নেকনজরে পড়লে সাহেব তাকে রক্ষিতা হিসাবে গ্রহণ করত। ক্বচিৎ কেউ হয়ত বিবাহও করেছে। বিলেতে যাওয়ার সময়ে বাড়ি, জমি দিয়ে গিয়েছে। এই ধরনের মানুষদের অন্য নেপালীরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তবে সমতল ভূমির মতো উৎকট ছুঁৎমার্গ নেই। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতি ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান একত্রে মিলেমিশে নতুন নেপালীভাষী জাতিসত্তার জন্ম দিয়েছে। সে প্রক্রিয়া এখনও চলেছে। সেইজন্যে অতটা কড়াকড়ি নেই। "বাহুন" (ব্রাহ্মণ) ও ছেত্রীরা এদের সম্বন্ধে কিছুটা ছুঁৎমার্গী মনোভাব পোষণ করে। অন্যেরা ততটা নয়। ফ্র্যাঙ্কি পার্টির সংস্পর্শে এসেছে প্রয়াত ওয়াংদি লামার প্রভাবে। এতদিন যে কোনও কারণেই হোক, তাকে বিশেষ কোনও কাজে টানা হয়নি। শাপে বর হয়েছে। তাকেই দার্জিলিং শহর, চা-বাগানের গোপন কেন্দ্র এবং শিলিগুড়ির

মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে লাগানো যেতে পারে। একটা সমস্যা অবশ্য থাকে। তুলারাম ততটা না হলেও তার বৌ এই ব্যবস্থায় রাজী হবে কিনা? এখানে এলে প্রথমে ত' তুলারামের ঘরেই উপস্থিত হবে। তুলারাম সহজে সম্মতি দেয়। তার বৌকে জিজ্ঞাসা করি। সে একটুক্ষণ ভেবে বলে, "পার্টির কাজে যখন আসবে তখন সেও কম্‌রেড। দাওয়ায় বসবে, ঘরের ভিতরে না ঢুকলেই হল।" পরে দেখেছি এটুকু সংস্কারকেও সে বর্জন করেছে। শুধু তাই নয়। ভগ্নীসমা এই মেয়েটির যে পরিচয় পেয়েছি নানা ছোটখাটো ব্যাপারে, তাতে মুগ্ধ হয়েছি। তুলারাম ছেত্রীর বৌ রাজনীতি নিয়ে বেশী কথা বলে না। শুধু একমনে বসে শোনে। তখন ভেবেছি যে ও বুঝি আন্দোলনের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী নয়। কিন্তু ভুল ভাঙল প্রথম যেদিন ওদের বাগান ছেড়ে বাইরে যাই সেই দিন। আমার সঙ্গীদের ডেকে ও বার বার বলে, "কম্‌রেডের যেন কোনও বিপদ না হয়। সাবধানে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।" আমি হেসে বলি, "বোন! বিপদ তো অপেক্ষা করে আছে পথের প্রতি বাঁকে। তার জন্য এত উতলা হলে চলবে কেন?" সে কথা শুনতে চায় না। কয়েকদিন পর ফিরে এলে ছোট বোনটির মত অনুযোগ করে, নিরাপদে পৌছানর সংবাদ কেন দেননি? এই কয়দিন বড় চিন্তায় কেটেছে।" লেখাপড়া না জানা সাধারণ, মজুরের মেয়ে। সেদিন পর্যন্ত ভীরুতা, কুসংস্কার, আর ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমারই চোখের সামনে ওর মন থেকে সব জীর্ণ পাতার মত খসে পড়ে গেছে। আন্দোলনের তাগিদে নানা জাতের নানা ধরনের লোক এসেছে ওর এখানে। ছেত্রীর বাড়িটাই ছিল প্রধান আড্ডা। ধীরে ধীরে নিজের অজানিতে ছেত্রীনী বৌ সব পিছুটান কাটিয়ে এগিয়ে এসেছে। ছোঁয়াছুঁয়িব বিচার কখন গেছে কেটে। সবাইকে ভাই বলে কাছে টেনে নিতে পেরেছে। ওদের ঘর তল্লাসী করতে পুলিশ এসেছে বারবার। প্রথমবারে

পুলিশী আয়োজনের ঘটা দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে ; তারপর ক্রমে গা সওয়া হয়ে গেছে। পরে আর পরোয়া করে নি।

"তুলারাম ছেত্রী"র কথাও তো অনেক বলার আছে। অন্যদিকে আবার শিশুর মত সরল। যখন যে বাগানে থেকেছি সেখান থেকে পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠালে রাতবিরেতে বনজঙ্গল ভেঙে দেখা করতে গেছে। যখন যে বাগানে আস্তানা করেছি, সেখানকার অগ্রণী কর্মীদের রাতের ঘুম আমারই সঙ্গে চলে গেছে। সভা, বৈঠক সবই হয় অনেক রাত পর্যন্ত। আমি তো দিনের বেলা ঘুমোতে পারি, কিন্তু ওদের তো ভোরে উঠে কাজে যেতে হয়।

খবর পেয়ে ট্রাক মায়লা দেখা করতে আসে। ভীমদলের এখানে কোনও পাত্তা নেই। সকলে যে তাকে সন্দেহ করছে বুঝতে পেরে উধাও হয়েছে। তার অপকীর্তির আরো কিছু তথ্য জানতে পাই। সুশীলদার গ্রেপ্তারের পর সে ট্রাক মায়লার ঘরে এসেছিল এবং প্রস্তাব দিয়েছিল জেলা কমিটির সভ্যদের একটা জরুরী সভা ডাকতে। ট্রাক মায়লা আগ্রহ না দেখানোয় ব্যাপারটা এগোয় নি। তবে দিন দুই পরে ট্রাক মায়লার ঘর পুলিশ তল্লাসী করে। ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে একটা সাইক্লো ষ্টাইল মেশিন রাখা হয়েছিল। সেটির খোঁজে পুলিশ গোটা মেঝে খুঁড়ে ফেলে। কিছু অবশ্য পায় নি। ভদ্রবাহাদুর হামাল ধরা পড়ার খবর পেয়ে ট্রাক মায়লা ওটিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছিল। ফ্রাংকি ব্যারেটকে দায়িত্ব নিতে রাজী করানোর ভার ট্রাক মায়লার উপরে দেওয়া হয়। স্থির হয় এখানেই জেলা কমিটির সভা ডাকতে হবে। কয়েকদিন পরে সভা বসে। ধজে থেকে আসে রণবীর ও ইন্দ্রে। তুলারাম ও পূরণ ত' এখানকারই নেতা। ছোটো-রিংটংয়ের বুড়ো মঙ্গল সিং এবং খালিং এসেছে। ট্রাক মায়লা এসেছে, পার্টির একনিষ্ঠ ভক্ত বুড়ো ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছে। জেলা কমিটির নতুন সম্পাদক নির্বাচন করতে হবে। ইতিপূর্বে দার্জিলিং শহরের একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পার্টিসভ্যকে সম্পাদক করা হয়েছে। সে

কিছুদিন থেকে পার্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। প্রাদেশিক কমিটির নতুন নির্দেশে একজন শ্রমিককে এই পদে নির্বাচিত করতে হবে। সবাইকে জিজ্ঞাসা করি, 'কার নাম প্রস্তাব করছো?' অন্যেরা প্রথমে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। বুড়ো ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করে, রণবীর রাইয়ের নাম। অন্য কোনও প্রস্তাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তুলারাম বলে' "বুড়ো লে ভনি হালেও"—অর্থাৎ বুড়ো বলে ফেলেছে। আমি বলি, "তুমি যদি অন্য কারুর নাম করতে চাও বলো। সে পূরণের নাম প্রস্তাব করে। এখানকার কমরেডরা এখনও ভোটাভুটিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই ধরনের বিষয়ে ভোট দেওয়ার কথাটা তারা ভাবতে পারে না। তবে দেখা গেল যে বেশির ভাগের ইচ্ছা রণবীরই সম্পাদক হোক। পূরণ এই বাগানের পার্টি কমিটির সম্পাদক, কিন্তু বাগানের বাইরে খুব পরিচিত নয়। জেলা কমিটির পুরাতন সভ্য হিসাবে রণবীর অনেক পরিচিত। রণবীর সম্পাদক হওয়াতে আমিও খুশী হই।

শিলিগুড়ি থেকে খবর এসেছে পুর্ণগঠিত প্রাদেপিক কমিটির সম্পাদক "বিরাটদা" উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। তাঁর ইচ্ছা চা-বাগানের কম্‌রেডদের সঙ্গে মিলিত হবেন। সবাইকে জিজ্ঞাসা করি ঝুঁকি নিতে পারবে কিনা। সবাই সম্মতি জানায়। খালিং বলে, বড়ারিংটং বাগানের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। হিলকার্ট রোড থেকে এখানে আসতে প্রথমেই পড়বে ঐ বাগানটি। হয়ত সেখানে সেখানে একরাত ও একদিনের জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন হতে পারে। খুবই যুক্তি-সঙ্গত কথা। মঙ্গল সিং দায়িত্ব নেয়, বড়ারিংটং-এর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। পরে আমি নিজেও যাবো। ওখানকার ডাক্তার অবনী তলাপাত্র পার্টিসভ্য। শ্রমিকদের উপরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেই অনুসারে ডাঃ তলাপাত্রকে চিঠি পাঠানো হয়।

ডাঃ তলাপাত্রের জবাব পাওয়ার পর বড়া রিং টং-এর উদ্দেশ্যে

রওনা হই। যে দুই-তিনদিন এখানে ছিলাম, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। তবে নিতান্ত ছোটখাটো অভিজ্ঞতারও তো দাম আছে। এই বাগানের কয়েকজন অগ্রণী শ্রমিক কর্মী ছাড়া সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। ডাক্তারবাবু সহানুভূতিশীল হলে শ্রমিকদের ছোটখাটো সুবিধা দিতে পারেন, সেজন্যে তাদের আনুগত্যটা ছিল প্রধানত তাঁরই প্রতি। লালঝাণ্ডার সম্বন্ধে ভাসাভাসা আকর্ষণ ছিল। তার বেশী নয়। প্রথমদিন যে শ্রমিকের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হল, সেখানে একরাত একবেলাতেই উপরের কথাগুলি বেশ বোঝা গেল। পরিবারের কর্তা ডাক্তারবাবুর অনুরোধে আমাকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেও কর্ত্রীর আপত্তি খুব প্রবল। আমার উপস্থিতিতে বিরক্তি নানাভাবে প্রকাশ পায়। ফলে সেদিন সন্ধ্যায় অন্য এক আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হই। শিবটার, সিঙ্গেল, ধজে, মুণ্ডা বাগানে দেখছি পলাতক নেতাকে ঘরে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে মেয়েদের গোড়াতে একটু ভীতি থাকলেও সহজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। পরে ত' আপন করে নিয়েছে। দ্বিতীয় আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল পদম কামী নামে একজন তরুণ শ্রমিকের ঘরে। নববিবাহিত তার বৌয়ের দিক থেকে অবশ্য কোনরকম বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করিনি। তবে পদমের বাপ-মা বুড়োবুড়ী যে খুব সন্ত্রস্ত ছিল, তা বুঝতে দেরী হয় না। ছেলের জন্যে উৎকণ্ঠা নানা ভাবে প্রকাশ পেত। সব দেখেশুনে এই বাগানে বৈঠক করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়। বিরাটদাকে প্রথমে এখানেই এনে তোলা হবে। সেই রাত্রেই যাত্রা করবো মুণ্ডা অভিমুখে। বিরাটদা হিলকার্ট রোড থেকে এই বাগান পর্যন্ত উৎরাই পথে খুববেশী ক্লান্তি বোধ করেন নি। একটুক্ষণ বিশ্রাম করে রওনা দিতে অসুবিধা নেই। মুণ্ডা থেকে সঙ্গী এসে হাজির হয়েছে সন্ধ্যার আগেই। বিরাটদাকে পরের সন্ধ্যায় জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করে দিই। দোভাষীর কাজ করতে হয় আমাকে। তিনি হিন্দী জানেন। তবে

সে হিন্দী চা-বাগানের শ্রমিকরা ভাল বোঝে না। দার্জিলিং বাজারে কাজ চলতে পারে। কর্মীরা এসেছে ধজে, মুণ্ডা ও ছোটারিংটং থেকে। বাছাই করা, আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পরীক্ষিত কর্মী। তাদের দেখে এবং দু-চারটি কথা শুনে বিরাটদা খুব উৎসাহিত। তিনি শিলিগুড়িতে শুনে এসেছিলেন, সুশীলদা গ্রেপ্তার হওয়াতে আমাদের সংগঠন বিপর্যস্ত। বাস্তবে ঠিক বিপরীত চিত্র দেখতে পেলেন। হিলকার্ট রোড থেকে বড়ারিংটংয়ে পৌঁছানো, সেখান থেকে মুণ্ডার পথ পাড়ি দেওয়া, তারপর সফল বৈঠক। ফলে যে তাঁর উৎসাহ মাত্রা ছাড়িয়ে অবাস্তব কল্পনার পাখায় ভর করে উড়তে চাইছিল, সে আগেই বলেছি। বিরাটদাকে নিরাপদে বহাল তবিয়তে হিলকার্ট রোড পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার উপরে। নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হতে নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজে হাত দিই।

মুণ্ডাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের বাগানে নৈশ অভিযান। আমার সঙ্গে থাকে নরবীর সুব্বা। তুলারাম ছেত্রী তাকে বেছে দিয়েছে আমার কুরিয়ার ও সহচর হিসাবে। বাইশ তেইশ বছরের তরুণ। তারুণ্যের চাপল্য বা উচ্ছ্বাস নেই। কথা বলে খুব কম। যখন যেটুকু বলে, তা অনেক কথার চেয়ে বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার। নেপালীরা যাকে বলে, "হাকনু," অর্থাৎ মুখে আস্ফালন, নরবীর তার ধারে-কাছেও নেই। কথা বলে শান্ত ভাবে, অথচ বলিষ্ঠ আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। গোপন সংগঠনের কাজে এই ধরনের তরুণেরই প্রয়োজন। আমারও এইরকম মানুষই পছন্দ। যারা আলাপী, তারা নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্যের পাত্র নয়। কঠোর জীবনে হাসিখুশী রসবোধ সম্পন্ন মানুষের সাহচর্য্যও চাই বৈকি। তবে সব সময় নয়। অন্য সময় আলাপী বা মজলিশী, অথচ কাজের সময় সৈনিকের মতো কঠোর, এরকম মানুষ খুব বেশী চোখে পড়ে নি।

নরবীর বলে, "এখানে পুলিশ এলে সিঙ্গেল হয়ে যাবে। আপনাকে কিছুতেই ধরা পড়তে দেবোনা।" তাই বলে, নরবীর

সুব্বা পাথরের তৈরী মূর্তি নয়, রক্তমাংসের মানুষ। দুর্বলতা আছে। রাতে কোথাও পাঠাতে হলে একা কিছুতে যাবে না। কারণ খুলে বলে না। তবে বুঝি, ভূতের ভয়। অবশ্য এই ভয়টা তার একলারই নয়। তরাইয়ের কৃষক কম্‌রেড্‌দের মধ্যে দেখেছি, রং বুল ও 'ভন্‌জেঙ্গে' কৃষকদের মধ্যে দেখেছি, চা-শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখেছি। রাতে এক-একদিন টিন পেটানোর শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করে আভাসে ইঙ্গিতে জবাব পেয়েছি, "ভূত তাড়ানো হচ্ছে।"

নৈশ অভিযানে অনেক বৈচিত্র্যের স্বাদ পাই। হাঁটু সমান কাদায় ভরা খাড়া পিচ্ছিল পথ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে কতবার আছাড় খেয়ে পড়ি। এ-পথে অন্ততঃ দু-একবার আছাড় না খেলে তার অসম্মান করা হয়। আমার হাত ধরে তুলতে গিয়ে কাঞ্ছা লোরুঙ্গ নিজেই আছাড় খায়; হাসতে হাসতে উঠে আবার চলা শুরু করি। নরবীর একবারও পড়েনি এ পর্যন্ত। সে নিজের দক্ষতার জন্য গর্ব প্রকাশ করে পরমুহূর্তেই কাদায় লুটোপুটি খায়। জলভরা ধূসর ফগের পুরু পর্দা ঠেলে সামনে এগোই। ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর নীচে দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় দেখি বাংলো বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল। রাত বারোটা বেজে গেছে। মাথার উপর কখনও কখনও বর্ষার আকাশ অকৃপণ দাক্ষিণ্যে জলধারা বর্ষণ করে। শ্রাবণের বর্ষণ। বর্ষাতি ভিজে চপ্‌চপে্‌ হয়ে গেছে। কোথাও বা নতুন জলে ফুলে ওঠা ঝরনা উচ্ছ্বসিত হয়ে রাস্তার উপর দিয়েই বয়ে চলেছে। নরবীর কয়েকটি পাথরের খণ্ড কুড়িয়ে জলের মধ্যে ফেলে দেয়। সেগুলির উপরে পা ফেলে পার হয়ে যাই। কিন্তু জুতো ভিজে কাদা হয়ে গেছে অনেক আগেই।

একজায়গায় পৌঁছে দেখি মুষলধারে বারিপাতের ফলে চলার পথের কিছুটা খানিকক্ষণ আগে মাত্র ধসে পড়ে গেছে। এমনি তো প্রায়ই ঘটে। কোথাও অতি সাবধানে খাড়া পাহাড়ের গায়ে হাতের

কাছে যা কিছু পাই আঁকড়ে ধরে ধস্ পার হই।

চলার কি শেষ আছে? সামনে ফগের পর্দা এত পুরু যে টর্চের আলো তাকে ভেদ করে বেশী দূর যেতে পারে না। নরবীর আগে চলেছে। টর্চের আলোর সামনের পর্দার উপর তার এক অতিকায় ছায়া প্রতিফলিত হয়। মনে হয় কবির কল্পনা সার্থক হল আমার জীবনে; "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন চরণ ফেলে" চলেছি আমরা। "নিশার মত নীরব"ও বলা চলে। চারদিক নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। দূরের এক ঝরনার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পথের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নির্ঝরিণীদের কুলুকুলু ধ্বনির ঐকতান সে নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ় করে তোলে।

অবশেষে মালভূমির মত একটা জায়গায় এসে পৌছাই। বহুবার যাতায়াতে পথের প্রতিটি বাঁক পরিচিত হয়ে গেছে। চাঁদনী রাতে এখানে এসে মনে হয় যেন পৃথিবীর ছাদের উপর এসে গিয়েছি। দূরে চোখে পড়ে কার্শিয়ং শহরের দীপালোকমালা। দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। অন্ধকার রাতে আশেপাশের পাহাড়ের শ্রেণীকে মনে হয় যেন ঘন কালো রং দিয়ে আঁকা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট। গভীর আঁধারে এখানে-ওখানে, দু-একটা আলো জ্বলতে দেখা যায়, নিস্তব্ধ আঁধার-সাগরের বুকে দূরবর্তী লাইট হাউসের মত।

তারপর উৎরাই পথে চা-ঝোপের মাঝখান দিয়ে নামতে নামতে একটা ঝোলানো পুলের কাছে এসে পৌছাই। ঝোলানো পুল পার হয়ে আবার চড়াই। গন্তব্যস্থানে পৌছতে এখনও বহু দেরী। তবু পথের শেষে আছে নিশ্চিত আশ্রয়।

ছোটারিংটং বাগানে একবার কয়েক দিনের জন্যে যেতে হবে। ওখানকার বন্ধুরা ডেকে পাঠিয়েছে। যাওয়ার দিন স্থির করে মঙ্গল সিংকে ব্যবস্থা করার জন্য খবর পাঠাই। রওনা হওয়ার সময় দেখি সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে। পিঠে কাপড়ের গাঁঠরি (বোঁচকা) যেন সে ফিরিওয়ালা, বাগানে বাগানে জামাকাপড় ফিরি করে

বেড়ানোই তার কাজ। তাকে বলি, "কম্‌রেড! তুমি বুড়ো মানুষ, এই বাদল রাতের অন্ধকারে নিজেই চলে এলে কেন?" সে জবাব দেয়, "কম্‌রেড! অন্য কারুর উপর আপনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। পথ তো এখন সহজ নয়। নরবীরকে সঙ্গে নিই। ছোটারিংটং-এ পৌঁছে প্রথম বাসস্থান হল যে মানুষটির ঘরে, সে যেন অন্য সকলের থেকে আলাদা। বিক্রম ছেত্রী যুদ্ধ ফেরত সৈনিক। বাঁ-হাতটা কাটা। একহাতেই পারতপক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যথাসম্ভব সেরে নেয়। রান্নাবান্নার কাজ প্রতিবেশী একটি মেয়ে এসে করে দিয়ে যায়। কথা খুব কম বলে না, তবে "হাঁকনু"র লেশমাত্র নেই। একটু-আধটু শিক্ষিত মানুষটি। যেটুকু কথা বলে, তার মধ্যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ফুটে ওঠে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, রাতে একা কোথাও যেতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। সম্ভবত সৈনিক জীবনের শিক্ষা থেকেই অশরীরীদের ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছে।

পরের সন্ধ্যায় বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। আমারই সামান্য ভুলের জন্য হতে পারে না। বৈঠকের জায়গায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মঙ্গল সিং কাউকে পাঠাবে, অথবা বিক্রম ছেত্রী সঙ্গে নিয়ে যাবে, সে কথাটা পাকাপাকি করা হয়নি। ছেত্রীর ধারণা মঙ্গল সিং কাউকে পাঠাবে। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। পরের দিন মঙ্গল সিং এসে অনুযোগ করে, "ছেলেরা জমায়েত হয়েছিল। আপনি না যাওয়াতে তাদের কাছে অপ্রস্তুত হতে হল।" ভুল বোঝাবুঝির জন্য নিজেকে দায়ী করি, আমি তো জানি, এই ধরনের ছোট্ট জিনিসগুলি অনেক সময় কম্‌রেডদের মনে আঘাত দেয়। বুঝিয়ে বলি, "আজ সন্ধ্যায় আয়োজন করো, আমি ছেত্রীকে ঙ্গে নিয়েই যাবো।"

এই বাগানের বস্তীগুলি ঘনসংবদ্ধ নয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে উপরে নীচে দুই-তিনটি কুটির। কারুর কুটিরে নবাগত এলে

অন্যের চোখে পড়বেই কোন না কোন সময়। ছেত্রীর কুটির পাহাড়ের যে বাহুর গায়ে, তার উপরে নীচে কাছাকাছি কুটিরগুলিতে আমাদেরই সমর্থক শ্রমিকেরা বাস করে। সুতরাং জানাজানিতে বিশেষ ভয় নেই। বিক্রম ছেত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দলবাহাদুর ছেত্রী। সেও যুদ্ধ ফেরত। প্রথম দিন আমার উপস্থিতি তারই চোখে পড়েছিল। পরের দিন বৈঠকে তার সঙ্গে দেখা হয়। একদিন সে নিজেই বিক্রমের ঘরে এসে হাজির। ইচ্ছা আমার সঙ্গে একটু বিশদভাবে কথাবার্তা বলবে। আমার দিক থেকেও উপকার হল। এই সব যুদ্ধফেরত সৈনিক কম্‌রেডদের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার পরিচয় পাই।

চা-বাগানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বাণী এসে পৌঁছায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশ্রুতিতে ভুলে অনেকে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে তাদের বেশীর ভাগই বেকারের দল ভারী করেছে। কেউ কেউ হয়ত কাজ পেয়েছে বাগানের কুলী, বা বড়জোর চৌকিদার হিসাবে। তাদের বাপ-ভাই-মা-বোনের রুটির আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতির চেহারা দেখে এরা মনে মনে গুম্‌রে ওঠে। যারা একটু রাজনীতি-সচেতন, তারা এগিয়ে এসে আন্দোলনের সামনের সারিতে নিজেদের জায়গা করে নেয়। এমনি একজন বীর সৈনিক হল দলবাহাদুর ছেত্রী। ইন্দোনেশিয়ার গণমুক্তি সংগ্রাম নিজের চোখে দেখে এসেছে। সঙ্গীদের সেইসব কাহিনী শোনায়। জাগ্রত জনতা নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে গোলামীর শিকল ছিঁড়ে ফেলার জন্য পাগল হয়ে লড়াই করে। ওদের বাগানে যখন প্রথম আসি, সঙ্গীদের মুখে দলবাহাদুরের গল্প শুনি। লোকটিকে চোখে দেখার জন্যে কৌতূহল জন্মেছিল।

ধীর স্থির শান্ত মানুষটি। কিন্তু পৃথিবীর উপর নতুন এক যুদ্ধের কালো মেঘ ছেয়ে আসছে শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে

"যুদ্ধ হতে দেব না আমরা। আঠার টাকা মাইনের জন্য দূর দেশান্তরে প্রাণ দিতে গিয়েছি। সেখানে নিজ চোখে দেখে এসেছি আমাদেরই মতো পিছনে পড়া মানুষগুলির মধ্যে এসেছে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার। আর দেশে ফিরে কি দেখেছি? আমাদের জন্য তৈরী আছে বেকারি, অপমান, আর লাঞ্ছনা। আমাদের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ভাই-বোনদের রুটির লড়াইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এ ফাঁদে আর আমরা পা দেব না। এবার যদি প্রাণ দিতে হয় দেব নিজেদের দেশে নিজেদের জীবনকে সুখী, সুন্দর করে তোলার লড়াইতে।"

শান্ত মানুষটি—এ পর্যন্ত কোনদিন তাকে উত্তেজিত হতে দেখিনি। কিন্তু এখন তার স্বরে চাপা আবেগ ফেটে পড়ছে। চা-শ্রমিকদের মধ্যে যে আগ্নেয়াগিরির লাভাস্রোতে ফেটে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, তা যুদ্ধ ফেরত সৈনিককেও দুর্ণিবার গতিতে আকর্ষণ করে। দলবাহাদুরেব আবেগ ভরা চাপা কণ্ঠস্বরে যেন শুনি সেই আলোড়নেরই মেঘমন্দ্রধ্বনি।

তিন-চারদিন থাকার পর আস্তানা বদলে যাই ছেত্রীনী দিদির ঘরে। ছেত্রীনী দিদিকে প্রথম দেখেছিলাম এক বৈঠকে। কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে একলা দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছে সভায় যোগ দিতে। এখানে পুরুষেরা প্রায় সবাই সঙ্গে কুকরী রাখে। কিন্তু মেয়েদের কুকরী বইতে দেখিনি। তাই ছেত্রীনী দিদিকে দেখে বীর রাজপুত রমণীদের কথা মনে পড়ে। দিদির ঘরে কয়েকদিন বাস করে তাঁর স্নেহকোমল অন্তরের পরিচয় পাই। সকালে উঠে ছেত্রীনী কাজে যায়। বাসায় থাকে ছোট দুটি ছেলে আব কোলের মেয়েটি। যাবার আগে দিদি মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়ে বারবার আদর করেন আর বুঝিয়ে বলেন, "লক্ষ্মীটি, আমরা কাজে যাই, তুমি বাবার কাছে শান্ত হয়ে থেকো। শনিবার দিন 'হপ্তা' পেলে তোমাকে চিনি দিয়ে চা খেতে দেব।" মেয়েরা কাজে গেলে ছেত্রী

বুড়ো আমার তত্ত্বাবধান করে। বেলা নটার সময় ঘরের পেছনে দুয়ার দিয়ে মকাই ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঝরনার কাছে চলে যাই। স্নান করি বর্ষায় পূর্ণযৌবনা গণওয়ার ঝর্‌নার নবধারা জলে। পরিবেশটাও কাব্যগন্ধী। বনবীথি রয়েছে, যদিও নেই নীপবন। আকাশ নীরন্ধ্র মেঘে আচ্ছন্ন। দুপুরবেলা বেশীক্ষণ পড়াশোনা করা চলে না। নিদ্রার আশ্রয় নিতে হয়, নতুবা মনপবনের নায়ে চড়ে উধাও হতে হয় নিরুদ্দেশের সন্ধানে।

বিকেলে মেয়েরা ফেরে। দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে আলাপ করে। সন্ধ্যায় রান্না সারা হলে আগে অতিথিকে খেতে দেবে, তবে নিজেরা খাবে। ভাত, কালো ডাল এবং বাঁশের তরকারী। কচি বাঁশের গোড়া কুচি কুচি করে একটু হলুদ লবণ মিশিয়ে সিদ্ধ করা। হপ্তার দিন মা-মেয়েরা মিলে সপ্তাহের রোজগারের হিসাব করে। তারপর যায় সওদা আনতে। ছেত্রীনী দিদি অতিথির জন্য পান নিয়ে আসেন। আমাকে আশ্রয় দিয়ে কত অসুবিধাই না পোয়াতে হয় এদের। কোন সন্ধ্যায় মিটিং করতে যাব, এদিকে হয়ত বাইরের বারান্দায় অন্যলোক এসে বসে আছে। কৌশলে তাকে বিদায় করে দিতে হয়, নতুবা পিছনের দুয়ার খুলে আমার যাবার পথ করে দেন। অনেক রাতে মিটিং সেরে ফিরি। দেখি যে দিদি আমার আসার প্রতীক্ষায় বসে আছেন না ঘুমিয়ে। সপ্তাহ কয়েক থাকি এখানে। একটা মায়া পড়ে যায় সবার উপরে। বিদায়ের সময় মনের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটা কিছুদূর পর্যন্ত পেছনে আসে। এমনি কত মায়ার বাঁধন পথের দুপাশে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়।

রামপ্রসাদ বাহুন (ব্রাহ্মণ) এর কথাই বা ভুলি কি করে। ছোটারিংটং-এ থাকার সময় প্রায়ই সে আমার নৈশ ভ্রমণের সহচর হত। হাসিখুশি পরিহাসপ্রিয় মানুষটি সর্বদা রঙ্গরসে সবাইকে আনন্দদান করে। অথচ দায়িত্ব পালনে এতটুকু শৈথিল্য কখনও

চোখে পড়ে নি। মনে পড়ে এক রাতের ছোট একটি ঘটনা। এক বৈঠকে যোগ দিতে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে চলার সরু পথটি একস্থানে খানিকটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এ পথটি এড়িয়ে অন্যপথে বৈঠকে যেতে অনেকখানি ঘুরতে হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ দেখি, রামপ্রসাদ অবলীলাক্রমে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সন্তর্পণে পাহাড়ের ধারে ধারে পা ফেলে ওপারে পৌঁছে দিল। তারপর হেসে বলে, "কম্‌রেড্! শুনেছিলাম সিঙ্গেলের ওড়ারে আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুজন এমনি পাঁজাকোলা করে নিয়েছিল। আমার সেই থেকে ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পেলে তাই করবো।" এরকম মানুষ কমই দেখেছি।

মঙ্গল সিংয়ের ঘরের কাছে পাহাড়ের উপরের ধাপে আর একটি ঘর খালি পড়ে আছে। সামনে কিছুটা গাছপালার আড়াল পড়ে। পিছনে মকাইক্ষেত। নেপালীদের সংস্কার অনুযায়ী জলত্যাগ করতে হলেও বাসস্থান থেকে অনেকটা দূরে যেতে হবে। সেইদিক দিয়ে জায়গাটা খুব সুবিধাজনক। অবশ্য দিনের বেশীরভাগ সময় একলা কাটে। দুপুরে নীচের রাস্তাটিতে লোক চলাচল যখন থাকে না, মঙ্গল সিং এসে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় ভাত খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় অবশ্য কম্‌রেডদের সঙ্গে যোগাযোগে সময় অতিবাহিত হয়। সিঙ্গেলের নেতারা, যারা পড়েছিল, জামিনে খালাস পেয়ে এসেছে। সাকী রাই, টি. বি. ছেত্রী, কাঞ্ছা রাই দেখা করতে আসে। জিত বাহাদুর ছেলে-বৌয়ের কুশল জানার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিল। সে খানিকটা স্বস্তি পায়। ছেত্রী জানায় যে তাদের বাগানে শ্রমিকেরা সাময়িকভাবে দমে গিয়েছিল। তবে নেতারা ফিরে আসায় অবসাদের ভাব কাটতে শুরু করেছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের যে সব দিক নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন হয় না, অভ্যাসে পরিণত হয়, সেইগুলি

আত্মগোপনের জীবনে বেশ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। আমার দাড়িগোঁফের প্রাধান্য না থাকলেও যা আছে, নেপালীদের মধ্যে বিরল। শহরে হয়ত দুই একজন দাড়িওয়ালা মানুষের দেখা মেলে, কিন্তু চা-বাগানে চোখে পড়েনি। রোজ দাড়ি কামাতে হয়। সঙ্গে একটা হাতব্যাগে অতিরিক্ত একপ্রস্থ জামাকাপড়, কিছু অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, চিঠি লেখার কাগজ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম রয়েছে। কিন্তু চুল ত নিজে কাটা যায় না। অথচ দুই-তিনমাস না কাটার ফলে মাথার অবস্থা সহজে অন্যের চোখে পড়ে। অপরিচিতের কৌতূহল জাগায়। না কাটলে চলছে না। বাগানের পেশাদার নাপিতের সাহায্য নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। মঙ্গল সিং খুঁজে বার করে বন্ধুদের মধ্যে একজনের এ ব্যাপারে হাত রপ্ত আছে। কাজ শেষে ঝরণায় স্নান করতে যেতে হয়। ঝরণা বেশী দূরে না হলেও যাওয়ার পথে আড়ালেই কারুর না কারু নজরে পড়বেই। ভাবি এই আস্তানায়ও আর থাকা চলে না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাই পুলিশ হন্যে হয়ে একই রাতে দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি শহরেব কয়েক জায়গায় হানা দিয়েছে আমার খোঁজে! ধজে ও মুণ্ডা বাগানেও কয়েকজনের ঘর তল্লাশী হয়েছে। রণবীর আর ইন্দ্রেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। মুণ্ডায় পার্টির গোপন কেন্দ্র। কিছু কাগজপত্র, ইস্তাহার, আইনী ও বে-আইনী পত্রিকা ইত্যাদি রয়েছে। এমন একজনের ঘরে রাখা আছে যে পার্টির কর্মীরূপে পরিচিত নয়। তবু একবার সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে কেন্দ্র ওখান থেকে অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তুলারাম ছেত্রীকে খবর পাঠিয়ে তার লোকের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে যাওয়া ঠিক করি। দলবাহাদুর ছেত্রী পার্টি সভ্যরূপে খুব পরিচিত নয়। এযাত্রা সেই হয় আমার সঙ্গী। মুণ্ডাতে পৌঁছে বুঝি পরিস্থিতি সুবিধার নয়। পুলিশবাহিনী একবার ফিরে গিয়েছে বটে, কিন্তু আর একবার হামলার আশঙ্কা যায়নি। বাগানে সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি

বেড়ে গিয়েছে। নানাজনে বিভিন্ন অজুহাতে এলেও তাদের প্রশ্নের ধরণ শুনে আসল উদ্দেশ্য অনুমান করতে দেরী হয় না। যে কোনদিন আতর্কিতে পুলিশ এসে পড়তে পারে। এবার কম্‌রেডরা আমার আস্তানা ঠিক করেছে তুলারাম ছেত্রীর বস্তী থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক বস্তীতে, ইন্দ্রধ্বজ রাইয়ের ঘরের ঠিক পিছনে, একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরে। ইন্দ্রধ্বজ রাই খাবার দিয়ে যায়, ভুট্টাক্ষেতের আড়াল দিয়ে এসে। মকাই (ভুট্টা) পাকতে শুরু করেছে। বানরের পাল এসে পাকা ফসলের উপর চড়াও হয়। মকাই ক্ষেতের মাঝের জায়গায় মাচার মতো তৈরী, উপরে খড় ছাওয়া এক-খানি চাল। মাচাটি হাত আড়াই চওড়া হবে। নেপালী ভাষায় একে বলে 'এক্‌সা'। ছেলেরা এক্‌সায় বসে সারাদিন চিৎকার করে বানর তাড়ায়। তাদের সেই একটানা 'লো হোই', 'লো ও ও হোই' শব্দ কানে আসে।

পুলিশ বাগানের অনেকগুলি ঘর তল্লাশী করছে শুনে ইন্দ্রধ্বজ আমাকে এমনি একটা 'এক্‌সা'তে নিয়ে যায়। সেখানটায় ভুট্টাক্ষেতের ঠিক ওপারেই শুরু হয়েছে ঘন বন। ভুট্টাগাছের ফাঁক দিয়ে মায়লা ছেত্রী আর মায়লা লোকাঙ্গের অঙ্গন দেখা যায়। খাকী পোশাক পরা, মাথায় লোহার টুপি ও বন্দুকধারী সিপাইয়ে দুটো অঙ্গনই ছেয়ে গেছে। এখান থেকে তাদের মনে হয় যেন বামনদের দেশের লোক। ছেত্রীর ঘরের উপরের ডাঁড়ায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। মেয়ে পুরুষ দুই-ই আছে। বাগানের নেতাদের পুলিশে ধরতে এসেছে শুনে প্রতিবাদের জন্য সমবেত হয়েছে তারা সবাই। নরবীর এসে খবর দেয়, যে সমবেত মজুরেরা ঠাট্টা বিদ্রূপে, বে-পরোয়া পরিহাসে সিপাইদের বড় উত্যক্ত করে তুলেছে।

দুপুর নাগাদ পুলিশ বাহিনী ফিরে যায়। শ্রমিকদের সমাবেশ দেখে তারা কাউকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করেনি। কিন্তু শাসিয়ে গেছে যে আবার তারা আসবে। এই বাগানে বে-আইনী লোক

লুকিয়ে আছে সে খবর তারা নিশ্চিতভাবে জানে।

রাতে আবার অতর্কিতে হামলা হতে পারে ভেবে সঙ্গীরা 'একসা' তেই রাত কাটাতে পরামর্শ দেয়। বাগানের নেতাদেরও সাবধানে থাকতে বলি। একজন আমারই রাতের সঙ্গী হন। শ্রাবনের মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। যদি শুরু হয় অশ্রান্ত বর্ষণ, তবে এক্সার ঐ জীর্ণ চাল সামাল দিতে পারবে না।

দু-দিন অপেক্ষা করে এই বাগান কিছুদিনের জন্য ছেড়ে যাওয়াই ঠিক হল। নতুবা এখানে জেনেশুনে সিঙ্গেলের মতো বিপর্যয় টেনে আনা হবে। তাই আবার চলা শুরু করি। আবার কত বন্ধু, কত সঙ্গী, কত স্মৃতিকে পেছনে ফেলে জীবনের সামনের অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে চলি। পিছনে পড়ে থাকে নববর্ষার জলস্রোতে পাগল হয়ে ওঠা দুরন্ত নদী বালাসন।

আপন মনে বলি, সবখানেই তো পাব এই স্নেহ ও অন্তরের আত্মীয়তা। তবে কেন পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসে? আমার তো চলার বিরাম নেই। "নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন" সে কথা কেন ভুলে যাই, এমনিভাবে চলতে "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার" শেষে একদিন দেখা দেবে নূতন পৃথিবী—ঐ বৈদ্যুতিক আলোতে ঝল্‌মল করা কার্শিয়ং শহর যেমন লোভনীয় বলে মনে হয় এখান থেকে, তেমনি।

অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই। আমার গতিবিধি এখন তিনটি বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত। পুলিশ সেকথা জেনে গিয়েছে। আটঘাট বেঁধে হামলা করলে বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। এদিকে শ্রমিক কমরেডরাও উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠাগ্রস্ত। তাদের পরিবার পরিজনই বা কি ভাবছে? একজনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সবাইকে দুর্গতি ভোগ করতে হবে? নিজেই একদিন কথাটা পাড়ি, তুলারাম ও পূরণ পরামর্শ দেয়, "আপনি কিছুক্ষণ 'মধেস", অর্থাৎ তরাইতে গিয়ে থাকুন। পুলিশের উপদ্রব

কমলে আবার আবার আসবেন। প্রস্তাব যুক্তিসংগত, তবে কার্যকরী হতে কয়েকদিন সময় লাগবে। শিলিগুড়িতে খবর পাঠাতে হবে, বড়ারিংটং এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। শিলিগুড়ি সংগঠনের উপর কয়েকবার পুলিশী হামলা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় নেতাদের প্রায় সবাই একে একে ধরা পড়েছে, দায়িত্বে যারা আছে, তারা নতুন। গোপন সংগঠনের সহায় সম্বল প্রায় নিঃশেষিত। এখানে আর একদিন থাকাটাও উচিত হবে না। ভুলারাম লোক পাঠায় খালিং এর কাছে। খালিং আপাততঃ অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। খালিং -এর ঘরে পৌঁছে বুঝি, অস্থায়ী আশ্রয়ের মেয়াদ দুই-একদিনের বেশী নয়। যেখানে ঠাঁই পাই, সেটি নানাদিক দিয়ে নিরাপদ বটে, তবে ঘরের মালিক খুব ইচ্ছুক নয়। নিতান্ত খালিং এর অনুরোধে একেবারেই সাময়িকভাবে থাকতে দিতে রাজী হয়েছে। ভাবছি, বে-পরোয়াভাবে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। ঠিক এমনি সময় খালিং খবর আনে, ফুলবাড়ী বাগানের 'স্যায়লা' দেওয়ান, আর মায়লা গুরুং এসেছে। কিছুদিনের জন্য দায়িত্ব নিতে রাজী। ওরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এসেছে। ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। কিন্তু মনে দ্বিধা থেকে যায়। ফুলবাড়ীতে পার্টির সংগঠন খুবই দুর্বল। ওখানে শ্রমিকদের উপর বাগানের নেপালী ডাক্তারের যথেষ্ট প্রভাব। ডাক্তারটি শুনেছি কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী। স্যায়লা দেওয়ান ও তার সঙ্গীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। দার্জিলিং শহরে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় দুই-একবার দেখেছি মাত্র, তারপর দেখা হয়েছে খালিং এর ঘরে বৈঠকে। দ্বিধা থাকলেও নিরুপায়। ওদের সঙ্গেই যাত্রা করি।

প্রথম আস্তানা হয় ভৈরাম লিম্বু নামে এক বুড়ো শ্রমিকের ঘরে। তার আপনজন কেউ জীবিত নেই। বয়স সত্তরের উপরে ত' বটেই, আশি হওয়াও বিচিত্র নয়। শক্ত সমর্থ আছে এখনও, রান্নাবান্না সেই করে। বাগানের নীচে থেকে উপরে পূর্তবিভাগের সড়ক পর্য্যন্ত

যাওয়ার পথ এই ঘরের পাশ দিয়ে। স্থান নির্বাচনের তাৎপর্য্য তখন বুঝি নি। প্রথমে বরং ভালই লাগে, কাছেই একটা জঙ্গল। প্রকৃতির তাগিদে সাড়া দেওয়ার পক্ষে সুবিধা। রাস্তাটিতে বড় একটা লোক চলাচল নেই। ঘরটিও একপ্রান্তে। বিকেলে স্যায়লা দেওয়ান এসে জানায় "ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। শুনে খটকা লাগে। প্রশ্ন করি," ডাক্তারবাবু আমার উপস্থিতির কথা জানলেন কি করে?" স্যায়লা দেওয়ান জবাব দেয়, "ডাক্তারবাবু সব খবর পেয়ে যান। আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করায় আমি অস্বীকার করতে পারি নি।" বিরক্ত হয়ে বলি, "এধরনের দেখাসাক্ষাৎ আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে।" স্যায়লা দেওয়ান তখনই আব কিছু বলে না। পরের দিন জঙ্গল থেকে এসে ভৈরাম লিম্বুর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধুচ্ছি, এমনসময় নীচের রাস্তা থেকে উঠে একজন লোক উপরের দিকে চলে যায়। যাওয়ার সময় আমার মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখে। বুড়ো ভৈরাম লিম্বু রেগে আগুন। বলে, "ঐ লোকটা চৌকিদার, কোনদিন এ রাস্তা মাড়ায় না। আজ কেন এদিকে এসেছে বুঝি না। বোঝা গেল ত্নপুরে, স্যায়লা দেওয়ান হন্তদন্ত হয়ে এসে জানায়,। "এখনই এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে। পুলিশ আসছে।" তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে দিনেত্নপুরে রাস্তায় বেরোতে হয়। বাগানের উচ্চতার ঠিক মাঝামাঝি স্থানে একটা ঘরে এনে তোলে। ঘরটি কোন শ্রমিকের নয়। তু-তিনটি কামরা, একটি কামরায় খাটে বিছানা পাতা, এক কোনে একটি টেবিল, খানত্নই চেয়ার। সম্ভবতঃ কোন বাবুর, অর্থাৎ কেরানীর। অপেক্ষা করতে বলে স্যায়লা দেওয়ান চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢোকে একজন প্রৌঢ় নেপালী ভদ্রলোক, নমস্কার করে সপ্রতিভ ভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। নিজের পরিচয় দেয়, "আমি এখানকার ডাক্তার"। স্যায়লা দেওয়ানই তাহলে ডাক্তারের নির্দেশে এই কাণ্ড করেছে। ডাক্তারবাবু আমার জন্য দশ প্যাকেট নাম্বার টেন সিগারেট নিয়ে এসেছেন।

অদ্ভুত মানুষটি, খোলাখুলি স্বীকার করেন, তাঁর সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ ত' আছেই, উপরন্তু এই অঞ্চলে খবরাখবর সংগ্রহের দায়িত্বও পেয়েছেন। তার হুকুমে কয়েকজন চর কাজ করছে। বলে "আপনারা হলেন 'ঠুলো মানুষে', অর্থাৎ বৃহৎ ব্যক্তি। আপনাদের সঙ্গেও পরিচয় থাকা ভাল"। কথায় কথায় জানা গেল' আমার সাম্প্রতিক গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখে। খালিং এর ঘরে যে বৈঠক হয়, সেখানে তার চর উপস্থিত ছিল। মঙ্গল সিং এর ঘরের সামনেকার পূর্তবিভাগের সড়ক ধরে এক সন্ধ্যায় আমি সদলবলে কোথায় যাত্রা করেছিলাম, তাও জানেন। পুলিশের জাল কতদূর বিস্তৃত টের পাই। কিভাবে এসব খবর পেয়েছে বুঝতে খুব দেরী হয়না। আমাদেরই সংগঠনের কতগুলি দুর্বলতার জন্য এগুলি সম্ভব হয়েছে। পার্টিসভাদের বৈঠক ডাকলে সমর্থকরাই শুধু নয়, তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, ইত্যাদি ও এসে হাজির হয়। বৈঠকে আমাদের উপস্থিতির কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। যে কয়েক মাস টিকে থাকতে পেরেছি পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে, তার কারণ প্রধানতঃ দুটি। সিঙ্গেল বাগানের ঘটনার পর পুলিশের মধ্যে খানিকটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। যথেষ্ট সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ না নিয়ে কোন বাগানে হানা দিতে তারা ইতস্ততঃ করত। দ্বিতীয়তঃ চা-বাগানগুলি, বিশেষতঃ সব অঞ্চলে বৈঠক বসত, সেখানে যাতায়াত বেশ কষ্টসাধ্য, একেবারে নিশ্চিত না হলে হানা দিতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসার ঝুঁকি পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিতে রাজী নয়। অন্যদিকে আমরা ও সাধারণতঃ একটা কৌশল অবলম্বন করেছি। যে বাগানে বৈঠক বসেছে, পারতপক্ষে সেখানে রাত্রিযাপন না করে অন্যত্র চলে এসেছি। কখনো সেই বাগানে রাত কাটাতে বাধ্য হলেও শ্রোতাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে আমরা পাশের বাগানে চলে যাবো।

ডাক্তার বলে, "আমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে। আপনি কালই এই বাগান ছেড়ে চলে যান। দিনের বেলাতেই যাবেন।

রাতে এখন পথের মোড়ে মোড়ে পাহারা।" ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বসে আকাশ পাতাল ভাবি। এবার যাঁতাকলেই বুঝি বা পড়েছি। স্যাঁয়লা দেওয়ানের বিচিত্র আচরণ সন্দেহ উদ্রেক করে, তবু একেবারে অবিশ্বাস করতে মন চায় না। করারই বা কি আছে? পরিত্রাণ পেতে হলেও তারই সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। যদি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ উদ্ধার হয়। স্যাঁয়লা দেওয়ান আসে একেবারে সন্ধ্যায়। সে রাতটা এবং পরের দিনটা বড় কষ্টে কাটে। অনিচ্ছুক পরিবারের ঘরে ঠাঁই নিতে হয় বাধ্য হয়ে।'

বিড়ম্বনা কম নয়। এর চেয়ে জঙ্গলে থাকা ছিল ভাল। পরদিন অন্য একটা ঘরে যাই। গৃহস্বামীর ব্যবহার ভালই। শরীর একেবারে ক্লান্ত, জ্বর এসেছে। হাত পা ছড়িয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে থাকি। জিতবাহাদুর রাই এসে হাজির। মুণ্ডা থেকে খবর এসেছে ওরা ব্যবস্থা করেছে। যাবো কিনা? ঐ রাতে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। মুণ্ডা যাওয়াটা এখন সমীচীন হবে কিনা ভাবি। জিতবাহাদুরকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। পথে বার হলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তার আগে দুই এক জায়গায় নির্দেশ পাঠাতে হবে। এখন মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত। স্যাঁয়লা দেওয়ানও ছিল সেখানে। মঙ্গল সিং এলে কাল রাতেই এই বাগান ছেড়ে যাবো জানিয়ে দিই। পরের দিন সন্ধ্যায় স্যাঁয়লা দেওয়ান এসে বলে, "মঙ্গল সিং, জিতবাহাদুর রাই, এবং আরো কয়জন এসেছে। ভৈরাম লিম্বুর ঘরে অপেক্ষা করছে। ঘরটা নিরিবিলি, তাই ওখানে বসিয়েছি। দেখি মঙ্গল সিং ক্যুরিয়ার হিসাবে কাজ করার জন্য একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণকে সঙ্গে এনেছে, নাম প্রসাদ। ফ্র্যাঙ্কি ব্যারেট আমার সন্ধানে খার্লিং এর কাছে এসেছিল। সেখান থেকে হদিশ পেয়ে মঙ্গল সিং-এর সঙ্গী হয়েছে। আলোচনা চলেছে। এমন সময় বাগানের ঐ রাস্তাটির উপরের দিকে হঠাৎ অনেকগুলি কুকুর চিৎকার করে ওঠে। স্যাঁয়লা দেওয়ান বলে

"আমি দেখে আসছি।" তার সঙ্গে মায়লা গুরুংও বাইরে চলে যায়। কমপক্ষে বিশ মিনিট সময় পার হয়, অথচ তাদের কোন পাত্তা নেই। ঘরের বাইরে আঙ্গিনায় অনেকগুলি ভারী বুটের শব্দ। কেউ একজন ভারী গলায় হুকুম দেয় ইংরাজীতে, "ঘর ঘিরে ফেলো।" কারা এসেছে বুঝতে বাকী নেই। আমি ত' বন্দীশালার ডাকের জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম। দুর্বল শরীরে মন কোন কোন অবসন্ন মুহূর্তে ভেবেছে, আসুক বন্দীশালার আমন্ত্রণ। একটা নিশ্চিত ঠিকানা ত' পাওয়া যাবে। হয়ত জেল কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করবে। তবু কম্বল শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে শোওয়া যাবে। সময় মত যা হোক কিছু খাদ্য জুটবে। তার পরেই আবার দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিই মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে। ডাক এসেছে অবশেষে। একদিন না একদিন আসতই। দুঃখ হয় মঙ্গল সিং, প্রসাদ, ভৈরাম লিম্বু, আর ফ্র্যাঙ্কি ব্যারেটের জন্য। জিতবাহাদুরও পলাতক। সিঙ্গেল মামলার প্রধান আসামী। তাকে একদিন জেলে যেতে হত। ভাবনা চিন্তার অবসর পাওয়া গেল না। দরজায় উদ্ধত করাঘাত। কারা এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দরজা খুলতেই বুকের উপর আধডজন রিভলবার তাক করে ঢুকল কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী। "হ্যাণ্ডস্ আপ্" বললেই নাটকীয় touchটা সম্পূর্ণ হত। একজন জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই কি অমুক?" উত্তর দেবার আগে পূর্বেকার পরিচিত আই বি অফিসার এগিয়ে এল—হাতে রিভলবার বাগানো, মুখে হাসি। জবাবটা দিল সে-ই, বলল, "হ্যাঁ, উনিই সে······।"

আইনের সমস্ত অনুষ্ঠান, অর্থাৎ তল্লাশীও লেখাপড়ায় বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর ঘরের বাইরে পা দিলাম। বিরাট পুলিশবাহিনী এসেছে অভ্যর্থনা করতে।

নেপালী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার ইংরাজীতে বলে, মিঃ মজুমদার, আপনার লোকই আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

এবার যাত্রা শুরু হল। সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, চড়াই ভেঙে ধীরে ধীরে উপরে ওঠা। তফাৎ শুধু এই যে এবারকার চলায় আর আমার কোন তাগিদ নেই। যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে নীচের উপত্যকার দিকে তাকালে মনে হত, 'উঁচু পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বহু উপরে কার্ট রোডের এক-আধটু চেনা চোখের কাছে ধরা পড়ে। উত্তরে আর দক্ষিণে পাহাড়ের দুই অতিকায় বাহু ক্রমশঃ পূবের দিকে ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণের বাহুটি উত্তরের প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে যেতে চেয়ে আর বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। উত্তরের বাহু সোনাদা ষ্টেশন থেকে বার হয়ে বালাসন পর্যন্ত গেছে। তার মাথার উপর দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে পচেং বাজার, আর পাইন গাছে ঘেরা "বামতাল" পার হয়ে মলোটপুলের দিকে—সেইখানে এসে উঠতে হবে।

আমার ঘর থেকে দেখা যেত অতি মনোরম একখানি দৃশ্যপট। থাকে থাকে সাজান। চা-ঝোপ, গাছপালা, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কুলিবস্তির ঘরগুলি। পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল লাল রাস্তা। বহু নীচে "গানওয়ার" ঝরণার উপর ঝোলানো পুলটি এখান থেকে কত ছোট দেখায়। পাহাড়ের দক্ষিণের বাহু অনেক বেশী ঢালু। তার পূর্ব প্রান্তের চূড়াটা প্রায় সমতল পাইন আর পপ্‌লার গাছের সারির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত ছবির মত পথ। এখান থেকে গাছগুলির চূড়া দেখি, আর চেনা ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পশ্চিম প্রান্তে নেয়োর বাগানের সাদা গুদামটি সূর্যের আলোতে চক্‌চক্ করে। এই বাহুর অপর পারে সিঙ্গেল বাগান। গোটাবাহুটির মাথার উপর দিয়ে জেগে উঠেছে কার্শিয়ং পাহাড়ের চূড়া। বসে বসে দেখতাম ঐ ঈগল্‌স ক্র্যাগ, ঐ সেন্ট মেরী, আর ঐ দেখা যায় সরলরেখার মত পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত পাংখাবাড়ী রোড।

এধারে বাহুটি এত খাড়া আর উঁচু যে মনে হত প্রায় সোনাদার

কাছাকাছি এসে গেছি, কিন্তু সেই অন্ধকার রাতে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলি আর ভাবি সোনাদা থেকে পচেং বাজার কত নীচে। যা-হোক, অবশেষে পথের শেষ হল। বাস দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরই জন্য, পুলিশই সঙ্গে করে এনেছে। দার্জিলিং পৌঁছতে ভোরের আলো দেখা দিল। শহরবাজার তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। দার্জিলিঙে ফিরে এলাম। গত তিন-চার বছরের কর্মক্ষেত্র। চেনা পথঘাট দোকান বাড়ি। রিভলবার আর উদ্যত রাইফেলের ভিড়ের পরিবেষ্টিত হয়ে সদর থানার অঙ্গনে পদার্পণ করলাম। বছর দেড়েকের অনুপস্থিতির পর হঠাৎ দেখি গভর্ণমেন্ট আর তার অনুচরদের চোখে আমার দাম কত বেড়ে গেছে। চা-বাগানের বিদেশী মালিক, আর তাদের রক্ষাকর্তা গভর্নমেণ্ট দুয়েরই রাতের ঘুম বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল। বহুশতাব্দী ধরে যারা পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে সেই সরল পরিশ্রমী আর সাহসী গোর্খা চা-শ্রমিকেরা যদি জেগে ওঠে, শ্রমিকের রক্ত জল করা মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে গড়া কায়েমী স্বার্থের মুনাফার পাহাড় বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়বে। সেই ঘুমন্ত দৈত্যকে জাগাবার ভার যারা নিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিই শেষ ব্যক্তি এতদিন ধরাছোয়ার নাগালের বাইরে ছিলাম।

গুপ্তচরদের হাতে হাতে ফটো ঘুরছে। আগেকার বন্দী অবস্থায় পুলিশের তোলা ফটো। গোয়েন্দারা থানায় ভিড় করে আসে, দেখতে চায় ফটোর সঙ্গে সত্যিকার মানুষের মিল কতখানি। অনেকের মুখে রূপকথার মত নানা গল্প শুনি। কে কে নাকি কবে কোথায় আমাকে দেখেছিল। ঠিক চিনতে পারেনি। রূপকথার রচয়িতাদের মধ্যে দু-একটি বাগানের সাহেব ম্যানেজারও আছে। তারপর কোর্ট, সেখান থেকে জেল। বোটানিক্যাল গার্ডেনের নীচেকার রাস্তা দিয়ে নামতে নামতে ভাবি এই পথে কতদিন গিয়েছি। যাওয়ার সময় নীচে জেলখানার দিকে দেখেছি: কতদিন ষ্টেশন রোডে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, শহরের বহু নীচে জেলখানাটি খেলাঘরের

মত দেখায়। এখন থেকে কিছুদিনের মত সেইটিই হবে আমার পৃথিবী।

খেলাঘরই বটে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভু শ্রেণীর ক্ষমতা বজায় রাখার বড় হাতিয়ার। ঐ খেলা টুকুর ভিতরে বাসিন্দাদের উপর কত সময় নানা অত্যাচার হয়। আর তার [illegible] বর্ণনা শুনে শোষিত মানুষেরা মাথা তুলতে [illegible] খানিকটা সময়কে যায় শরীর বিশ্রাম চাইছিল। দীর্ঘ বিশ্রাম। [illegible] এখনও অবসর ওখানে। মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকের পক্ষে [illegible] এমন জায়গা আর কোথায়?

বিশ্রাম কিন্তু সংগ্রামীর জন্য নয়। চরম যুদ্ধের মোর্চা। পতাকাকে উঁচুতে তুলে রাখতে হবে। কোনো [illegible] না। আইরিশ বিপ্লবী ড্যান ব্রীনের আত্মচরিতে ("My Fight for Irish Freedom") একটি ঘটনার কথা। মাইকেল কলিন্স [illegible] আইরিশ প্রজাতন্ত্র-বাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার শর্তে ক্ষমতায় আসলেন [illegible]। আর ড্যান ব্রীনের দল সে আপস মানতে অস্বীকার করে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন। মাইকেল কলিন্সের [illegible] ড্যান ব্রীন যখন আবার ধরা পড়েন, সরকারি বাহিনী দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে দেশবাসী তাঁকে যে সব সম্মান পদক দিয়েছি[illegible], সেগুলো উর্দিতে আঁটা রয়েছে—[illegible] 'স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সৈন্যদল'। তারা দেশদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। ধরা পড়ার সময় ব্রীনের চোখে জল এসেছিল। কারণ তিনি ইতিহাসের নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

মনের রূপালী পর্দায় আরও ছবি ভেসে উঠছে। ১৯৪৫ সালের ২রা অক্টোবর। দীর্ঘ বন্দীত্ব এবং নির্বাসনের পর যেদিন শিলিগুড়িতে ফিরে আসি, সেদিন রেলষ্টেশনে শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল। স্থানীয় কংগ্রেসও শহরবাসীদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত অভিনন্দনে যোগ না দিয়ে পারেনি। শিলিগুড়ি শহর তার সৈনিক সন্তানকে

কোলে টেনে নিয়েছে ফুলের মালা, এবং জয়ধ্বনি, মিছিল ও অভিনন্দন সভার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

তবুও আজকার দিনটি খাপছাড়া লাগে না। এর জন্য তো প্রস্তুতই ছিলাম। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক পর্যায় শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন পর্যায়—গণমুক্তিসংগ্রামের পালা। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে শোষিত জনগনের জীবনে সত্যকার অর্থে সার্থক করে তুলতে হলে চাই আমূল পরিবর্তন। এবার লড়াই সরাসরি দেশের নতুন শাসক, ভারতের প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে। সেই পথইত' স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। তাই আবার প্রবেশ করতে হল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

শুধু ড্যানব্রীনের কথাই নয়। মনে পড়ছে আরো অনেকের কথা, যাদের স্বগোত্রবলে পরিচয় দিতে পারা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান। সেই দলে রয়েছেন জুলিয়াস ফুচিক এবং গাব্রিয়েল পেরীর মত বহু খ্যাত-নামা ও আরো বহু নাম-না-জানা-মুক্তি যোদ্ধা। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর সৈনিক হিসাবে তাঁরা অমর আত্মদান ও বীরত্বের অপরূপ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। গ্রীসের ও স্পেনের ফ্যাসিস্ত বন্দীশালায় যাঁরা নির্যাতন আর মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মেহনতী মানুষেয় মুক্তি আন্দোলনে প্রেরণার অনির্বান দীপশিখা তুলে ধরেছেন। একদিন নয়, দিনের পর দিন। এতটুকু ব্যর্থতাবোধ নেই তাঁদের মনে। আছে আগামী-কালের উজ্জ্বল উষার সম্বন্ধে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। প্রাণের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরা তাঁদের সেই মৃত্যুহীন অবদান। আমাদের দেশের বন্দীশালায়ও সে মহিমাময় ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় রচিত হচ্ছে। যারা প্রচার করে যে মার্কস্‌বাদ মানবতাবিরোধী, তাদের অপপ্রচার যে কতখাতি ঘৃনিত আর নির্লজ্জ, তার জ্বলন্ত প্রমান? মানুষকে গভীরভাবে ভালো-বাসলে তবেই এভাবে প্রাণ দেওয়া সম্ভব।

সেখানেই তো আমার জীবনের সার্থকতা। সেই জীবনবেদের

পরশমণির ছোয়া পেয়েই তো আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিত্ব হয়েছে প্রশান্ত এবং আত্মসচেতন। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক আকাঙ্খা হয়ত অপূর্ণ রয়ে গেল। হয়ত অনেক স্বপ্নের সমাধি হল নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু আমি তাদেরই একজন যারা আজকার ভারতবর্ষের ঘন তমিস্রা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে নতুন সূর্যোদয়কে বরণ করে আনতে। "উদয়াচলের সে তীর্থপথে" চলেছি, তবে একাকী নয়। তাই—

"দিনান্ত মোর দিনান্তে পড়ে লুটে।" *

*দার্জিলিং সদর মহকুমা আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলে কয়েক মাস ধরে। অভিযোগ বেআইনী সংগঠনের কাজকর্ম পরিচালন। সরকার পক্ষ বিশেষ সাক্ষ্য-সাবুদ প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। তবে নানা অজুহাতে মামলার তারিখ পিছিয়ে দিতে থাকেন [illegible] জানান। কয়েকমাস হাজত বাসের পর মামলার সাক্ষ্য। [illegible] আমাদের একমাস কারাদণ্ড হয়। দণ্ড শেষ হবার পর মঙ্গলসিং, ক্রান্তি, প্রসাদ, ভবানী, [illegible] ছাড়া পেয়ে [illegible] ইতিমধ্যে কার্শিয়াং সদর মহকুমা [illegible] আদালতে [illegible] দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপরাধ সরকারী কর্মচারীদের মারপিট ও পুলিশের হেফাজত থেকে আসামীকে ছিনিয়ে নেওয়া। ঐ আদালতে একটি আলাদা মামলায় পুলিশ হেফাজত থেকে পলায়নের অভিযোগে আমার তিনমাস কারাদণ্ড হয়। দণ্ডশেষে পিডি অ্যাক্টে অর্থাৎ নিবর্তনমূলক বিনা বিচারে আটক আইনে ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত বন্দীদশায় থাকতে হয়। তারপর যা ঘটেছে তা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ আলাদা বই হতে পারে। কবে তা লেখা হবে কিনা তা অবশ্য জানি না।

পুনশ্চ

বইখানা শেষ করেছি কাহিনীকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত টেনে এনে। সত্যিকারের পরিসমাপ্তি সেখানে হয় নি। ইতিহাস থেমে থাকেনা থাকেও নি। তার প্রবাহে জোয়ার ভাঁটা খেলে, নতুন মোড় দেখা দেয়, নতুন বাঁক নেয়, আবর্তের জন্ম হয়। ১৯৫২-১৯৬২-র দশকে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে বহু কিছু ঘটেছে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে কত উপাদান জমা হয়েছে। কিন্তু লিখে উঠতে পারি কি! তাই সংক্ষিপ্ত উপসংহারে দুই একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

শোষনমুক্ত ভারতের জন্য সংগ্রামের অবসান আজও হয়নি। যে দিগন্তের দিকে আমি এবং আমার মতই আরো কত জন যাত্রা করেছিলাম তা এখনও বহুদূরে। সংগ্রাম আরো বেশি জটিল হয়েছে। ধারণ করেছে সমস্যাসঙ্কুল রূপ। অনেক কাজ বাকী। যারা সত্যকার অর্থে ইতিহাসের রচয়িতা সেই মেহনতী মানুষদের সামনে উপরোক্ত সত্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে, তাদের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করতে হবে। বহুকাল ধরে জমে থাকা অন্ধকারকে ঘোচাতে হবে নতুন জ্ঞানের আলোকে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ব্যক্তির জীবনে একটা সময় আসে যখন শারীরিক ভাবে সংগ্রামের গতিধারার সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে মনের দিক থেকে যোগসূত্রঅক্ষুণ্ণ রয়েছে। সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি বিখ্যাত উক্তিটিকে-"ব্যাক্তিগত ভাবে আমরা অক্ষম হয়ে পড়তে পারি, শেষ হয়ে যেতে পারি কিন্তু বিপ্লবের অংশ হিসাবে আমরা প্রত্যেকে অপরাজেয়" অসমাপ্ত বিপ্লবের একজন। অসমাপ্ত বিপ্লবের একজন সৈনিক রূপেই অরুনোদয়ের প্রতীক্ষা করে আছি।